সীরাতে রসূল আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মূল
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (র)

তরজমায়
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

সীরাতে রাসূল আকরাম (সা.)
মূলঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
অনুবাদঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশ কাল
অগ্রায়হণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
মহররম, ১৪৩৪ হিজরী
ডিসেম্বর, ২০১২ ঈশায়ী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে : মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN : 978-984-90177-4-5

মূল্য ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

SIRAT-E RASUL AKRAM (SM.) in Urdu written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, translated into Bengali, of by Abu sayecd Muhammad Omar Ali, Published by Muhammad Brother's, 38, Banglabazar. Dhaka—1100. Phone: 7125481, Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1 Naya Paltan, Dhaka—1000.

(12) سیرت رسول اکرم از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

উৎসর্গ

মানব জাতির সার্বিক মুক্তির একমাত্র দিশারী অনুপম ও মহোত্তম
আদর্শ রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের
সীরাত মুবারক অধ্যয়ন ও অনুসরণে আগ্রহী
তরুণ কিশোর-কিশোরীদের হাতে

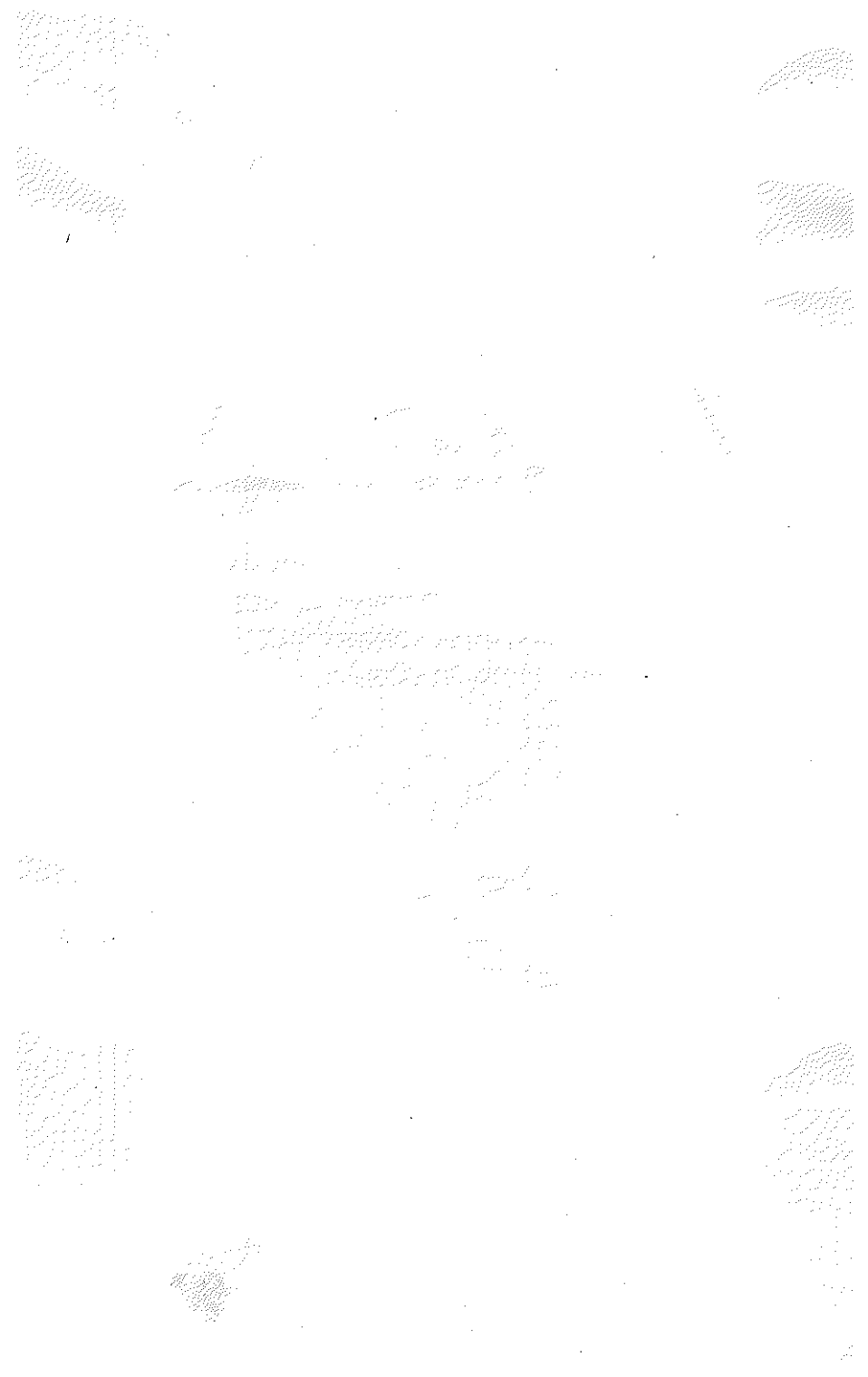

আমাদের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো শুকরিয়া এবং মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ ও সালাম।

মানবতার মুক্তির দূত বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যদি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকেন যাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলা যায়, তিনি ইতিহাসের প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অজ্ঞতার পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তে চিন্তা-গবেষণা, পূর্বসূরীদের অন্ধ-অনুকরণের পরিবর্তে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে মানব জাতিকে অভ্যস্ত করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমরা ইতিহাসের এমন এক দ্বিমুখী রাস্তায় দেখতে পাই যেখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে বিবেক ও প্রমাণ এবং অলীক ও ভ্রান্ত ধারণার পথ। তাঁর শিক্ষা মানব বিবেককে করছে উজ্জ্বল এবং প্রতিভাকে করেছে দীপ্তিময়।

একজন মুসলমান সেই সকল ইতিহাস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা উচিত নয় অথবা ভুলে যাওয়াও ঠিক নয়, যে পরিবেশ ও সমাজে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আলোকোজ্জ্বল সূর্য সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল। সে সময়কার দুনিয়ার বিস্তৃত জাহেলিয়াত সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। সেই সাথে সীরাতের পাঠকদের জন্য সে যুগের সামাজিক কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কেও অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য, এ ব্যাপারে আমাদের অবহেলা ও উদাসিনতা একেবারে কম নয়।

এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-এর সীরাতে রসূল আকরাম (সা.) নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। গ্রন্থটির সফল অনুবাদক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব। আল্লাহ তা'আলা যেন এ গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদককে দুনিয়া আখেরাতের সফলতা দান করেন।

আমীন।

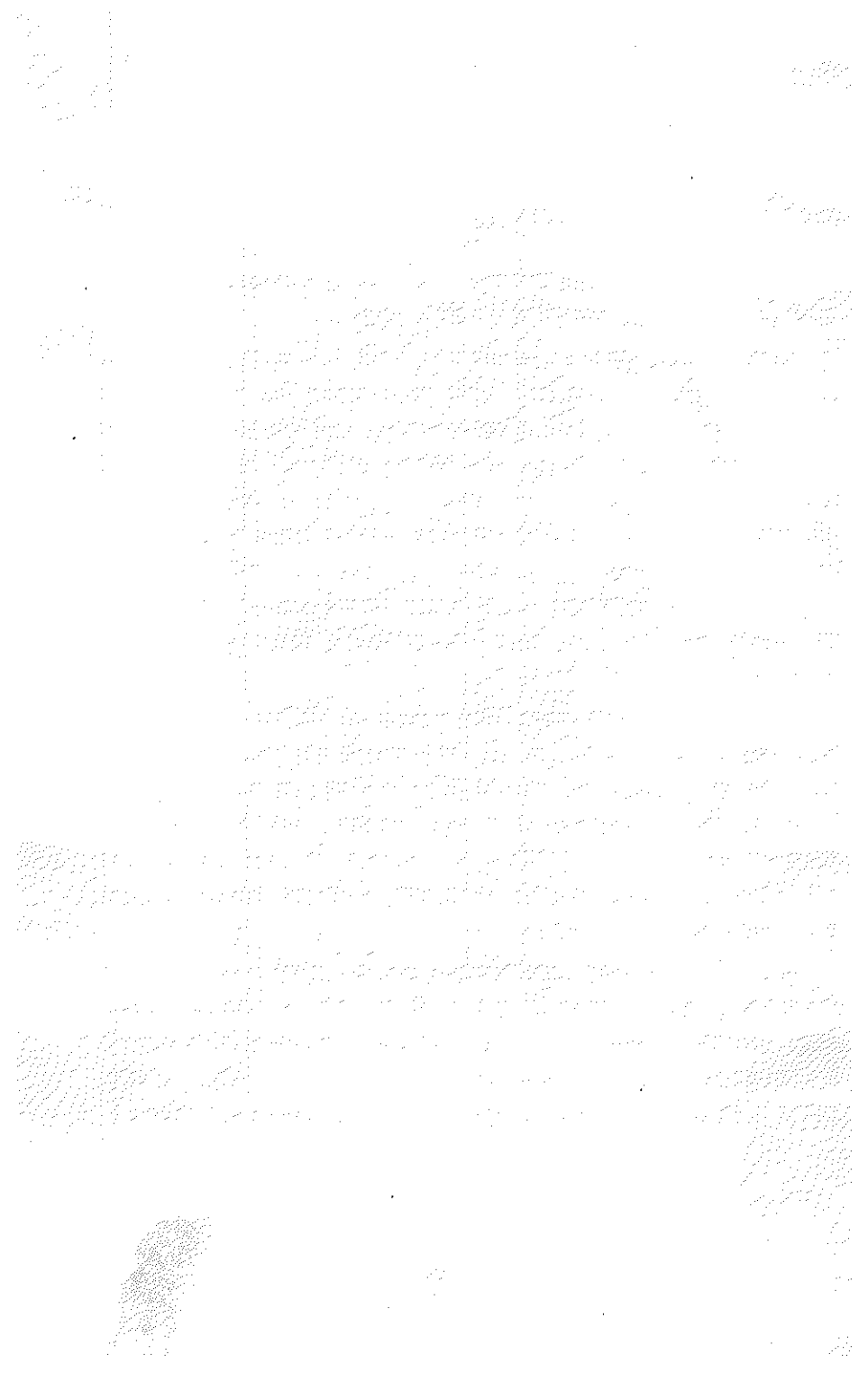

অনুবাদকের আরয

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে অসংখ্য হাম্‌দ, শোকর ও সজূদ যিনি তাঁর বান্দা এই অধম গোনাহগারকে আরও একটি সীরাত গ্রন্থের তরজমা করার ও তা প্রকাশিত হতে দেখার সুযোগ দিলেন। এটি ছিল এ পর্যায়ের তৃতীয় সীরাত গ্রন্থ। অতঃপর রসূল আকরাম খাতিমুল আম্বিয়া, সাইয়েদুল মুরসালীন, শাফীউল মুযনিবীন ও রহমাতুল-লিল-'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওযায়ে আকদাসের উদ্দেশ্যে অযুত-কোটি দরূদ ও সালাম জানাচ্ছি এবং গোনাহগার উম্মতের এ দীন নযরানা তাঁরই দরবারে পেশ করছি।

রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে এবং তিনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত বলে কুরআনুল করীমে ঘোষিত হয়েছে। তাঁকে 'রহমাতুললিল আলামীন' হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করা হয়েছে বলে আল্লাহ পাক জানিয়েছেন। তিনি আমাদের নাজাত ও হেদায়েতের উৎস। তাঁর সীরাত মুবারক কেবল আমাদের জন্যই নয় গোটা মানবকূলের জন্য আলোর মীনার স্বরূপ। এর থেকে প্রয়োজনীয় আলো পেতে হলে এই সীরাত মুবারক আমাদেরকে গভীরভাবে জানতে হবে, অনুসরণ ও অনুকরণের উদ্দেশ্যে তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তা অধ্যয়ন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত মুবারক নিয়ে যেমন আগ্রহ ও উৎসাহ থাকার কথা তেমনটি সাধারণত দেখা যায় না। অন্য আর পাঁচটি ক্ষেত্রের মতই এক্ষেত্রেও অবহেলা ও উদাসীনতা ব্যাপক। সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক বাদে অনেক আলেম-উলামার মধ্যেও রসূল আকরাম (সা)-এর সীরাত মুবারক-এর ওপর পড়াশোনা আশ্চর্য রকম ক্ষীণ। ফলে সঙ্গত কারণেই এই দীন অনুবাদকের সীরাত গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পায়। এরই এক পর্যায়ে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত জেনারেল আকবর খানের মহানবী (সা)-র ওপর, বিশেষ করে তাঁর পরিচালিত যুদ্ধ-জিহাদের ওপর লিখিত 'হাদীছে দেফা' নামক পুস্তকটির অনুবাদে হাত দিই, যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে ১ম সংস্করণ এবং 'মহানবী (সা)-র প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) লিখিত 'নবীয়ে

রহমত' তরজমায় হাত দিই এবং হযরত (র)-এর জীবদ্দশায় এর প্রকাশিত কপি তাঁর হাতে তুলে দিতে ও দোআ লাভে সক্ষম হই।

বর্তমান গ্রন্থটি ছিল এ পর্যায়ে আল্লামা নদভী (র) লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থ যা বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত তৃতীয় সীরাত গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। অধমের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তিন তিনটি সীরাত গ্রন্থ অনুবাদের এবং তা প্রকাশিত হতে দেখার সুযোগ আল্লাহ পাক আমায় দিলেন। এজন্য লক্ষ-কোটি বছর তাঁর দরবারে সিজদাবনত থাকলেও এর শোকরের হক আদায় হবে না। এক্ষণে এটি যদি তাঁর মহান দরবারে কবুলিয়াত লাভে ধন্য হয় আর ধন্য হয় শাফী'উল মুযনিবীন (সা)-এর শাফাআত লাভের যরী'আ হিসেবে তাহলেই এই অধম নিজেকে সরফরায মনে করবে।

গ্রন্থের মূল লেখক মুহতারাম শায়খ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) এটি কোন গ্রন্থের রূপ দেবার নিয়তে লেখেন নি। তিনি লাখনৌর তাবলীগি মারকাযে তা'লীমের উদ্দেশ্যে সব সময় সীরাত মুবারকের কিছু কিছু অংশ লিখে নিয়ে যেতেন এবং মুবাল্লিগীনের সামনে তা পাঠ করে শোনাতেন। উদ্দেশ্য থাকত মুবাল্লিগীন ভাইয়েরা দা'ঈ নবীর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে যেন এর থেকে প্রয়োজনীয় নূর ও হেদায়েত হাসিল করতে পারে। আল্লামা নদভীর মুখ থেকে সে সময় যারা এর পাঠ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তারা প্রভূত, পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন। অধমের দৃঢ় বিশ্বাস, তাবলীগি জামা'আতের তা'লীমি হালকা, বুযুর্গ শায়খদের রূহানী খানকাহগুলোতে দেশের আলিয়া ও কওমী মাদরাসাগুলো যদি এটি স্থান পায় তবে তা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের অপরিমেয় কল্যাণ লাভের কারণ হবে।

বইটি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর অধ্যাপক আবদুর রউফ সাহেবের বদান্যতায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর সুন্দর সমাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ে ভাই আজিজুল ইসলাম, স্নেহধন্য জাকির সহ যারাই অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সকলের জন্য নেক দোআ আর পরম মুহতারাম জান্নাতবাসী শায়খ আল্লামা নদভীর জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মকাম কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

দোয়াপ্রার্থী

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين ـ وصلى الله تعالى على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين ـ

রসূলে করীম খাতিমুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহকে কুরআন মজীদে কোথাও "তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; এর আগে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (সূরা জুমু'আ) বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত", আবার কোথাও বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মোটকথা, মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্র সর্বশেষ ও মনোনীত রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম আলোর মিনার। আপন জীবন-যিন্দেগীর এ থেকে আলো গ্রহণ করা, তাঁর পদাংক অনুসরণ করা এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, আখলাক-চরিত্রে ও গুণাবলীতে তাঁকে নিজের জন্য নমুনা বানানো প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয, অপরিহার্য কর্তব্য। তার জন্য এরই ভেতর কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে এবং এটাই একজন মর্দে মু'মিনের রীতিও পন্থা-পদ্ধতি। যখন ও যে এই রীতি ও পন্থা-পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কিংবা এ ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলাকে প্রশ্রয় দিয়েছে সেই সঠিক রাস্তা থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং জীবনের সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ বোঝা ও তাঁর অনুসরণের জন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। একটি হলো, তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে এবং তা এমন হবে যে, সেই মহান সত্তার জন্য সব কিছু কুরবান করা যেতে পারে। ভালবাসার সম্পর্ক কেবল যেন মৌখিক না হয় বরং তা যেন প্রকৃত ভালবাসা হয় এবং তা যেন হয় আন্তরিক। যেমনটি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ছিল।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ভালবাসা কেমন ছিল? ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের শাস্তি হিসেবে তাঁকে হত্যা করা হচ্ছে আর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, বল, তুমি কি মেনে নিতে ও গ্রহণ করতে রাযী আছ, তোমার জায়গায় এই মুহূর্তে নবী মুহাম্মদ হোন আর তুমি বেঁচে যাও? তিনি জওয়াব দিচ্ছেন, আমি তো এজন্যও প্রস্তুত নই যে, তাঁর কদম মুবারকে কাঁটা ফুটুক আর তার পরিবর্তে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাই। হযরত হাসসান ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বলেন ঃ

ان ابى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء ـ

"আমার পিতা ও আমার পিতামহ এবং স্বয়ং আমার মান-সম্ভ্রম সব কিছুই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মান-সম্মান হেফাজতের জন্য ঢালস্বরূপ।"

বরং এক যুদ্ধ (ওহুদ যুদ্ধ) থেকে প্রত্যাবর্তনকারী দলের জনৈক সদস্যকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেন, আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খবর কি? তিনি কি ভাল আছেন? উত্তরদানকারী বলেন, তোমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। মহিলা আবার জিজ্ঞেস করেন, আমাকে বলুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভাল আছেন তো? তিনি জওয়াবে বলেন, তোমার স্বামী শাহাদত লাভ করেছেন। মহিলা এবারও জিজ্ঞেস করেন, আগে আমাকে বলুন—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন। তিনি ভাল আছেন তো? এবার জওয়াব আসে, হ্যাঁ, তিনি ভাল আছেন। মহিলা বলেন, তিনি ভাল থাকলে আর সব বিপদই তুচ্ছ! যদি একজন মু'মিনের মধ্যে এ ধরনের কিংবা এর কাছাকাছি রকমের ভালবাসা না থাকে তাহলে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সত্যিকার ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য, অনুসরণ ও বিশ্বস্ত অনুকরণ হতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত অর্থাৎ আখলাক-চরিত্র ও গুণাবলী, আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি, তাঁর উত্তম আচার-আচরণ ও ব্যবহার, তাঁর অমঙ্গলকামীদের সঙ্গেও উত্তম আচরণ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা, পারলৌকিক চিন্তা, সকলের প্রতি সহানুভূতি ও মঙ্গল কামনা, দীন ও দুনিয়া উভয় জগতে তার সফলতা লাভের চিন্তা, তার মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তা, এ সবই জানার চেষ্টা করতে হবে এবং এও জানতে হবে, তিনি মানুষের সাথে উত্তম আখলাক ও প্রেমপূর্ণ কেমন আচরণ করতেন, আপন পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কেমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন, অন্যদের সঙ্গেই বা কেমন প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। লোকের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সংস্কার ও সংশোধন এবং তাদের মধ্যে আল্লাহকে পাবার প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা

কিভাবে করতেন, তিনি আপন প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কেমনতরো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করতেন।

এ দু'টো শর্ত যার মাধ্যমে একজন মু'মিন তার নিজের জীবনকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করবে এবং আপন ঈমানকে সত্যিকারের ঈমানে পরিণত করবে। এই শর্তগুলো পুরো হলে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল হয় আর না হলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল হবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত তথা জীবন-চরিত জেনে তা অনুসরণ না করা এবং এই দাবি করা যে, আমরা তাঁর অনুগত, এতদুভয়ের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোন কোন সময় মানুষ এই দাবি করে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে খুব ভালবাসে, কিন্তু তাঁর পবিত্র সীরাত তথা জীবন-চরিতকে জানার এতটুকু চেষ্টাও তার নেই। সীরাত মুবারক অধ্যয়ন করে তার থেকে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে নিজের জীবন গঠন এবং সেই আখলাক ও গুণাবলীকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা না করা, এমন মানুষের দাবিকে কিভাবে সত্য মানা যাবে?

কিন্তু হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাত মুবারকের বিষয়বস্তু ও এর বিভিন্ন দিক বই-পুস্তক থেকে খুঁজে বের করা সবার জন্য সহজ হয় না। এজন্য উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম পণ্ডিতদের এতদসম্পর্কিত আলোচনা, বক্তৃতা এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাতের ওপর লিখিত বই-পুস্তক এর বড় মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলমানের এ দিকে দৃষ্টিপাত দরকার। কিছু কিছু বই-পুস্তক খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আবার অনেক বই এত বেশি বিস্তারিত যে, সে সব পড়ার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। সবার পক্ষে এত বেশি সময় ব্যয় করাও অনেক সময় সহজ হয় না।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (মা.জি.আ.) লাখনৌস্থ তাবলীগী মারকাযের সাপ্তাহিক ইজতিমায় পড়ার জন্য সীরাত পাকের ঘটনাবলী, আখলাক ও গুণাবলী, দাওয়াতী ও ইসলাহী বিষয়সম্বলিত অংশগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাতের ওপর লিখিত বিরাট কলেবরের কিতাবাদি ও বই-পুস্তক থেকে বের করে একটি স্থায়ী পুস্তক আকারে বিন্যস্ত করেছিলেন যা তাবলীগী মারকাযগুলোতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শোনানো হতো। এতে উপস্থিত লোকদের খুবই উপকার হতো। সীরাত মুবারকের এসব ঘটনা জীবন গঠন ও সংশোধন এবং তার দিলের ভেতর ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করত। এই ধারা অব্যাহত ছিল। অতঃপর আমার স্নেহভাজন সাইয়েদ বেলাল আবদুল হাই হাসানী নদভী, যিনি হযরত মাওলানার

পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, দিবালোকে নিয়ে আসেন এবং একে মুদ্রণ ও প্রকাশযোগ্য করার জন্য জরুরী কাজগুলো সম্পাদন করেন। এক্ষণে এটি খুব সত্বর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান পুস্তকটি খুব বিরাট আকারের যেমন নয়, তেমনি এর আকার একেবারে ক্ষুদ্রও নয়। এটি কেবল ফাযাইল ও মু'জিযাসম্বলিত যেমন নয়, তেমনি এ কেবল ইতিহাসের ঘটনা সম্পর্কের দফতরও নয়, বরং এ ঈমানী প্রশিক্ষণ, চরিত্র সংশোধন, আল্লাহ কামনা, মানবীয় সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতি বোধ, আল্লাহ্‌র গোলামী ও দাসত্ব এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের সেবার ঘটনাবলীসম্বলিত। আর এটি একজন মু'মিন মুসলমানের কর্মকাণ্ড পরিপাটি করে, করে সুসজ্জিত। একে ব্যাপক করা প্রয়োজন যাতে এর উপকারিতা সকলেই লাভ করতে সক্ষম হয়। স্নেহভাজন মওলভী বেলাল হাসানী আমাকেও এই সৌভাগ্যে শরীক করার জন্য ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেন। আর তারই প্রেক্ষিতে আমি আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই মহাসৌভাগ্যে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত কয়েকটি কথা লিখলাম। আল্লাহ্ তা'আলা একে কবুল করুন। আমীন!

নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
১১ই মুহাররাম, ১৪১৪ হি.

মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী

পুস্তক প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

محمدواله وصحبه اجمعين امابعد

গোনাহগার লেখক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে সিজদাবনত এবং তার যবান মহিমাময় মহাপ্রভুর হাম্‌দ ও ছানা গাইতে অক্ষম যে, আজ সীরাত নববী (সা)-র ওপর এমন একটি গ্রন্থ পাঠকের সামনে পেশ করার সৌভাগ্য জুটছে যা প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে আল্লাহর একজন মুখলিস ও মাহবুব বান্দার হাতে রচিত ও সংকলিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল যাবত দাওয়াতী ও তাবলীগী ইজতেমাগুলোতে যা পাঠ করে শোনানো হতো, কিন্তু গ্রন্থকারে তা প্রকাশিত হতে পারে নি।

দশ বছর আগে আমাদের মুহতারাম শায়খ ও মুরশিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (দা. বা.) সংরক্ষিত পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত কিতাবাদি বই-পুস্তক ও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখছিলেন। এমন সময় আকস্মিকভাবেই বর্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পান। এ সময় তিনি বলেন, যখন আমি লাখনৌস্থ দাওয়াত ও তাবলীগের মারকায মসজিদে থাকতাম সে সময় আমার মনে জাগল যে, সীরাতে নব্বী (সা)-র ওপর একটি সংকলন তৈরি হওয়া দরকার যা তাবলীগী ও দাওয়াতী ইজতেমাগুলোতে পড়ে শোনানো যায়। এজন্য আল্লামা শিবলী নো'মানীর 'সীরাতুন্নবী' ও কাযী সুলায়মান সাহেব মনসূরপূরীর "রহমাতুললিল-'আলামীন" সামনে রেখে সেসব প্রভাবমণ্ডিত ঘটনাগুলো নির্বাচন করা হবে যা দাওয়াতী কর্মীদের জন্য পথ-প্রদর্শক এবং সাথে সাথে তা দিলের মধ্যে ঈমানী উত্তাপ ও ইসলামী প্রেরণা-সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

সে সময় এই অধমের মনে এটি মুদ্রণে ও প্রকাশের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। "আর আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত" (সূরা আহযাব)।

দীর্ঘকাল থেকে রমাযানুল মুবারক হযরত দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ্ (তাকিয়া) অবস্থান করছেন। হযরতের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হযরতের বরকতময় সান্নিধ্যে একনিষ্ঠভাবে কাটাবার উদ্দেশে

রমযানুল মুবারকে এখানে উপস্থিত হন যাদের তা'লীম ও তরবিয়তের খাতিরে বিভিন্ন রকমের দরসের ব্যবস্থা থাকে এবং দীনি দাওয়াতের বিভিন্ন কিতাব পাঠ করে শোনান হয়। দু'বছর আগে সম্মানিত ও ভক্তিভাজন চাচাজান মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' সাহেব নদভী (মা. জি.আ.) বলেন, সীরাত মুবারকের ওপরও কোন সংক্ষিপ্ত পুস্তক এই দরসে থাকা দরকার, থাকা উচিত। অধমের অমনি বর্তমান পুস্তকের কথা মনে পড়ে যা তখন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা আবদুল্লাহ হাসানী সাহেব নদভী (মা. জি. আ.) পাণ্ডুলিপিটি দেখে আমাকে সমর্থন করলেন। এরপর থেকে এটিই পঠিত হতে থাকে। সমাবেশে উপস্থিত লোকদের ওপর এর এমন আছর হয় এবং এর প্রভাব পড়ে যে, সকলেই একে পুস্তকাকারে ছাপার জন্য তাকীদ দিতে থাকেন। হযরতের খেদমতে প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি অনুমতি দেন এবং অধমকে এটি আগাগোড়া পড়ে দেখার ও প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখনের নির্দেশ দান করেন।

পড়তে গিয়ে দেখতে পেলাম, মাঝখানের বেশ কিছু পাতা একদম গায়েব, বিশেষত হুযূর আকরাম (সা)-এর ওফাত সম্পর্কিত ঘটনার পুরো বিবরণ এতে নেই। কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই ছিল যে, তিনি আমাকে গোটা পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখার ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার তৌফিক দিলেন। অধিকন্তু সিহাহ্‌র কিতাবগুলোতে যেসব ঘটনার সূত্র ও বরাত মিলেছে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এরপর খুটিনাটি যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গিয়েছিল তা আল্লামা শিবলী নু'মানীর "সীরাতুন্নবী" এবং হযরতের (মা.জি.আ.) লিখিত নবীয়ে রহমত" সামনে রেখে তা পূরণ করা হয়েছে। "নবীয়ে রহমত" সামনে রেখে সেই আলোকে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ! এক্ষণে সেটি পরিপূর্ণ কিতাব আকারে আপনাদের সামনে বর্তমান। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে কবুল করুন, এর উপকারিতাকে ব্যাপক করে দিন এবং একে নাজাত ও মাগফিরাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

এখানে আরও একটি কথা বলে দেওয়া জরুরী বিবেচনা করছি, এটি হুযূর আকরাম (সা)-এর সীরাত মুবারকের ওপর লিখিত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রভাব সৃষ্টিকারী পুস্তক এবং সাধারণ লোকের জন্য অধিকতর উপকারী। এটি মসজিদ ও সমাবেশগুলোতে পড়ে শোনানো যেতে পারে। কিন্তু যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, এর ওপর গবেষণা করতে আগ্রহী, সীরাত মুবারক সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে উৎসাহী–তাদের জন্য এ লেখকেরই ভলিউম আকারে লিখিত "আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা–এর পাঠ অধিক উপকারী হবে। এতে লেখক সীরাত মুবারকের এমন কতক বিষয় বর্ণনা করেছেন যেগুলোর দিকে সীরাত লেখকদের অনেকের নজর যায় না। পাশ্চাত্য উৎসগুলো সামনে রেখে লেখক বিশ্বব্যাপী

জাহিলিয়াতের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। উর্দূতে সেটির তরজমা করেছেন ভূমিকা লেখকের শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আল-হাসানী (র)। অনূদিত গ্রন্থটি "নবীয়ে রহমত" নামে পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনেক কয়টি সংস্করণ ইতোমধ্যে প্রকাশিতও হয়েছে (বাংলা ভাষায়ও এটি নবীয়ে রহমত নামে বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ২য় ও ৩য় সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে- অনুবাদক)।

পরিশেষে আমি সে সব হযরতের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাঁরা কোন না কোনভাবে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধেয় চাচাজান মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' ছাহেব হাসানী নদভী (মা. জি.) বর্তমান পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়ে অধমকে উৎসাহিত করেছেন। প্রিয়ভাজন মওলভী মুখতার আহমদ নদভী বর্তমান গ্রন্থ লেখা, কপি করা ও প্রুফ রিডিং-এর ক্ষেত্রে বিরাট সহযোগিতা করেছেন। সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা মুহাম্মদ রিযওয়ান ছাহেব নদভী মুদ্রণ ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বড় রকমের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ সব হযরতকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন এবং তাঁদের এই আমল কবুল করুন এবং তাঁদের নেকীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন।

শ্রদ্ধেয় মওলভী সাইয়েদ সালমান নকভী নদভী ও মুহতারাম মাস্টার খুরশীদ আখতার, মুদার্রিস, মাদরাসা যিয়াউল উলূমও কৃতজ্ঞতা লাভের দাবিদার যাঁরা এটি কপি করার মত দুরূহ কাজে সহযোগিতা করেছেন।

وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب وله الحمد والمنة

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين ـ

দারে আরাফাত, দাইরায়ে শাহ আলামুল্লাহ
রায়বেরেলী

বেলাল আবদুল হাই হাসানী নদভী

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسو له الكريم

আল্লাহ্ তা'আলার দীন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের শরীয়তের ভিত্তিই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত মহাপুরুষ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পথ নির্দেশনার শাব্দিক ও কার্যগত প্রকাশ, প্রয়োগ ও প্রচার। এই নাচীজের চল্লিশোর্ধ বৎসরের বিশ্বব্যাপী বহু দেশে বিরচনে লব্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতায় এই কাজের জন্য প্রথমেই হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত তথা জীবনী- তাঁর মীলাদ থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত এবং তৎপরবর্ত্তীকালেও প্রবাহমান আলোকধারার পরিচয় দিয়েই শুরু সবচেয়ে কার্যকর। আজকাল ইসলামের প্রচারের কাজে শুরুতেই কোরআন শরীফের তরজমা এবং হাদীস শরীফের তরজমা লোকজনের হাতে তুলে দেয়ার যে রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে, তার পরিবর্তে লোকজনকে প্রথমেই নবী-করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়াই এই কাজের অধিকতর শুদ্ধ ও কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে পুনপ্রচলনের প্রয়োজন। যখন লোকজন হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিতের মাধুর্যে অভিভূত যে, প্রেমাপ্লুত হবে, তখন তারা স্বেচ্ছায়ই তাঁর অনুসরণের জন্যও যা যা জানা ও করা দরকার, তা পাগলপারা হয়ে খুঁজবে ও করবে। তাদের উপমা হবে ক্ষ্যাপা খোঁজে পরশ পাথর.....

অমুসলিমদের সঙ্গে দীর্ঘ কাল কাজ-কর্মে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, আর পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখা আধুনিক শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আর অবচেতন মনের মনস্তত্ব-উভয়ের ভিত্তিতে ওপরের কথাগুলো বললাম। কিন্তু খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবী, তাবেয়ীন, মুসতনদ উলামাগণের ইসলামের প্রচার ও ইসলাম শিক্ষার পদ্ধতির ভিত্তিতেই ওপরের কথাগুলো অবশ্য পালনীয়, অনুসরণীয়। হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রেমই তাঁর অনুসরণের উৎস ও বীজ। যেমনটি বলেছেন একজন, "ব-খোদা মেরা ঈমান হ্যায় ইশ্‌কে মোহাম্মদী....."

শির্‌ক আর কুফ্‌রের অন্ধকার থেকে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের ওপর ঈমানী ও তৎজাত অন্যান্য ঈমানগত বিষয়ের আক্বীদা, আর তার ইতাআতের জীবন পদ্ধতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রেমের ও প্রেমগত অনুসরণের আলোক বন্যার ভেতর দিয়েই শুরু সম্ভব। এজন্যই ইসলামের দাওয়াত হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত দিয়ে শুরু করাই সমীচীন, তোৎসারিত প্রেম বন্যার প্রেক্ষিতে তাঁর জীবন-পদ্ধতির ব্যাকরণ করা, ফিক্‌হগত শরা-শরীয়ত শিক্ষার পরই কেবল ব্যাপকতর ইলম্ শিক্ষার গ্রন্থরূপে আরবী ভাষা, কোরআনের তাফসীর আর শরহ-সহ হাদীস পড়া পড়ানোর স্থান। ক্রমটি উল্টো করলেই নানা-ভ্রান্তির উপস্থিতির সম্ভাবনা।

সীরাতের এই কিতাবখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙ্গালাভাষী কওমের সহীহ্ পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার, ইসলামের আসক্তি ও ইসলামী শিক্ষা ও পালনের পথ সুগমতর করে এই কিতাবের অনুবাদক আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব বড় ইহসান করেছেন। আল্লাহ্ তার এই খেদমত কবুল করুন, এই কবুলিয়্যতের বরকতে ভাগ যেন আমাদেরও তাঁর মুহাব্বতের সৌভাগ্যে নসীব হয়। কিতাবখানিতে শেষে এই ক্ষুদ্র পাদটীকাই লিখবার মওকা দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করলেন, এও যেন কবুল হয়।

-নাচীজ

ফখরুদ্দীন আহমদ অনীম আব্দুর রহমানি শরীফী মুহাজির আল-মাদানী

সূচীপত্র

জন্ম —২৫
স্তন্য দান—২৫
মা ও দাদার ইনতিকাল অভিভাবক হিসাবে আবূ তালিব—২৬
ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূল-এ অংশ গ্রহণ—২৮
হযরত খাদীজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে—২৯
কা'বার পূনঃনির্মাণ ও এক বিরাট ফেতনার অবসান—২৯
আসমানী প্রশিক্ষণ—৩০
মানবতার সুবহে সাদিক ও মহানবী (সা.)-র নবূওত লাভ—৩১
ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ—৩৩
নেমে এল কাফির-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার—৩৬
মহানবী (সা)-র সঙ্গে ওৎবার আলোচনা—৩৯
কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহানবী (সা) -র আলোচনা—৪১
কুরায়শদের কর্তৃক মুসলিম নির্যাতন—৪৪
হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কুরায়শ কাফিরদের আচরণ—৪৮
মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত ও নাজাশীর সামনে হযরত জাফর (রা)-এর বক্তৃতা—৪৯
হযরত হামযা (রা)-র ইসলাম গ্রহণ—৫১
হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ —৫২
আবিসিনিয়া থেকে উছমান ইবন মাজ'উন (রা)-এর প্রত্যাবর্তন ও নির্যাতন ভোগ—৫৫
কুরায়শ কর্তৃক বনূ হাশিম অবরুদ্ধ ও বয়কট—৫৬
অঙ্গীকারনামা বাতিল ও বয়কটের অবসান—৫৮
হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে কুরায়শ কাফিরদের নির্মম ব্যবহার—৫৯
আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকাল—৬০
তায়েফ গমন ও কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন—৬১
আরব গোত্রগুলোর প্রতি ইসলামের দাওয়াত—৬৪
বায়'আতে আকাবা ও মদীনায় ইসলামের প্রচার—৭০
আকাবার দ্বিতীয় রায়'আত—৭৪

হিজরতের অনুমতি—৭৭
রাসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে ব্যর্থ হত্যা চক্রান্ত ও মদীনায় হিজরত—৮০
সুরাকার পশ্চাদ্ধাবন—৮৪
বরকতময় ব্যক্তি—৮৫
মদীনায় নবী করীম (সা)-এর সাদর অভ্যর্থনা—৮৬
কোবায় মসজিদ নির্মাণ—৮৭
মদীনার প্রথম জুমুআ—৮৮
মদীনায় হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) -এর গৃহে অবস্থান —৯০
মসজিদে নববী ও বাসগৃহ নির্মাণ—৯২
আযানের প্রচলন —৯৪
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন—৯৫
মসজিদে নববীর সুফফা—৯৮
বদর যুদ্ধ—৯৯
বদর অভিমুখে যাত্রা এবং কাফির ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান—১০১
যুদ্ধ প্রস্তুতি —১০৩
যুদ্ধের সূচনা —১০৬
বিখ্যাত কুরায়শ কাফির সর্দারদের হত্যা—১০৯
সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিজয় —১১১
যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ—১১১
হযরত আবুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ—১১৩
উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব-এর ইসলাম গ্রহণ—১১৪
হযরত ফাতেমা (রা)-র বিয়ে—১১৫
জাহিলী অহংবোধ ও বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ—১১৬
ওহুদের পাদদেশে—১১৯
যুদ্ধের সূচনা—১২০
যুদ্ধের পাশা পাল্টে গেল—১২২
প্রেম, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গের নমুনা এবং মুসলমানের পুনর্বার ব্যূহ রচনা—১২৫
কয়েকজন শহীদের অবস্থা—১২৯
ইসলামের সেবায় মহিলাদের ভূমিকা ও অনন্য ত্যাগ—১৩৩
হামরাউল আসাদ অভিযান—১৩৪
আযল ও কারা গোত্র এবং বীরে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনা ও
হযরত খুবায়ব (রা)-এর পুরুষোচিত সাহসিকতা প্রদর্শন—১৩৫
বনূ নাদীরের নির্বাসন—১৩৯

খন্দক যুদ্ধ—১৪১
অবরোধের কঠোরতা ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দৃঢ়তা—১৪৪
হযরত সফিয়্যা (রা)-র বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—১৪৮
গায়বী সাহায্য ও অবরোধের অবসান—১৪৯
মা তাঁর কলিজার টুকরাকে জিহাদ ও শাহাদত লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন—১৫০
গাযওয়া যার্তুর-রিকা'—১৫১
বনূ কুরায়জার যুদ্ধ—১৫১
সারিয়্যা নজ্‌দ ও ছুমামার ইসলাম গ্রহণ—১৫৪
হুদায়বিয়ার সন্ধি—১৫৬
বায়'আতু'র-রিদওয়ান—১৬০
সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো—১৬১
সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ—১৬২
মুসলমানদের কঠিন পরীক্ষা —১৬২
দৃশ্যত ব্যর্থতা কিন্তু বাস্তবে সফলতা—১৬৪
বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান ও গোত্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান—১৬৮
আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশীর নামে প্রেরিত পত্র—১৬৯
বাহবায়নের বাদশাহ্‌র নামে পত্র—১৭০
আম্মানের শাসনকর্তার নামে—১৭১
দামিশ্‌ক ও ইয়ামামার শাসনকর্তার নামে পত্র—১৭৪
আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের নামে পত্র—১৭৪
কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে পত্র —১৭৬
প্রশ্নোত্তর ঃ—১৭৬
পারস্য সম্রাট কিসরার নামে পত্র—১৭৮
খায়বার যুদ্ধ—১৮০
দুর্গ জয়ের ঘটনাটি নিম্নরূপ—১৮১
হযরত জাফর (রা) ইবন আবী তালিবের প্রত্যাবর্তন—১৮৫
নবী করীম (সা) কে বিষ প্রয়োগ—১৮৬
ওমরাতুল কাযা আদায়—১৮৬
মূতার যুদ্ধ—১৮৮
মক্কা বিজয়—১৮৯
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা—১৯৩
বিজয়ীর বেশে নয়—বিনয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ—১৯৪
"আজ ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের দিন, রক্তপাতের দিন নয়"—১৯৫

সামান্য সংঘর্ষ—১৯৬
হারাম শরীফ মূর্তি থেকে মুক্ত—১৯৬
হুনায়ন যুদ্ধ—২০১
তবুক যুদ্ধ—২০৯
মুনাফিকদের কূটচাল—২২০
দওস গোত্রের প্রতিনিধি দল—২২১
ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল—২২৩
আবদুল কয়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল—২২৮
যে চারটি বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা হল ঃ—২২৮
বনূ হানীফার প্রতিনিধিদল—২২৯
তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল—২৩০
আযদ গোত্রের প্রতিনিধিদল—২৩০
হামদান গোত্রের প্রতিনিধি দল—২৩২
নুজায়ব গোত্রের প্রতিনিধি দল—২৩৪
বনূ সা'দ ইবন হুযায়ম-এর প্রতিনিধি দল—২৩৫
বনী আসাদ প্রতিনিধি দল—২৩৬
বাহরা' প্রতিনিধি দল—২৩৬ড়া
হাওলান গোত্রের প্রতিনিধি দল—২৩৭
বনূ মাখারিব প্রতিনিধি দল—২৩৮
বনূ 'আব্স-এর প্রতিনিধি দল—২৩৯
গামিদ প্রতিনিধি দল—২৪০
বনূ ফাযারাহ্র প্রতিনিধি দল—২৪০
সালামান প্রতিনিধি দল—২৪১
নাজরান প্রতিনিধি দল—২৪২
নাখ' গোত্রের প্রতিনিধি দল—২৪৮
হাজ্জাতুল বিদা'—২৪৯
নবী করীম (সা)-এর ওফাত—২৬৪
জানাযা ও দাফন-কাফন—২৭১

সীরাতে রসূল আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اتنى بفضلك افضل ما تؤتى عبادك الصالحين -

জন্ম

আমাদের নবী মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হস্তী বর্ষে বসন্ত মৌসুমে ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার[১] তারিখে সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান।[২] মহানবী (সা.)-র জন্মের পূর্বেই পিতা ইনতিকাল করেন।[৩] দাদা আবদুল মুত্তালিব নিজেও শৈশবে এতিম ছিলেন। ২৪ বছর বয়স্ক লোকান্তরিত পুত্র আবদুল্লাহ্‌র স্মৃতি এই পুত্রের জন্ম লাভের খবর পেয়েই তিনি ঘরে ছুটে আসেন এবং শিশু মহানবী (সা)-কে কা'বা ঘরে নিয়ে যান ; অতঃপর শিশুর জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ কামনা করেন।[৪] জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা হয় এবং এতদুপলক্ষে কুরায়শদের দাওয়াত করা হয়। আহারান্তে আমন্ত্রিত মেহমানরা জিজ্ঞেস করল, আপনি শিশুর কি নাম রেখেছেন? উত্তরে আবদুল মুত্তালিব জানালেন, মুহাম্মদ। সকলেই পরম বিস্ময়ে বলল, আপনি আপনার খান্দানে প্রচলিত নাম বাদ দিয়ে এ নাম রাখলেন কেন? তিনি বললেন, আমি চাই, আমার এই সন্তানের স্তুতি ও প্রশংসা সারা দুনিয়ায় কীর্তিত হোক![৫]

স্তন্য দান

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম তাঁর মা, অতঃপর দু'তিন দিন পর তদীয় চাচা আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়াইবা দুধ পান করান।[৬] সে সময় আরবে নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত খান্দানের ভেতর নিয়ম ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দেহাত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল, শিশু বেদুঈন

১. মুতাবিক ২২ শে এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। ইব্‌ন ইসহাক জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় শুদ্ধ বর্ণনায় সোমবার দিনের উল্লেখ করেছেন। সহীহ মুসলিম-এর কিতাবুস সিয়াম শীর্ষক অধ্যায় দ্র।

২. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃ.; তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব।

৩. রাহমাতুলিল আলামীন, কাযী সুলায়মান মানসূরপূরীকৃত।

৪. সীরাত ইবনে হিশাম, তাবাকাত; তাহযীব।

৫. তাহযীব, আল-বিদায়া। ৬. সহীহ্ বুখারী।

পল্লীর উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠবে, তাদের ভাষার অলংকরণ আত্মস্থ করবে এবং আরবের নির্ভেজাল আরবীয় বৈশিষ্ট্য শিশুর চরিত্রে অক্ষুণ্ন থাকবে। মহানবীর জন্মের কয়েকদিন পর হাওয়াযিন গোত্রের কতিপয় মহিলা শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করে। এঁদের মধ্যে হালিমা সা'দিয়া নামের জনৈকা মহিলা ছিলেন। সঙ্গী মহিলারা শিশু সংগ্রহে সমর্থ হলেও ঘটনাক্রমে তিনি অর্থাৎ হালিমা সা'দিয়া এতে ব্যর্থ হলেন। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-র মা আমিনা তাঁর হাতে প্রাণাধিক পুত্রকে তুলে দিতে চাইলেও মা হালিমা শিশুকে নিতে ইতস্তত করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এই এতিম শিশু লালন-পালনের বিনিময়ে এমন কিইবা মিলবে। আবার একেবারে খালি হাতে ফিরে যেতেও তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। অগত্যা তিনি হযরত আমিনার আগ্রহাতিশয্যে শিশু মুহাম্মদকে গ্রহণে সম্মত হন এবং কোলে তুলে ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। দু'বছর পর হালিমা সা'দিয়া শিশু মহানবীকে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং তাঁকে তাঁর মার হাতে তুলে দেন।

এ সময় মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। তাই শিশুর নিরাপত্তার স্বার্থে মা আমিনার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে তিনি আবার তাঁকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনেন।[১] হযরত হালিমাকে মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) গভীরভাবে ভালবাসতেন। হযরত হালিমার স্বামীর নাম ছিল হারিছ ইব্ন আবদিল উযযা। মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওত লাভের পর তিনি মক্কায় আগমন করেন এবং ইসলাম কবুল করেন। হারিছ মহানবীর খেদমতে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, এসব তুমি কি বলছ? উত্তর তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি যা বলছি সত্যি বলছি। এমন একদিন আসবে যখন আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, আমি যা বলতাম তা সত্যি বলতাম। একথা শোনার পর হারিছ মুসলমান হন।[২]

মা ও দাদার ইনতিকাল

অভিভাবক হিসাবে আবূ তালিব

মহানবীর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদীনায় যান। মহানবীর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকুল ছিল মদীনার নাজ্জার বংশ। তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেন। এই সফরে মহানবী (সা)-র দাঈ-মা উম্মু আয়মানও

১. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ১৭২-৭৩। হযরত হালিমা সাদিয়ার স্তন্য দানের ঘটনা খুবই মশহুর। সীরাত রচয়িতাগণ এর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে, ইমাম আহমদ তদীয় মুসনাদ গ্রন্থে, দারিমী সুনান গ্রন্থে, তাবারানী মু'জাম গ্রন্থে ও ইবনে হিব্বান তদীয় মাওয়ারিদুজ্জামান গ্রন্থে হযরত হালিমার স্তন্য দানের কথা উল্লেখ করেছেন। বক্ষ বিদারণের যেই মশহুর ঘটনা শৈশবে সংঘটিত হয় তা এই বনু সা'দ-এ অবস্থান কালেই সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম মুসলিম তদীয় সহীহ গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন ('কিতাবুল ঈমান, বাবু'ল-ইসরা')।

২. আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃ.।

সাথে ছিলেন। তাঁরা এক মাস মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমেনা ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন। উম্মু আয়মান মহানবী (সা)-কে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।[১]

মাতার ইনতিকালের পর দাদা আবদুল মুত্তালিব মহানবী (সা)-র লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সব সময় তাঁকে নিজের কাছে রাখতেন।[২] বিরাশি বছর বয়সে দাদাও ইনতিকাল করেন। এ সময় মহানবী (সা)-র বয়স ছিল আট বছর।[৩] দাফনের জন্য আবদুল মুত্তালিবের লাশ খাটিয়ায় ওঠানো হলে মহানবী (সা) ও এর সাথে ছিলেন। সে সময় তিনি কাঁদছিলেন। আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে মহানবী (সা)-র লালন-পালনের ভার তদীয় পুত্র আবূ তালিবের হাতে তুলে দেন। আবূ তালিব তাঁর আপন সন্তানের চেয়েও মহানবী (সা)-কে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। রাত্রে ঘুমাবার সময়ও কাছে নিয়ে ঘুমাতেন, কোথাও বাইরে যেতে হলে সাথে নিয়ে যেতেন।[৪]

মহানবী (সা)-র বয়স যখন দশ কিংবা বারো তখন তিনি ছাগল চরান।[৫] ভবিষ্যত বিশ্ব পরিচালনার এ ছিল ভূমিকা। যে সময় তিনি রসূল হন, সে সময় তিনি এই সহজ সরল ও আনন্দপূর্ণ কাজের কথা বলতেন। একবার তিনি সাহাবাদের সঙ্গে জঙ্গলে যান। সাহাবায়ে কেরাম (রা) গাছ থেকে কুল পেড়ে খেতে শুরু করেন। তিনি তখন বলেন, যে সব কুল খুব বেশি কালো সেগুলোই খেতে সবচেয়ে বেশি মজার। এ অভিজ্ঞতা আমার তখন যখন কৈশোরে এখানে আমি ছাগল চরাতাম।[৬]

আবূ তালিব ব্যবসা করতেন। কুরায়শদের নিয়ম ছিল, বছরে তারা একবার বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করতেন। মহানবী (সা)-র বয়স তখন বারো বছর। সে সময় চাচা আবূ তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া সফরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সফরে কষ্ট হবে ভেবে কি ংবা অন্য কোন ধারণায় তিনি মহানবী (সা)-কে সাথে নিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু মহানবী (সা) চাচা আবূ তালিবকে এত বেশি ভালবাসতেন যে, চাচা সফরের উদ্দেশে রওয়ানা হতেই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরেন। আবূ তালিব প্রাণপ্রিয় ভাতিজার দিলে আঘাত দেওয়া পসন্দ করেন নি। ফলে তিনি মহানবী (সা)-কে সাথে নিতে সম্মত হন।[৭]

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৫৫; তাবাকাত, ১ম খণ্ড, ১১৬; দালাইল, ১ম খণ্ড, ১৮৮।
২. মুসান্নিফ ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃ।
৩. দালাইলুন নবুওয়া, ২য় খণ্ড, ২২ পৃ.; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্য, পৃ. ২৫।
৪. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃ.।
৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইজারা।
৬. তাবাকাত, ১ম খণ্ড , ৮০ পৃ.।
৭. সুনান তিরমিযী, বাবুল মানাকিব ।

ফিজার যুদ্ধ ও হিলফুল ফুযূল-এ অংশ গ্রহণ

আরবে ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের যেই অব্যাহত ধারা চলে আসছিল তন্মধ্যে ফিজার যুদ্ধ ছিল সর্বাধিক মশহূর ও বিপজ্জনক। বনূ কুরায়শ ও কয়েস গোত্রের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেহেতু বনূ কুরায়শ ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম পক্ষ, তাই মহানবী (সা)-কেও এতে যোগদান করতে হয়। তবে তিনি কারুর ওপর হাত ওঠান নি।[১]

এই অব্যাহত যুদ্ধ শত শত পরিবারকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিল এবং হত্যা ও রক্তপাত তাদের মৌরসী ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এতদ্দৃষ্টে কারুর দিলে অবস্থার সংস্কার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ফিজার যুদ্ধ শেষে মানুষ যখন যে যার বাড়ি-ঘরে তখন যুবায়র ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চাচা ও খান্দানের নেতৃস্থানীয় পুরুষ, এই প্রস্তাব পেশ করেন। অনন্তর বনূ হাশিম, বনূ যুহরা ও বনূ তায়ম আবদুল্লাহ ইব্ন জাদ'আনের ঘরে সমবেত হয়। আলোচনা অন্তে সকলে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, আমাদের মধ্যে সকলেই মজলুমের সাহায্য করবে এবং মক্কার চতুঃসীমার ভেতর কোন জালেম অত্যাচারী থাকতে পারবে না।[২] মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এই অঙ্গীকারে শরীক ছিলেন। তিনি তাঁর নবূওত যুগে বলতেন, সেই অঙ্গীকারের মুকাবিলায় কেউ যদি আমাকে লাল রঙের উটও দিতে চাইত, তবুও এর বিনিময় করতাম না। আর আজও যদি কেউ সেই অঙ্গীকারের নামে আমাকে আহ্বান জানায় আমি সেই আহ্বানে সাড়া দেব।[৩]

চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে তিনি সেই কৈশোরেই কয়েকটি বাণিজ্যিক সফরে গিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে সব রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এ সময় তাঁর উত্তম লেনদেনের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। 'আবদুল্লাহ ইবন আবিল-হামসা' নামক একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, নবূওত লাভের পূর্বে আমি মহানবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কিছু কেনা-বেচার কাজ করেছিলাম। কিছু লেনদেন হয়েছিল আর কিছুটা বাকী ছিল। আমি ওয়াদা করলাম, আমি আবার আসব। ভুলে যাবার দরুন ওয়াদা মাফিক প্রতিশ্রুত সময় ও স্থানে আমি যেতে ব্যর্থ হই। তৃতীয় দিনে স্মরণ হতেই আমি প্রতিশ্রুত স্থানে গিয়ে দেখতে পাই তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এতদ্সত্তেও তাঁর চেহারায় এতটুকু বিরক্তি

---

১. ইবন হিশাম, ১৯৫ পৃ.; আর-রাওদুল উনুফ, ১ম খণ্ড, ১২০ পৃ.।
২. তাবাকাত ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, ৮২।
৩. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ১৯-২০ ইমাম যাহাবী এর বিশুদ্ধতা সত্যায়ন করেছেন। বুখারী তদীয় আল-আদাবুল-মুফরাদ ও বায়হাকী তদীয় সুনান গ্রন্থে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কিংবা অসন্তোষের চিহ্ন ছিল না। কেবল এতটুকু বলেছিলেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আজ তিন দিন যাবত আমি এখানে আছি।[১]

হযরত খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে বিয়ে

মক্কায় তখন খাদীজা (রা) নামে অভিজাত বংশীয় এক বিরাট ধনবতী মহিলা বাস করতেন। তাঁর বিপুল অর্থ ব্যবসায় লগ্নী করতেন। মহানবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উত্তম স্বভাব ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ এবং তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তিনি নিজেই তাঁর টাকা-পয়সা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য আবেদন করেন। মহানবী (সা) সম্মত হয়ে তাঁর মালমাত্তা নিয়ে বাণিজ্যিক সফরে রওয়ানা হন। এতে প্রচুর মুনাফা হয়। হযরত খাদীজা (রা)-এর গোলাম মায়সারাহ ছিলেন এই সফরে মহানবী (সা)-এর সফরসঙ্গী। সফরে তিনি মহানবী (সা)-র মাঝে যেসব গুণ ও মর্যাদামণ্ডিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন তা হযরত খাদীজা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করেন। এসব গুণাবলীর কথা শ্রবণের পর তিনি মহানবী (সা)-র প্রতি আকৃষ্টা হন এবং নিজ থেকেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে এবং যথানিয়মে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অথচ এর আগে বড় বড় কুরায়শ নেতা বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২]

কা'বার পূনঃনির্মাণ ও এক বিরাট ফেতনার অবসান

এ সময় মানুষের মনে মহানবী (সা)-এর সততা ও আমানতদারীর প্রভাব এতটা ছিল যে, লোকে তাঁর নাম ধরে ডাকত না, বরং 'আস-সাদিক' কিংবা 'আল-আমীন' বলে ডাকত। মহানবী (সা)-র বয়স এ সময় ৩৫ বছর। প্লাবনের কারণে এ সময় কা'বার দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয়। ফলে সংস্কারের লক্ষ্যে কুরায়শরা কা'বার পুনঃনির্মাণে হাত দেয়।[৩] এতে দল-মত-নির্বিশেষে সকলে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু গোল বাঁধল হজরে আসওয়াদ নামক পবিত্র ও মুবারক কালো পাথরটিকে যথাস্থানে স্থাপন করা নিয়ে। সকলেরই দাবি এ কাজ সেই করবে। এ দাবিতে কেউ কাউকে এতটুকু ছাড় দিতে রাজী নয়। শেষমেষ অবস্থা প্রকাশ্য সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

সেকালে আরবে এক নিয়ম ছিল, কেউ যখন কোন কিছু হাসিলের লক্ষ্যে জান বিলিয়ে দেবার কসম খেত তখন রক্তভর্তি পেয়ালা এনে হাজির করা হতো। এরপর

---

১. সুনানে ইবনে দাউদ, কিতাবুল আদাব।

২. হযরত খাদীজা (রা.)-এর বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সিরিয়া গমনের আলোচনা করেছেন হাকেম তদীয় মুস্তাদরাক নামক গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ১৮২) এবং ইমাম যাহবী-এর সত্যায়ন করেছেন। বিয়ের কথাও ইমাম হাকেম উল্লেখ করেছেন। যুরকানী বিস্তারিতভাবে তা তুলে ধরেছেন।

৩. মুসান্নিফ আবদুর রায্যাক, ৫ম খণ্ড, ১০২।

সকলে সেই পেয়ালায় হাত ডুবিয়ে কসম খেত। এ সময় এই নিয়মও পালিত হয়। এ অবস্থায় কেটে যায় চার দিন। পঞ্চম দিনে আবূ উমাইয়া ইবনে মুগীরা নামক একজন বর্ষীয়ান কুরায়শ নেতা পরামর্শ দিলেন, দেখো, তোমরা এ নিয়ে লড়াই-ঝগড়া করো না। তোমরা বরং এক কাজ কর। আগামীকাল ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম হারাম শরীফে প্রবেশ করবে তোমরা তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে নাও। এরপর তিনি যেই ফয়সালা দেবেন তোমরা তাই মেনে নাও। সকলেই তার পরামর্শ মেনে নিল। আল্লাহর কী কুদরত দেখুন! পরদিন সকালে ।هذا মহানবী (সা)-ই কা'বা শরীফে সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন। মহানবী (সা.) কে দেখতেই সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, لامين رضيناه। এই যে, আমাদের আল-আমীন এসে গেছেন! আমরা তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে রাজী আছি। মহানবী (সা) তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও গভীর প্রজ্ঞার সাহায্যে এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যা তারা সকলেই মেনে নিল। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার ওপর কাল পাথরটিকে রাখলেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকল গোত্র প্রধানকে ডাকলেন এবং চাদরের প্রান্তদেশ ধরে ওঠাতে বললেন। এভাবে সকলে মিলে পাথরটিকে কা'বার পার্শ্বে নিয়ে চলল। অতঃপর তিনি পাথরটিকে স্বহস্তে উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।[১] মহানবী (সা)-র এই সংক্ষিপ্ত সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আরব কুরায়শরা একটি রক্তক্ষয়ী আন্তঃযুদ্ধের হাত থেকে বেঁচে গেল। নইলে যেই আরব সর্বাগ্রে পশু পালের পানি পান নিয়ে, ঘোড় দৌড়, কাব্য-কবিতায় এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রের স্তুতি কিংবা নিন্দা বর্ণনা নিয়ে, এমন কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও ছেঁদো কথা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করত যা নিয়ে অনেক সময় বছরের পর বছর গড়িয়ে যেত। এই ঘটনার এরূপ সুন্দর নিষ্পত্তি না হলে একে কেন্দ্র করেও অনুরূপ কোন কিছু ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না।

আসমানী প্রশিক্ষণ

শৈশব, কৈশোর তথা যৌবনেও যখন তিনি নবী হননি কিংবা রিসালত দ্বারা তাঁকে ভূষিত করা হয়নি সে সময়ও তিনি শির্ক ও কুফর থেকে পরহেয করেছেন, এড়িয়ে চলেছেন। একবার তাঁর সামনে কুরায়শরা খাবার এনে রাখল। খাবারগুলো ছিল মূর্তির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ। এর ভেতর যে গোশ্‌ত ছিল তা ছিল মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত ও যবাহকৃত পশুর গোশ্‌ত। তিনি এ খাবার খেতে অস্বীকার করেন।[২] তিনি নবূওত লাভের পূর্ব থেকেই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ও এর অনিষ্ট

১. মুসনাদ আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৪২৫; মুস্তাদরাক হাকেম, ৩য় খণ্ড, ৪৫৮।
২. বুখারী কিতাবুল মানাকিব।

সম্পর্কে কথা বলতেন এবং যেসব লোকের ওপর তাঁর আস্থা ছিল তিনি তাদেরকে এর থেকে নিষেধ করতেন।[১]

রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন সেই যুগে মক্কা ছিল মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্র। খোদ কা'বা শরীফের ভেতরই ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রসূল (সা)-এর খান্দানের বড় বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, তারাই ছিল এই ঘরের মুতাওয়াল্লী ও চাবিবাহক। রসূল আকরাম (সা) কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেন নি। এছাড়া জাহিলী নানাবিধ রসম-রেওয়াজেও তিনি কখনো শরীক হননি। কুরায়শরা এরই ওপর ভিত্তি করে যে, তাদেরকে সাধারণ লোকদের থেকে প্রতিটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে, নিয়ম করেছিল, হজ্জের দিনগুলোতে আরাফাত ময়দানে যোগদান তাদের জন্য জরুরী নয়। আর যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ করতে আসবে তারা কুরায়শদের পোশাক পরিধান করবে, নইলে উলঙ্গ হয়ে কা'বা তওয়াফ করবে। আর এরই ওপর ভিত্তি করে উলঙ্গ হয়ে কা'বা তওয়াফ করার সাধারণ রেওয়াজ চালু হয়ে যায়। কিন্তু মহানবী (সা) এসব ব্যাপারে কখনো তাঁর খান্দাক্বান সমর্থন কিংবা সহযোগিতা করেন নি।[২]

আরবে রূপকথা বর্ণনার সাধারণ রেওয়াজ ছিল। রাতের বেলা তারা সমস্ত কাজ-কাম থেকে মুক্ত হয়ে কোন এক জায়গায় সমবেত হতো। এদের মধ্যে যে এ বিষয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ হতো সে রূপকথা বলা শুরু করত। লোকে খুবই আগ্রহ ভরে এসব শুনত আর রাতের পর রাত কাটিয়ে দিত। শৈশবে একবার তিনি এ ধরনের এক আসরে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। কৌতূহলবশে তা দেখার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং এক সময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে! আরেক বারও এমনটিই ঘটেছিল। ফলে নবূওত-পূর্ব চল্লিশ বছরের জীবনে দু'বারই এ ধরনের ইচ্ছে তাঁর মনে জেগেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানী তাঁকে দু'বারই এর থেকে হেফাজত করেছিল।[৩] কেননা মহানবী (সা)-র মহান সত্তা এসবের ঊর্ধ্বে ছিল।

মানবতার সুবহে সাদিক ও মহানবী (সা)-র নবূওত লাভ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবূওত লাভের মুহূর্ত যত ঘনিয়ে আসছিল ততই তাঁর মেযাজে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় ছাতু ও পানি নিয়ে শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২১৬ পৃ.; তাবারানীর মু'জাম-ই কবীর, ৫ম খণ্ড, ৮৮ পৃ.।
২. বুখারীতেও এর উল্লেখ রয়েছে।
৩. সুহায়লীর আর-রওদুল-উনুফ, ১ম খণ্ড, ১১৩।

হেরা নামক পর্বতের এক নির্জন গুহায় চলে যেতেন এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করতেন। এই ইবাদতে আল্লাহর যিক্‌রও শামিল ছিল, শামিল ছিল আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের প্রতি ধ্যান-জ্ঞানও। যতদিন ছাতু ও পানি নিঃশেষ না হয়ে যেত ততদিন তিনি নগরীতে ফিরে আসতেন না। এ সময় তিনি প্রায় স্বপ্ন দেখতেন। রাতের বেলা যেই স্বপ্ন দেখতেন দিনের বেলা তা সত্য হয়ে দেখা দিত।

একদিন তিনি নিত্য দিনের ন্যায় হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন। এমন সময় তিনি সামনে একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ করে বললেন, আপনি পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পাঠক নই, আমি পড়তে জানি না। ফেরেশ্‌তা তখন মহানবী (সা)-কে বুকের সঙ্গে এমনভাবে জাপটে ধরলেন যে, তাঁর জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। এরপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন। মহানবী (সা) বললেন, আমি পাঠক নই, আমি পড়তে জানি না। ফেরেশতা আবার সর্বশক্তি দিয়ে মহানবী (সা)-কে জাপটে ধরলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, এবার পড়ুন। তিনি আবার বললেন, আমি পাঠক নই, আমি পড়তে জানি না। ফেরেশতা আবার সর্বশক্তি সহযোগে মহানবী (সা)–কে জাপটে ধরলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ

'পরম দাতা ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে'

"পাঠ কর তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না"।

[সূরা 'আলাক ঃ ১- ৫ আয়াত]

এই ঘটনার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে ঘরে ফিরে আসেন এবং শয্যায় আশ্রয় নেন। স্ত্রী বিবি খাদীজাতুল কুবরা (রা)-কে বললেন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। এরপর তিনি যখন কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন তখন স্ত্রীকে বললেন, আমি এমন এক ঘটনা দেখতে পাচ্ছি যে, ভয় পেয়ে গেছি। আমি জীবনের আশংকাবোধ করছি। স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা) নবী করীম (সা)-কে অভয় বাণী ও সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি দেখছি, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য বলেন, ইয়াতীম বিধবা

ও অসহায় দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন, বিপদগ্রস্তদের সমবেদনা জানান। আল্লাহ কখনোই আপনাকে বিপদে ফেলবেন না, লাঞ্ছিত করবেন না।

এরপর হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নিজেও চিত্তের প্রশান্তি লাভের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা হিব্রু ভাষা জানতেন এবং তিনি তওরীত ও ইনজীল সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা)-র অনুরোধে নবী করীম (সা) ওয়ারাকার সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা জিবরীলের আগমনের বৃত্তান্তসহ যাবতীয় ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলেন। ওয়ারাকা এই ঘটনা শুনতেই বলে উঠলেন, ইনিতো সেই নামূস যিনি মূসা (আ)-র কাছে এসেছিলেন। হায়! আমি যদি যুবক হতাম। হায়! আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেবে! একথা শুনে মহানবী রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার কওম কি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, এর আগে দুনিয়াতে যাঁরাই আপনার ন্যায় এরূপ বাণী পেয়েছেন সূচনাতেই তাঁদেরকে এরূপ শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হায়! আমি যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে আমি আপনাকে সাহায্য করব।[১]

এরপর একদিন ফেরেশতা জিবরীল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে তাঁকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে গেলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর সামনে নিজে ওযূ করলেন। মহানবী (সা) নিজেও ওযূ করলেন। এরপর উভয়ে একত্রে নামায পড়লেন। ফেরেশতা জিবরীল এতে ইমামতি করেন।

ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রচার শুরু করে দিলেন। বিবি খাদীজা (রা), আলী (পিতৃব্য পুত্র, বয়স আট বছর), আবূ বকর (বন্ধু), যায়দ ইবনে হারিছা (মুক্ত দাস) প্রথম দিনেই ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যান। এই সব ব্যক্তির ঈমান আনা, যাঁরা মহানবী (সা)-র চল্লিশ বছরের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে শুরু করে সকল বিষয়েই অবহিত ছিলেন- নবী করীম (সা)-এর সর্বোচ্চ মানের সততা ও বিশ্বস্ততার উজ্জ্বল দলীল। এর কয়েক দিন পরই বেলাল, ওমর ইবনে আমবাসা ও খালিদ ইবনে সাঈদ মুসলমান হয়ে যান। আবূ বকর (রা) ছিলেন বিরাট ধনী মানুষ। তিনি ব্যবসা করতেন। মক্কায় তাঁর দোকান-পাট ছিল। লোকের সাথে তাঁর খুবই মেলামেশা ছিল, ছিল ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা। তাঁর প্রচারে

১. পুরো ঘটনা সহীহ বুখারীর بدء الوحى অধ্যায়, সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমান-এ বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এ সময় নবী করীম (সা)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। আল-আনসাব, বালাযুরী, ১ম খণ্ড, ১১১পৃ.।

হযরত উছমান গনী, যুবায়র ইবনুল আওয়াম ও তালহা, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) মুসলমান হন। এরপর আবূ উবায়দা ইবনু'ল জার্রাহ, পরবর্তীতে যাঁর উপাধি হয়েছিল আমীনুল-উম্মাহ, আবদুল আসাদ ইবনে বেলাল, উছমান ইবনে মাজঊন, আমের ইবনে ফুহায়রা ইয্দী, আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা. সায়েব ইবনে উছমান ইবনে মাজঊন ও আরকাম মুসলমান হন। উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল-কুবরা (রা)-র পর মহিলাদের মধ্যে হযরতের চাচা আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল-ফযল, আসমা বিনতে 'উমায়স, আসমা বিনতে আবূ বকর ও ওমর ফারূকের বোন ফাতেমা (রা) ইসলাম কবুল করেন।[১]

এ সময় মুসলমানরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন। একবার নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে কোন গিরিগুহায় নামায পড়ছিলেন। এমন সময় সেখানে পিতৃব্য আবূ তালিব হঠাৎ করেই এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদের এই নতুন পন্থায় ইবাদতরত দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন। সেখানেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং গভীরভাবে তা নিরীক্ষণ করতে থাকেন। নামায শেষ হতেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিজ্ঞেস করেন, এ কোন্ ধর্ম যা তুমি অনুসরণ করছ? উত্তরে নবী করীম (সা) জানান, এটাই আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম। আবূ তালিব বলেন, আমি যদিও এই ধর্ম এখতিয়ার করতে পারছি না, তবে তোমাদের অনুমতি রয়েছে, আর এ ব্যাপারে কেউ তোমাদের প্রতিবন্ধকতা করতে পারবে না।[২]

অতঃপর তিন বছর যাবত নবী করীম (সা) অত্যন্ত সংগোপনে ইসলামের তাবলীগী দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এখন রিসালতের প্রদীপ্ত সূর্য অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে। তাই পরিষ্কার নির্দেশ ঘোষিত হলো فاصدع بما تؤمر অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। অধিকন্তু আরও নির্দেশ এল, وانذر عشيرتك الاقربين তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।[৩]

একদিন তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে বললেন দাওয়াতের আয়োজন করতে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচারের এটাই ছিল পয়লা মওকা। আবদুল মুত্তালিবের সকল খান্দান ও পরিবারকে দাওয়াত দেওয়া হলো। দাওয়াতী মাহফিলে হামযা, আবূ তালিব, আব্বাস সকলেই শরীক ছিলেন। নবী করীম (সা) খাওয়া-দাওয়ার পর দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ করে বললেন যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেই জিনিস নিয়ে এসেছি যা দীন ও দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ভার বহনে

১. সহীহ বুখারী, তিরমিযী, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, মুস্তাদরাক ও মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বার বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসব হযরতের ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী হবার কথা বিদ্যমান।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত, ২১০পৃ.।

কে আমাকে সাহায্য করবে, সঙ্গী হবে? সমগ্র মাহফিল পিন-পতন নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। অকস্মাৎ মাহফিলের এক কোণ থেকে হযরত আলী (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যদিও আমার চোখে বিঘ্ন, ঠ্যাংগুলো সরু ও পাতলা আর আমার বয়স যদিও কম, তদ্‌সত্ত্বেও আমি আপনাকে সহযোগিতা করব, সঙ্গী হব, সাথী হব। কুরায়শদের জন্য এ ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য যে, দু'জন মানুষ (যাঁদের একজন তের বছর বয়সের কিশোর) দুনিয়ার ভাগ্যের ফয়সালা করছে। উপস্থিত সকলেই তাঁর কথা শুনে (বিদ্রূপের হাসি) হেসে ফেলল। কিন্তু সামনে গিয়ে যমানা বাৎলে দিয়েছে যে, উচ্চারিত শব্দের প্রতিটি হরফ সত্য ছিল, এর এক বিন্দুও মিথ্যা কিংবা অতিশয়োক্তি ছিল না।

একদিন নবী করীম (সা) সাফা পর্বতের ওপর আরোহণ পূর্বক[১] লোকদের ডাকতে শুরু করলেন। ডাক শুনে যখন সকলেই পর্বতের পাদদেশে জমায়েত হলো তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমরাই বল, তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে মনে কর নাকি মিথ্যাবাদী? সকলেই সমস্বরে উত্তর দিল, আমরা আজ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে কোনরূপ মিথ্যা কিংবা বাজে কথা বলতে শুনি নি। আমরা তো তোমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেই জানি। তখন নবী করীম (সা) বললেন, দেখ, আমি পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি আর তোমরা আছ এর পাদদেশে। আমি পর্বতের এপাশ-ওপাশ দু'পাশই দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি বলি, একদল সশস্ত্র লোক মক্কায় তোমাদের ওপর হামলা করবার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। কেননা তোমার মত সত্যবাদী লোককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার কোনই কারণ নেই, বিশেষত তুমি যখন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং পর্বতের উভয় পার্শ্বই দেখতে পাচ্ছ। নবী করীম (সা) বললেন, এতক্ষণে আমি যা বললাম তা ছিল একটি দৃষ্টান্ত যা তোমাদের বোঝাবার জন্য বলেছি।

এখন তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখ, মৃত্যু তোমাদের মাথার ওপর নেমে আসছে এবং তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হতে হবে। আর আমি মৃত্যু পরবর্তী জগত সেভাবে দেখছি যেভাবে তোমরা দুনিয়াটা দেখছ। নবী করীম (সা)-এর এই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ওয়াজের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নবুওতের জন্য তিনি এমন একটা দৃষ্টান্ত পেশ করবেন, কিভাবে একজন মানুষ পারলৌকিক জগত দেখতে পারে যেখানে হাজারও মানুষ তা দেখতে পারে না।[২]

---

১. সীরাতুন্নবী, ১মখণ্ড, ২১০পৃ। তারীখে তাবারী ও তফসীরে তাবারী। আল্লামা শিবলী এটা পষ্ট করে দিয়েছেন, এই বর্ণনা দুর্বল। ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে, ইবনে কাছীর তদীয় তফসীরে, ইবনে সা'দ তাবাকাতে ও অন্যান্য সীরাতকার এই বর্ণনা উদ্ধৃত করলেও কোন বর্ণনাই দুর্বলতামুক্ত নয়।

২. তৌহীদের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো।

নেমে এল কাফির-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার

ইতোমধ্যে মুসলমানদের একটা নির্ভরযোগ্য সংখ্যক লোকের জামা'আত তৈরী হয়ে গিয়েছিল যাদের সংখ্যা চল্লিশের বেশি ছিল। একদিন নবী করীম (সা) কা'বা শরীফে গিয়ে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের ঘোষণা দিলেন। কাফিরদের কাছে এটা ছিল হারাম শরীফের সবচে' বড় অবমাননা। সেজন্য হঠাৎ করেই সেখানে হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে লোকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত খাদীজা (রা)-র প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারিছ ইব্ন আবী হালা (রা) খবর মিলতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েন এবং হারাম শরীফে গিয়ে নবী করীম (সা)-কে বাঁচাতে প্রয়াস পান। কিন্তু চতুর্দিক থেকে উত্থিত তলোয়ারের আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদত লাভ করেন। ইসলামের রাস্তায় এটাই ছিল প্রথম রক্ত যদ্দারা মক্কার যমীন রঞ্জিত হয়েছিল।

এরপর নবী করীম (সা) সবাইকে সাধারণভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। প্রতিটি মেলায়, প্রতিটি গলি-ঘুপচি ও পথে-প্রান্তরে যাকে যেখানে পেতেন সেখানে গিয়ে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের সৌন্দর্য ও গুণাবলী তার সামনে তুলে ধরতেন। মূর্তি পূজা, পাথর পূজা ও বৃক্ষ পূজা থেকে মানুষকে ফেরাতে চেষ্টা করতেন। তিনি মানুষকে বোঝাতেন, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তাকে সকল প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ঘাট ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ভাবে। তারা যেন এই বিশ্বাস রাখে, আসমান-যমীন, চাঁদ-সুরুজ, ছোট-বড় সব কিছুই আল্লাহ্র সৃষ্টি। তিনিই এসব পয়দা করেছেন। সব কিছুই তাঁর মুহতাজ, তাঁর মুখাপেক্ষী। দো'আ কবুল করা, রোগীকে রোগমুক্ত করা, তাকে সুস্থতা দান করা, মানুষের সকল চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সবই আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আল্লাহ্র হুকুম ও মর্জির বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না।

আরবে উকায, উয়ায়না ও যিল -মাজায নামক মেলা ছিল বিখ্যাত। দূর-দরাজ এলাকা থেকে মানুষ এসব মেলায় যোগ দিত। নবী করীম (সা) সে সব মেলায় গমন করতেন এবং আগত লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রচার করতেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিতেন।[১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দাওয়াতের ঘোষণা দেন এবং মূর্তি পূজার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ করতে শুরু করেন তখন কুরায়শদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবূ তালিবের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। আবূ তালিব নম্র ভাষায় তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিদায় দেন। কিন্তু বিবাদের মূল বিষয়

১. ইমাম তিরমিযী তদীয় সুনান গ্রন্থে, ইমাম হাকেম মুস্তাদরাকে, ইমাম আহমদ মুসনাদে ও সীরাতকারিগণ তাঁদের গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম যাহবী একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

বহাল থাকায় অর্থাৎ মহানবী (সা) আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে বিরত না হওয়ায় উক্ত প্রতিনিধিদল পুনরায় আবূ তালিবের সমীপে হাজির হয়। এই দলে সকল কুরায়শ নেতাই অর্থাৎ ওৎবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ, আবূ সুফিয়ান, আস ইবনে হিকাম, আবু জেহেল, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল প্রমুখ শরীক ছিল। তারা আবূ তালিবকে বলল, তোমাদের ভাতিজা আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর অবমাননা করে, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ বলে এবং আমাদেরকে বোকা ঠাওরায়। অতএব, হয় তুমি আমাদের মাঝখান থেকে সরে যাও অথবা তুমিও ময়দানে নেমে পড় যাতে আমাদের উভয়ের মাঝে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যায়। আবূ তালিব দেখতে পেলেন, অবস্থা এখন বড়ই নাযুক হয়ে গেছে। কুরায়শরা আর সহ্য করতে চায় না। আর আমিও একাকী কুরায়শদের মুকাবিলা করতে পারব না। তিনি তখন মহানবী (সা) কে ডেকে বললেন, ভাতিজা! আমার ওপর এতটা বোঝা চাপিও না যা আমি বইতে পারব না।

রসূলুল্লাহ (সা)-র বাহ্যিক পৃষ্ঠপোষক যা ছিলেন এক মাত্র আবূ তালিবই ছিলেন। তিনি এবার পষ্ট অনুভব করলেন, এখন তাঁর পাও টলটলায়মান।

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি চাচাকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর এক হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি আমার দায়িত্ব পালনে ক্ষান্ত হব না। হয় এ কাজ করতে গিয়ে আমি শেষ হয়ে যাব অথবা আল্লাহ পাক আমাকে কামিয়াব করবেন। রসূল আকরাম (সা)-এর এই প্রভাবমণ্ডিত কথা আবূ তালিবকে খুবই প্রভাবিত করে। তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-কে কাছে ডেকে বলেছিলেন, যাও, নিজের কাজ কর গিয়ে। কেউ তোমার একটা পশমও বাঁকা করতে পারবে না।[১]

মহানবী (সা) নিয়ম মাফিক ইসলামের দাওয়াত প্রদানের কাজে ব্যাপৃত রইলেন। কুরায়শরা যদিও মহানবী (সা)-কে হত্যার কথা চিন্তা করতে পারল না কিন্তু তিনি যাতে এ কাজ না করতে পারেন সেজন্য তাঁকে বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিতে লাগল। তারা পথে কাঁটা বিছাত। নামায পড়তে গেলে ময়লা-আবর্জনা তাঁর শরীরের ওপর এনে ফেলত। এছাড়া কটু-কাটব্য ও গালি-গালাজ করত।[২]

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনি'ল -আস (রা) তাঁর স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনার বর্ণনা দেন, "একদিন মহানবী (সা) কা'বা শরীফে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবন আবী মুঈত এসে হাজির হলো। সে তার চাদর পাকিয়ে রশির ন্যায়

১. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, যাহাবীকৃত, ৮৬-৭; মুস্তাদরাক, হাকেমকৃত, ৩য় খণ্ড, ৫৭৭ পৃ।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ২২১পৃ।

বানাল। এরপর রসূলুল্লাহ (সা) সিজদায় যেতেই সে রশির ন্যায় চাদরটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের গলায় ফাস আকারে ফেলে মোচড়ের পর মোচড় দিতে লাগল। ফলে ফাসের কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-র দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। এতদ্‌সত্ত্বেও হুযূর আকরাম (সা) পরিপূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে সিজদায় পড়ে থাকলেন। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে হযরত আবূ বকর দৌড়ে আসেন, ধাক্কা দিয়ে উকবাকে সরিয়ে দেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقدجاءكم بالبينات ـ

'তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে যিনি বলেন, আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ ও তিনি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণসহ আগমন করেছেন?' এ সময় কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে বেদম প্রহার করে।"[১]

আরেক দিনের ঘটনা। মহানবী (সা) কা'বা শরীফে নামায পড়ছেন। কুরায়শরাও কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে বসল। এদের মধ্যে আবূ জেহেলও ছিল। সে বলল, আজ শহরে অমুক জায়গায় উট যবাই করা হয়েছে। উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এদিক সেদিক পড়ে আছে। কেউ গিয়ে সেগুলো নিয়ে এসো এবং মুহাম্মদের মাথার ওপর চাপিয়ে দাও। হতভাগা উকবা উঠে দাঁড়াল এবং গিয়ে সেগুলো নিয়ে এল। এরপর মহানবী (সা) সিজদায় যেতেই তাঁর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিল। হুযূর আকরাম (সা) তখন তাঁর পরম প্রভুর ধ্যানে মত্ত। তিনি এর কিছুই জানতে পারেন নি। শয়তানগুলো মহানবী (সা)-এর এই দৃশ্যে উল্লাসে মেতে উঠল এবং একজন আরেক জনের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কাফিরদের সংখ্যা বেশী থাকায় তিনি সামনে এগুতে সাহস পাননি। এমন সময় মা'সূম সাইয়েদা ফাতেমা (রা) এসে হাজির হন এবং পিতার পিঠের ওপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে পিতাকে মুক্ত করেন। কাফিরদের এই ঘৃণ্য কাজের জন্য তিনি তাদের ভর্ৎসনাও করেন।[২]

একবার কুরায়শ কাফিরদের একটি বৈঠক বসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় আগত লোকদের মহানবী (সা)-র সংস্রব থেকে দূরে রাখার নিমিত্ত কৌশল খুঁজে বের করা। একজন বলল, আমরা বলব যে, সে একজন গণক। অতএব, কেউ যেন তাঁর পাশে না যায়। একথা শুনে প্রবীণ কুরায়শ নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বলল, আমি বহু গণক দেখেছি। গণকের কথার সঙ্গে মুহাম্মদের কথার আদৌ মিল নেই। না, একথা বলা যাবে না। কেননা এতে করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের

১. সহীহ বুখারী, বুনয়ানুল -কা'বা অধ্যায়।
২. সহীহ বুখারী, বুনয়ানুল কা'বা শীর্ষক অধ্যায়।

লোকেরা আমাদেরকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। একজন বলল, আমরা মুহাম্মদকে পাগল বলব। ওয়ালীদ পুনরায় বলল, মুহাম্মদের সঙ্গে পাগলামীর সম্পর্ক কী? একজন প্রস্তাব করল, মুহাম্মদকে কবি বলা যাক। ওয়ালীদ এ প্রস্তাবও সরাসরি এই বলে প্রত্যাখ্যান করল, কাব্য-কবিতা কাকে বলে তা আমরা জানি। মুহাম্মদের কথার সাথে কবিতা বা কাব্যের আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই, নেই কোন সামঞ্জস্য। এরপর আরেক জন প্রস্তাব করল, তবে তাঁকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ প্রত্যুত্তরে জানাল, মুহাম্মদ যেরূপ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিপূর্ণ পরিবেশে থাকেন, যাদুকরদের ভেতর তুমি তা কোথায় পাবে? যাদুকরদের যেই অলুক্ষণে চেহারা-সূরত, যেই পূতিগন্ধময় অভ্যাস তা আরেক জগতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে মুহাম্মদের মিল কোথায়? এবার সবাই হার মেনে তাকেই ধরে বসল, তাহলে চাচা, আপনিই বলুন যে, এখন আমরা কি করব? কি করা উচিত? ওয়ালীদ তখন বলল, আসলে সত্য বলতে কি, মুহাম্মদের কথার ভেতর আজীব ধরনের মিষ্টতা আছে। তাঁর কথাবার্তাই এক অপরূপ স্বাদের। হ্যাঁ, আমরা বরং এই বলতে পারি, তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত কথার প্রতিক্রিয়া এমন যার ফলে পিতা থেকে পুত্র, ভাই থেকে ভাই ও স্বামী থেকে স্ত্রী পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য তাঁকে আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। সকলেই ওয়ালীদের এই কথা এক বাক্যে সমর্থন করল। এর পর থেকে তারা মক্কা থেকে বহির্গামী সড়কগুলোর মোড়ে মোড়ে আসন গেড়ে বসল। কোন নবাগত পথিক ও মুসাফির দেখলেই তাকে ঘিরে ধরত এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে না যাবার জন্য সতর্ক করত ও ভয় দেখাত।[১]

মহানবী (সা)-র সঙ্গে ওৎবার আলোচনা

মক্কার কাফিররা যখন দেখতে পেল, মুহাম্মদ (সা) কোনক্রমেই দাওয়াত ও তবলীগ ছাড়ছেন না এবং তিনি তা ছাড়তে ইচ্ছুকও নন, তখন তারা পরামর্শ করল, চল, আমরা মুহাম্মদকে প্রথমে লোভ দেখাই। তাতেও যদিও কাজ না হয় তাহলে তাঁকে ধমক লাগাব। আশা করি এতেই কাজ হবে। মক্কার বিখ্যাত সর্দার ওৎবা একথা শুনে বলে উঠল, দেখ! আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি এবং এর একটা নিষ্পত্তি করে আসছি। এই বলে সে রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেল এবং বলল ঃ

"মুহাম্মদ, ভাতিজা আমার! যদি তুমি তোমার এ সব কর্মকাণ্ড দ্বারা ধন-সম্পদ জমা করতে চাও তাহলে মিছেমিছি অনর্থ সৃষ্টি করে লাভ কী? আমরা নিজেরাই এত ধন-সম্পদ জমা করে তোমাকে দিচ্ছি যে,তুমি সবচে' বড় ধনী হয়ে যাবে। আর যদি ইযযত-সম্মানের ভিখারী হও তাহলে তাও বল, আমরা তোমাকে আমাদের

১. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা. যাহাবীকৃত, ৮৯-৯০পৃ.।

সকলের নেতা হিসেবে বরণ করে নিচ্ছি। আর যদি রাজত্বের আকাঙ্ক্ষী হও তাহলে আমরা তোমাকে আরবের বাদশাহ বানিয়ে দিই। তুমি যা চাও তাই পাবে। কেবল শর্ত একটাই, তুমি তোমার এ সব পথ ছেড়ে দাও। আর হ্যাঁ, যদি তোমার মাথায় কোন গোলমাল দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তাও বল, আমরা তোমরা চিকিৎসা করাই।

মহানবী (সা) এতক্ষণ চুপ করে ওৎবার কথা শুনছিলেন। ওৎবা থামতেই তিনি বললেন ঃ এতক্ষণ তুমি আমার সম্পর্কে যা বললে তার একটিও ঠিক নয়। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও ইযযত-হুকূমত কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই। আর আমার মাথায়ও কোন গোলমাল নেই। আমি কি চাই তা কুরআন করীমের নিম্নোক্ত বাণী শুনলেই তুমি জানতে পারবে। এরপর তিনি সূরা হা-মীম -আস-সাজদা থেকে তেলাওয়াত করলেন ঃ

حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۔ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۔ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۔ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۔ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۔

"হা-মীম; এটা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। এটা এক কিতাব বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শুনবে না। ওরা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি'। বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব, তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর'। দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত দেয় না এবং ওরা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার"। [১-৮ আয়াত]

কালাম পাক শুনতেই ওৎবার ওপর এক ধরনের মোহিনী শক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে হাতের ওপর ভর করে ঘাড় পেছনে দিয়ে শুনতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত চুপচাপ উঠে চলে গেল। ওৎবা যখন ফিরে গেল তখন আর সেই আগের ওৎবা ছিল না। কুরায়শ সর্দাররাও যখন দেখতে পেল তখন বলল, দেখ, এখান থেকে যাবার সময় যেই চেহারা নিয়ে গিয়েছিল সেই চেহারা কিন্তু এখন তার নেই। তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি দেখলে, কি শুনলে আর সে কী বলল? ওৎবা বলল, কুরায়শগণ! আমি এমন এক কালাম শুনে এসেছি যা না গণকের কথা, না কবির কাব্য। তা কোন যাদু-মন্ত্রও নয়। তোমরা আমার কথা শোন, আমার মত মতো চল। মুহাম্মদকে তাঁর নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। লোকেরা ওৎবার কথা শুনে বলে উঠল, লে বাবা! মুহাম্মদের যাদু দেখি তোমাকেও কাবু করে ফেলেছে![১]

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহানবী (সা)-র আলোচনা

এই ব্যর্থতার পর কুরায়শরা পরামর্শ করল, মুহাম্মদকে কওমের সামনে ডেকে নিয়ে তাঁকে বোঝানো দরকার। পরামর্শের পর তারা মহানবী (সা)-এর কাছে খবর পাঠাল এই বলে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ আপনার অপেক্ষা করছেন। তারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। নেতৃবৃন্দ কা'বার ভেতর সমবেত হয়েছেন। মহানবী (সা) হৃষ্ট চিত্তে সেখানে গেলেন। কেননা কুরায়শ নেতৃবর্গ ঈমান আনুক এটাই ছিল তাঁর আন্তরিক অভিলাষ। মহানবী (সা) সেখানে গিয়ে বসলে তারা এভাবে কথার সূত্রপাত করল ঃ

"মুহাম্মদ ! কথা বলার জন্য আমরা তোমাকে এখানে ডেকেছি। আল্লাহর কসম! আমরা জানি না এর আগে আর কেউ তার জাতির ওপর এত বড় বিপদ ডেকে এনেছে যতটা তুমি তোমার জাতির ওপর ডেকে এনেছ। এমন কোন অমঙ্গল নেই যা তোমার কারণে আমাদের ওপর এসে পড়ে নি। এখন তুমিই বল, যদি তুমি এই নতুন ধর্মের মাধ্যমে বিত্ত-সম্পদ জমা করতে চাও তাহলে আমরা তোমার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ জমা করে দেব যতটা সম্পদ আমাদের কারুর হাতেই নেই। আর যদি মান-সম্মান ও আভিজাত্য অর্জনের প্রত্যাশী হয়ে থাক তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সর্দার বানিয়ে দেই। আর যদি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের "সম্রাট" বানিয়ে দিই। আর যদি তুমি মনে করো, তুমি যা দেখতে পাও তা কোন জিন্ন যা তোমার ওপর চেপে বসেছে তাহলে যাদুটোনার সাহায্যে তোমাকে সারিয়ে তুলবার জন্য

১. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ১ম খণ্ড, ৪৮৬-৮৭; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১৪শ খণ্ড, ২৯৫ পৃ. যাহাবীকৃত আস-সীরাতুন -নাবাবিয়্যা, ৯১-৯২ পৃ.।

যত টাকাই লাগুক, আমরা তোমার জন্য ব্যয় করব। আর তা না পারলে কওম তোমাকে মা'যূর ভাববে।"

তাদের কথা শেষ হতে রসূল আকরাম (সা) বললেন,

"তোমরা এতক্ষণ যা বললে তার সাথে আমার আদৌ সম্পর্ক নেই। আমি যেই শিক্ষা ও তালীম নিয়ে এসেছি তা বিত্ত-সম্পদ কামনার জন্য নয়, নয় তা পদমর্যাদা ও সাম্রাজ্য লাভের জন্য। আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি আমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি এবং খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি।

"এখন তোমরা যদি আমার পেশকৃত শিক্ষামালা ও তা'লীমাত গ্রহণ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের পুঁজি হবে। আর তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে আমি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করব যে, তিনি আমার ও তোমাদের জন্য কী ফয়সালা পাঠান।"

কুরায়শ নেতৃবর্গ বলল,

"আচ্ছা, মুহাম্মদ ! তুমি যদি আমাদের কথা না-ই মান, তাহলে অন্তত একটা কথা আমাদের শোন। তোমার জানা আছে, কী কঠিন সংকট ও দুঃসহ অবস্থার ভেতর দিয়ে আমাদের সময় কাটে। পানির অভাব আমাদের প্রকট আর আমাদের দিন গুজরান হয় কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে। এখন তুমি তোমার আল্লাহ্র কাছে চাও যাতে তিনি এই সব পাহাড়-পর্বত আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে দেন যাতে করে আমাদের শহর প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া আমাদের জন্য নদী- নালা বইয়ে দাও যেমনটি সিরিয়া ও ইরাকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। অধিকন্ত আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জিন্দা করে দাও আর ঐ সব যিন্দার ভেতর আমাদের পূর্বপুরুষ কুসাঈ ইবন কিলাব যেন অবশ্যই থাকে। কেননা তিনি ছিলেন আমাদের সর্দার আর তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। আমরা তাকে তোমার ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করব। যদি তিনি তোমার কথা সত্য বলে মেনে নেন আর তুমি আমাদের প্রার্থিত বস্তুগুলো দিয়ে দাও, চাহিদাগুলো পূরণ কর তাহলে আমরাও তোমাকে সত্য বলে মেনে নেব এবং এও মেনে নেব যে, আল্লাহর দরবারে তোমার একটা মর্যাদা আছে বটে! আর আসলেই তিনি তোমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন যেমনটি তুমি বলছ।"

কুরায়শদের কথার প্রত্যুত্তরে রসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

"আমি ও সব কাজের জন্য রসূল হিসেবে প্রেরিত হইনি। আমি তো রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি সেই তা'লীম তথা শিক্ষামালার নিমিত্ত আর আমি আল্লাহর পয়গাম তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছি। তোমরা যদি তা কবুল করে নাও তাহলে

তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য তা পুঁজি হবে। আর তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে আমি আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা করব। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে যা ফয়সালা করবার তা তিনিই করবেন।"

কুরায়শ নেতৃবর্গ বলল ঃ "আচ্ছা, তুমি যদি আমাদের জন্য কিছুই না করতে চাও তাহলে স্বয়ং নিজের জন্যই তুমি আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাও, তিনি তোমার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিন যিনি বলবেন, এই লোক সত্যবাদী এবং তিনি আমাদেরকে তোমার বিরোধিতা করতে নিষেধ করে দেবেন। আর হ্যাঁ, তুমি এও চাও, তোমার জন্য এই মরুভূমির বুকে একটা বাগান যেন বানিয়ে দেওয়া হয় যার ভেতর বড় বড় প্রাসাদ থাকবে, যেই প্রাসাদে পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-রৌপ্য থাকবে। এসবের তোমার প্রয়োজনও আছে।

"এখন পর্যন্ত তো তুমি নিজেই বাজারে যাও এবং নিজের রুটি-রুজির তালাশও তুমিই কর, তোমাকেই করতে হয়। এসব পাবার পরই কেবল আমরা তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারব এবং মেনে নেব।"

রসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

"আমি এমনটি করব না এবং আল্লাহ্‌র কাছেও কখনও এমনটি চাইব না। আর এজন্য আমাকে পাঠানোও হয় নি । আল্লাহ পাক আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছেন। তোমরা যদি আমাকে ও আমার কথাকে মেনে নাও তাহলে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল ভাল হবে, কল্যাণ হবে। অন্যথায় আমি সবর করব, ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষা করব।"

কুরায়শরা বললঃ আচ্ছা , তুমি তাহলে আসমান ভেঙে টুকরো করে এর একটি টুকরোই না হয় আমাদের ওপর ফেলে দাও। কেননা তোমার ধারণা, আল্লাহ চাইলে এমনটি করতে পারেন। আর তুমি যতক্ষণ তা না করবে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব না।

রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ এমনটি করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। তিনি চাইলে তা করতে পারেন।

কুরায়শরা বললঃ মুহাম্মদ! এটা তো বল, তোমার আল্লাহ তোমাকে কি আগেই বলে দেয় নি, আমরা তোমাকে ডাকব, এ রকম সব প্রশ্ন করব, এসব জিনিস চাইব। আমাদের কথার এই জওয়াব হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এ ধরনের কিছু করার হতো। তোমার আল্লাহ এমনটি করেননি। এজন্য আমরা মনে করি, যা কিছু আমরা শুনেছি তা ঠিকই শুনেছি। আমরা শুনেছি, ইয়ামামার 'রহমান' নামে একটি লোক থাকে আর সেই তোমাকে এ ধরনের কথা শেখায়। আমরা কখখনো রহমানের ওপর ঈমান আনব না। দেখ, আজ আমরা আমাদের

যাবতীয় ওযর-আপত্তির কথা তোমাকেই শুনিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা কসম খেয়ে তোমাকে বলছি, আমরা তোমাকে এ ধরনের শিক্ষা ও তা'লীমের কখনো প্রচার করতে দেব না। চাই কি এতে আমরাই মরি আর তুমিই মারা যাও (কুছ পরওয়া নেই)।

এ পর্যন্ত কথা হতেই তাদের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, "আমরা তো ফেরেশতাদের পূজো করি যারা আল্লাহর কন্যা।" আরেক জন্য ইতোমধ্যেই বলে উঠল ঃ আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের সামনে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের নিয়ে আসছ।

নবী (সা) কুরায়শ নেতৃবর্গের কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দাঁড়াবার সাথে আবদুল্লাহ ইবন আবূ মিয়্যা ইবন মুগীরাও দাঁড়িয়ে গেল। আবদুল্লাহ ছিল নবী করীম (সা)-এর ফুফাতো ভাই (আতেকা ইবন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র)। সে বলল, মুহাম্মদ! দেখ তোমার কওম নিজেদের জন্য কিছু জিনিস চাইল। তুমি তা মানলে না। তারপর তারা চাইল, তুমি স্বয়ং নিজের জন্য এমন কিছু আলামত জাহির কর যদ্দারা তোমার সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হতে পারে। তুমি তাও কবুল করলে না। তারপর তারা নিজেদের জন্য অল্প বিস্তর আযাব চাইল যার ভয় তুমি দেখিয়ে থাক। তুমি তাও স্বীকার করলে না। ব্যস! এখন আর আমি তোমার ওপর কখনোই ঈমান আনব না, চাই কি তুমি সিঁড়ি বেয়ে আসমানেই চড়ে বস, আবার সিঁড়ি বেয়ে মাটিতেই নেমে আস। আর তোমার সাথে যদি চারজন ফেরেশতাও নেমে আসে এবং তারা তোমার সপক্ষে সাক্ষ্যও দেয়, তবুও তোমার ওপর আমি ঈমান আনব না।[১]

নবী করীম (সা) কুরায়শদের দ্বারা এভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অস্বীকৃত হবার পরও তাদের হেদায়েতের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতেন, তাদেরকে বোঝাতেন এবং চাইতেন তারা ইসলাম কবুল করুক। তিনি বলতেন, আমার তা'লীমের মধ্যেই তোমাদের সব কিছু আছে। যেসব সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ঈমান কবুল করেছে এবং নবী করীম (সা) প্রদত্ত শিক্ষামালা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছে তারা কাফিরদের প্রার্থিত বস্তুর চেয়েও বেশী লাভবান হয়েছে।

কুরায়শদের কর্তৃক মুসলিম নির্যাতন

কুরায়শরা যখন দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ (সা)-র ওপর কোন কৌশলই কার্যকর হচ্ছে না, তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছে না তখন তারা সেই সব গরীবের ওপর তাদের রাগ ও মনের ঝাল মেটাতে শুরু করল যাঁরা ইসলাম কবুল করে ছিলেন। যখন বেলা ঠিক দুপুর হতো তখন তারা গরীব ও অসহায় মুসলমানদের ধরে এনে

১. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানীকৃত, ১ম খণ্ড, ২২৮-৩১।

আরবের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দিত। এরপর তাদের বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিত যাতে করে তাঁরা পাশ ফিরতে না পারেন। অতঃপর তাঁদের শরীরের ওপর গরম বালু চাপিয়ে দেওয়া হতো, আগুনে লোহা উত্তপ্ত করে তাদের শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। এছাড়া পানিতে চুবানো হতো।

এ ধরনের নির্যাতন সকল অসহায় মুসলমানের ওপরই চলত। কিন্তু যাঁদের ওপর কুরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও পরিচয় নিচে দেওয়া হলো।[১]

খাব্বাব ইবনুল আরাত ঃ তিনি ছিলেন তামীম গোত্রের। জাহিলিয়াত যুগে তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। উম্মে আনসার নামক জনৈক মহিলা তাকে খরিদ করে। তিনি সে সময় ইসলাম কবুল করেন যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা) দার-ই আরকামে অবস্থান করছিলেন এবং মাত্র ছয় সাত জনের মত ইসলাম কবুল করেছিল। কুরায়শরা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, কষ্ট দিয়েছিল। একদিন জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তার ওপর তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি যাতে পাশ ফিরতে না পারেন সেজন্য তাঁর বুকের ওপর পা তুলে দাবিয়ে রাখা হয়। এভাবে তাঁর শরীরের চাপে জ্বলন্ত অঙ্গার এক সময় নিভে যায়। অনেক কাল পর হযরত ওমর (রা)-এর সামনে এই ঘটনার বর্ণনা দান কালে হযরত খাব্বাব (রা) তাঁর পিঠের কাপড় তুলে দেখিয়েছিলেন। সেখানে পোড়া গভীর ক্ষতের চিহ্ন ও সাদা দাগ অক্ষত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা) জাহিলী যুগে কর্মকার ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি পাওনাদারদের কাছে তার বকেয়া পাওনা চাইলে তারা এই বলে জওয়াব দিত, যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম অস্বীকার করবে, এনকার করবে, একটি পাই পয়সাও তুমি পাবে না। জওয়াবে হযরত খাব্বাব (রা) বলতেন, এটা অসম্ভব যতদিন না তোমরা মরে আবার জীবন ফিরে পাও।[২]

হযরত বিলাল (রা) ঃ ইনিতো সেই বেলাল যিনি সারা দুনিয়ায় মুআযযিন হিসাবে মশহুর! বর্তমান ইথিওপিয়া (অপর নাম আবিসিনিয়া)-র অধিবাসী এবং উমাইয়া ইব্‌ন খালফের গোলাম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর মনিব উমাইয়া দুপুরের তপ্ত রৌদ্রে জ্বলন্ত বালুর ওপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিত যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। তারপর তাঁকে লক্ষ করে বলা হতো ইসলাম ত্যাগ করতে। নইলে এভাবে তাঁকে তিল তিল করে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হতো। এ সময় মুখে তিনি কেবল 'আহাদ' 'আহাদ' অর্থাৎ

২. আল-কামিল, ইবনুল আছীর কৃত, ২য় খণ্ড।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইজারা।

আল্লাহ এক উচ্চারণ করতেন। যখন তিনি কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হলেন না তখন তাঁর গলায় রশি বেঁধে মহল্লার ছেলেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা তাঁকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াল। তখনও তাঁর মুখে সেই একই শব্দ 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)।[১]

আম্মার (রা) ছিলেন ইয়ামনের অধিবাসী। তাঁর পিতা ইয়াসির মক্কায় আগমন করলে আবূ হুযায়ফা মাখযুমী আপন ক্রীতদাসী সুমাইয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেয়। আম্মার (রা) ছিলেন এদেরই সন্তান। এঁরা যখন ইসলাম কবুল করেন তখন কেবল তিনজন ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করায় কুরায়শরা আম্মার (রা)-কে তপ্ত মাটির ওপর শুইয়ে দিত এবং এত মারত যে, তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। তাঁর পিতামাতার সঙ্গেও ঐ একই আচরণ করা হয়।[২]

সুমাইয়া (রা) ছিলেন হযরত আম্মার (রা)-এর মা। ইসলাম গ্রহণ করায় আবূ জেহেল তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত হানে আর এই আঘাতেই তিনি শাহাদত লাভ করেন। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ হবার গৌরব লাভ করেন। ইয়াসির (রা) ছিলেন হযরত আম্মার (রা)-এর পিতা। তিনি কাফিরদের হাতে নির্যাতন ভোগরত অবস্থায় শাহাদত লাভ করেন।[৩]

সুহায়ব (রা) ঃ নবী করীম (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন তখন তিনি ও হযরত আম্মার (রা) একত্রে একই সঙ্গে মহানবী (সা)-র খেদমতে আগমন করেন। তিনি তাঁদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ফলে এঁরা উভয়ে মুসলমান হয়ে যান। কুরায়শরা তাঁর ওপর এত জুলুম নিপীড়ন চালাত যে, তিনি হুশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তিনি যখন মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন তখন কুরায়শরা বলেছিল, যদি তুমি তোমার অর্জিত সব ধন-সম্পদ এখানে রেখে যাও তাহলে যেতে পার। তিনি এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হন। হযরত ওমর (রা) নামায আদায়রত অবস্থায় আহত হলে নিজের জায়গায় তাঁকেই ইমামতির জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।[৪]

আবূ ফুকায়হা (রা) ছিলেন সফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার গোলাম। তিনি হযরত বেলাল (রা)-এর সঙ্গেই ইসলাম কবুল করেন। উমাইয়া তা জানতে পেরে তাঁর পায়ে রশি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াবার জন্য একদল যুবকের হাতে তুলে দেয় এবং তপ্ত রোদে মাটিতে শুইয়ে দেয়। এ অবস্থায় একদিন একটা গুবরে

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২৮৩; মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, ৪০৪।
২. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১৯; আল-কামিল, ২য় খণ্ড, ৬৭।
৩. আল-কামিল, ২য় খণ্ড, ৬৭।
৪. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪৪৯।

পোকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। উমাইয়া সেদিকে ইঙ্গিত করে আবূ ফকায়হা (রা)-কে বলে, এটা তোমার খোদা নয়তো। তিনি তক্ষুণি বলে ওঠেন, আমার ও তোমার উভয়ের খোদা আল্লাহ্ তা'আলা। এতে উমাইয়া ক্রোধান্বিত হয়ে এত জোরে তাঁর গলা টিপে ধরে যে, সকলেই মনে করে তাঁর জীবন বায়ু বেরিয়ে গেছে। একবার তাঁর বুকের ওপর এত বড় পাথর খণ্ড চাপানো হয় যে, তাঁর জিভ বেরিয়ে পড়েছিল।[১]

লুবায়না (রা) ছিলেন ক্রীতদাসী। ইসলাম গ্রহণ করায় ওমর (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি) তাঁকে এত মারতেন যে, তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। এরপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, দাঁড়া, একটু দম নিয়ে নিই। আমি হাঁপিয়ে ওঠায় তোকে মারায় ক্ষান্ত দিয়েছি, অন্য কোন কারণে নয়। এরপর আবার তাঁকে মারতে শুরু করতেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি চরম ধৈর্য ও হিম্মতের পরিচয় দিয়ে ওমরকে বলেছিলেন, ইসলাম কবুল করুন, নইলে আল্লাহ এজন্য প্রতিশোধ নেবেন।[২]

যিন্নায়রা (রা) ছিলেন হযরত ওমর (রা) পরিবারেরই একজন ক্রীতদাসী। ওমর (ইসলাম গ্রহণের আগে) এজন্য তাঁকে ইচ্ছেমত পেটাতেন। আবূ জেহেল তাঁকে এমন মার মেরেছিল যে, এজন্য তাঁর একটি চোখ হারাবার উপক্রম হয়েছিল।[৩]

নাহদিয়া ও উম্মু উবায়স (রা) ছিলেন উভয়েই ক্রীতদাসী। ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁদের উভয়কে ভীষণ নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়।[৪]

হযরত আবূ বকর (রা) এসব নির্যাতিত ও নিপীড়িতদের অধিকাংশকেই বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে খরিদ করত মুক্ত করে দেন। এঁদের মধ্যে হযরত বেলাল, আমের ইবনে ফুহায়রা, লুবায়না, যিন্নায়রা, নাহদিয়া ও উম্মু উবায়স (রা) ছিলেন প্রধান।[৫]

এঁরাই ছিলেন ইসলামের সেসব বীর সন্তান, ইসলাম গ্রহণ করায় কুরায়শরা যাঁদের ওপর দৈহিক নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। এছাড়া আরও অনেকেই ছিলেন যাঁদেরকেও নানা রকম নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল।

হযরত উছমান (রা) ছিলেন বয়সে প্রবীণ এবং প্রভূত সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। ইসলাম গ্রহণ করায় অন্যেরা নয়, স্বয়ং তাঁর চাচাই তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে পেটায়।[৬]

---

১. আল-কামিল, ২য় খণ্ড, ৬৯।
২. আল-কামিল, ২য় খণ্ড, ৬৯।
৩. আল-কামিল, ২য় খণ্ড, ৬৯।
৪. প্রাগুক্ত, ৬৯-৭০পৃ.
৫. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২৮৪; ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফ, ১২শ খণ্ড, ১০। সহীহ বুখারীতেও এ সম্পর্কিত বিবরণ মিলবে।
৬. রাহমাতুল্লিল আলামীন, সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, ১ম খণ্ড, ৫৫।

হযরত আবূ যর (রা) ছিলেন সপ্তম মুসলমান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কা'বা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বীয় ইসলামের ঘোষণা দেন। এতে কুরায়শরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে দেয়।[১]

হযরত যুবায়র ইবনু'ল-আওয়াম (রা) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম। ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর চাচা তাঁকে চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দিত।[২]

হযরত ওমর (রা)-এর চাচাতো ভাই ও ভগ্নীপতি সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।[৩]

পারস্য বিজয়ী হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন খুবই সম্মানিত ও গোত্রের মধ্যে নেতৃস্থানীয় পুরুষ। এতদ্সত্ত্বেও তিনি কুরায়শ কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁর গোত্র বনূ আসাদ ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁকে কঠিন শাস্তি দিত। তখন পর্যন্ত কা'বার হারাম প্রাঙ্গণে কেউ সজোরে কুরআন শরীফ পড়তে পারত না। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বলেন, আমি অবশ্যই এ কাজ করব। লোকে তাঁকে এ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি বিরত হননি। তিনি সোজাসুজি হারাম শরীফে গমন করেন এবং মকামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা রাহমান পাঠ করতে শুরু করেন। অমনি কাফিররা চারিদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁর মুখের ওপর চড়-থাপ্পড় ও ঘুষি মারতে থাকে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাঁর পাঠ অব্যাহত রাখেন এবং যতদূর পড়ার ছিল পড়েই তারপর দম নেন। এরপর আহত ও ফোলা চোখ-মুখ নিয়ে তিনি ঘরে ফেরেন।[৪]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে কুরায়শ কাফিরদের আচরণ

হযরত আবূ বকর (রা) যদিও মক্কার প্রভাবশালী ও সম্মানিত লোকদের অন্যতম ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শদের নির্যাতন ও অপমানের হাত থেকে তিনিও বাঁচতে পারেন নি। একদিন কাফিররা তাঁকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলিত মথিত করেছিল এবং খুবই মেরে ছিল। ওৎবা ইব্ন রবীআ তাঁকে এমন দুই জুতা দিয়ে মেরেছিল যে জুতায় তালি লাগানো ছিল। আঘাতে আঘাতে তাঁর চেহারা ফুলে গিয়েছিল। হাত-পার ছিল বেহাল অবস্থা। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে তুলে নিয়ে যায় এবং ঘরে পৌঁছে দেয়। সবার বিশ্বাস ছিল, আবূ বকর (রা) বাঁচবেন না। সন্ধ্যায় কথা বলার শক্তি ফিরে পেতেই জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্র রসূল (সা) ভাল আছেন তো? এতে তাঁর খান্দানের লোকেরা তাঁকে খুবই ভর্ৎসনা করে

১. সহীহ বুখারী।
২. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ।
৪. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১; উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, ২৮২।

যে, এখনও তাঁর রসূলুল্লাহ (সা)-র চিন্তা যায়নি। ভিড় পাতলা হতেই তিনি তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-র খবর কি? জওয়াবে মা জানান, তিনি এ সংবাদ আদৌ জানেন না। তিনি তাঁর মাকে বলেন উম্মু জামীলের কাছ থেকে জেনে আসতে। উম্মু জামীল খবর পেয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-কে দেখতে আসেন। তিনি এই অবস্থাদৃষ্টে বলেন, যারা আপনার সঙ্গে এই আচরণ করেছে তারা পাপিষ্ঠ, নরাধম ও কাফির। আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা) কেমন আছেন আমাকে আগে তাই বলুন। তিনি জানান, রসূলুল্লাহ (সা) ভাল আছেন। বললেন, কোথায় তিনি? বললেন, ইব্ন আরকামের ঘরে। এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন, আমার জন্য খানাপিনা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম যতক্ষণ না তাঁকে দেখি। রাতের বেলা রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেলে এবং চতুর্দিক নীরবতায় ছেয়ে গেলে তাঁর মা ও উম্মু জামীল তাঁকে ধরে হুযূর আকরাম (রা)-এর খেদমতে নিয়ে যান এবং তিনি যিয়ারত ও মোলাকাত লাভে ধন্য ও তৃপ্ত হন।[১]

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত ও নাজাশীর সামনে হযরত জাফর (রা)-এর বক্তৃতা

মুসলমানদের ওপর কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে যিনি চান্ আপন জীবন ও ঈমান রক্ষার্থে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন।

অনুমতি প্রাপ্তির পর ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার একটি ক্ষুদ্র কাফেলা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন এবং শুআয়বা বন্দরে গিয়ে আবিসিনিয়াগামী জাহাজে আরোহণপূর্বক রওয়ানা হন।[২]

ক্ষুদ্র এই কাফেলার সর্দার ছিলেন হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা)। তদীয় স্ত্রী নবী কন্যা হযরত রুকায়্যা (রা) ছিলেন তাঁর সহগামী। এ সময় আল্লাহর রসূল (সা) বলেছিলেন, ইবরাহীম আলায়হিস-সালামের পর এই প্রথম দম্পতি যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করল।[৩]

এঁদের পেছনে ৮৩জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলার আরেকটি দল মক্কা থেকে বহির্গত হয় এবং আবিসিনিয়া রওয়ানা করে। এঁদের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর ইবন আবী তালিব (রা)-ও ছিলেন। এঁদের পাকড়াও করবার জন্য কুরায়শরা সমুদ্র পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু ততক্ষণে তারা জাহাজে চড়ে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে বন্দর ত্যাগ করেছে।[৪]

---

১. আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড।
২. ফতহুল বারী, ইবন হাজারকৃত, ৭ম খণ্ড, ১৮৯।
৩. তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২০৩।
৪. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ১৮৯।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন খ্রিস্টান। মক্কার কাফিররা উপহার-উপঢৌকনসহ তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হয় এবং আবেদন জানায়, এসব লোক আমাদের দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। ওদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। মুসলমানদের দরবারে ডেকে পাঠানো হলে মুসলমানদের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর (রা) দরবার কক্ষে বাদশাহ্‌কে লক্ষ করে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দেন ঃ

"হে রাজন! আমরা জিহালতের মধ্যে, মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা মূর্তি পূজা করতাম। অপবিত্রতা ও নাপাকের মধ্যে জড়িয়ে ছিলাম। আমরা মৃত জন্তু খেতাম। আমাদের মধ্যে মানবতা ও সত্যিকার মেহমানদারির নাম-নিশানাও ছিল না। প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কোন আনুকূল্য ছিল না। আইন-কানূন বলতে কিছু ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক আমাদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠালেন যাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, তাকওয়া, পরহেযগারী ও পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলাম। তিনি আমাদের এক আল্লাহ্‌র দাওয়াত দিলেন এবং বোঝালেন যে, সেই এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমরা যেন কাউকে শরীক না করি। তিনি আমাদের পাথর পূজা করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, ওয়াদা পালন করতে, গোনাহ থেকে ও পাপ থেকে দূরে থাকতে এবং যাবতীয় খারাপ ও মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে বললেন। তিনি আমাদের নামায পড়তে, যাকাত দিতে, রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। এসব কথা মেনে নেওয়ায় আমাদের কওমের লোকেরা আমাদের ওপর ক্ষেপে গেল। এজন্য তারা আমাদের ওপর যতটা পেরেছে নির্যাতন চালিয়েছে, নিপীড়ন করেছে যাতে আমরা এক আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহুর ইবাদত করা ছেড়ে দিই এবং কাষ্ঠখণ্ড ও পাথরের তৈরী মূর্তির পূজা করি। আমরা তাদের হাতে বহু জুলুম সয়েছি, কষ্ট-তকলীফ ভোগ করেছি। যখন বাধ্য হয়েছি, আর সইতে পারিনি কেবল তখনই আপনার রাজ্যে আশ্রয় নেবার মানসে এখানে এসেছি।"

বক্তৃতা শোনার পর বাদশাহ বললেন, তোমাদের নবীর ওপর যেই কুরআন নাযিল হয়েছে তা থেকে কিছু অংশ পাঠ করে আমাকে শোনাও। হযরত জাফর (রা) তখন সূরা মরিয়ম পাঠ করে শোনান। বাদশাহ্‌র ওপর এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি কাঁদতে থাকেন এবং বলেন, মুহাম্মদ (সা) তো সেই রসূল যাঁর খবর ঈসা মসীহ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমি সেই রসূলের যমানা পেয়েছি। এরপর তিনি মক্কার কাফিরদের দরবার থেকে বের করে দেন।

পরদিন কুরায়শ প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস পুনরায় বাদশাহর দরবারে প্রবেশ অধিকার লাভ করেন এবং বাদশাহ নাজাশীকে বলেন, মহামান্য বাদশাহ! আপনি কি জানেন যে, মুসলমানরা আপনাদের নবী হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি

আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে? নাজাশী মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা এই প্রশ্নের জওয়াব দাও। এবার মুসলমানরা দোটানায় পড়লেন যে, যদি আমরা ঈসা (আ)-এর আল্লাহ্‌র বেটা হওয়াকে অস্বীকার করি তাহলে কি হবে? নাজাশী তো খ্রিস্টান। তিনি এতে নারাজ হবেন। হযরত জাফর (রা) কিন্তু এতে আদৌ ভীত হননি, ভয় পাননি। তিনি বললেন, পরিণতি যা-ই হোক, আমরা সত্যি কথাই বলব।

মোটের ওপর তাঁরা দরবারে হাজির হলেন। বাদশাহ নাজাশী তাদের প্রতি লক্ষ করে বললেন, তোমরা ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম সম্পর্কে কী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ কর? উত্তরে হযরত জাফর (রা) বললেন, "আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, 'ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও পয়গম্বর এবং তাঁর কলেমা।" —একথা শুনতেই নাজাশী মাটি থেকে একটি খড়কুটা তুললেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যা বললে 'ঈসা (আ) তার থেকে এই খড়কুটা পরিমাণও বেশি নন।" দরবারে যেই প্যাট্রিয়ক উপস্থিত ছিলেন, তিনি খুব ক্ষিপ্ত হন এবং রাগে কাঁপতে থাকেন। কিন্তু নাজাশী তার রাগের আদৌ পরওয়া করেন নি। কুরায়শ দূত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে।[১]

হযরত হামযা (রা)-র ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযা (রা) ছিলেন নবী করীম (সা)-এর চাচা। তিনি নবী করীম (সা)-কে খুবই ভালবাসতেন। বয়সে দু'তিন বছরের বড় ছিলেন। এক সাথে খেলাধুলা করতেন। শৈশবে উভয়েই ছুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। আর এদিক দিয়ে উভয়ে দুধ ভাই হতেন। কিন্তু তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সকল কাজ-কর্মকে স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি শৌর্য-বীর্যের প্রতি অনুরক্ত ও শিকারপ্রিয় ছিলেন। সাধারণত ভোর হবার আগেই তিনি তীর-ধনুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং সারাদিন শিকারে ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন। ঘরে ফেরার পথে সর্বপ্রথম তিনি হারাম শরীফে গমন করতেন, তাওয়াফ করতেন। কুরায়শ নেতৃবর্গ হারাম শরীফ প্রাঙ্গণে এ সময় পৃথক পৃথক দরবার জমিয়ে উপবেশন করত। হযরত হামযা (রা) তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন। মন চাইলে কখনোবা তাদের পাশে গিয়ে বসতেন। ফলে সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং সকলেই তাঁকে সম্মান ও সমীহ করত।

নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধীরা যেই নির্দয় আচরণ করত অন্য কেউই তা সইতে পারত না। অপরিচিত লোকও এতে আহত হতো এবং বেদনা

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৩৫; মুসনাদ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, যাহাবীকৃত, ১০১ পৃ; হাকেম-এর মুস্তাদরাক্।

বোধ করত। একদিন আবূ জেহেল নবী করীম (সা)-কে একাকী পেয়ে তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর গোস্তাখী করে। জনৈক দাসী দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে পায়। হযরত হামযা (রা) শিকার থেকে ফিরতেই উক্ত দাসী এই ঘটনার কথা তাঁকে বলে। তিনি রাগে ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়েন এবং তখনই তীর-ধনুক নিয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে হাজির হন এবং ধনুক দিয়ে আবূ জেহেলের মাথায় আঘাত হানেন। তিনি তাকে এও বলেনঃ তোমার এত বড় সাহস যে, তুমি তাঁকে গাল-মন্দ কর এবং তাঁর সঙ্গে গোস্তাখী কর, অথচ আমি তাঁরই দীনের ওপর আছি এবং সে যা বলে আমিও তা বলি। সাহস থাকলে আমাকে যা বলবার বল। কিন্তু আবূ জেহেলের সাহস হয়নি হযরত হামযা (রা)-কে কিছু বলার কিংবা কিছু করার। এভাবে তিনি মুসলমান হয়ে যান।[১]

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

নবী করীম (সা) যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন তখন হযরত ওমর (রা)-এর বয়স সাতাশ বছর। হযরত ওমর (রা)-এর পরিবার তদীয় পিতৃব্য যায়দ-এর দরুন তওহীদের আওয়াজ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। ফলে তদীয় পুত্র সাঈদ প্রথম সুযোগেই ইসলাম কবুল করেন। সাঈদের বিয়ে হয়েছিল হযরত ওমর (রা)-এর বোন ফাতিমার সঙ্গে। ফলে স্বামীর সঙ্গে ফাতিমা (রা)-ও মুসলমান হয়ে যান। উক্ত পরিবারেরই আরেক জন বুযর্গ নু'আয়ম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম কবুল করেছিলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রা) তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিত ছিলেন। তাঁর কানে ইসলামের আওয়াজ পৌছুতেই তিনি রাগে ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। এমন কি তাঁর গোত্রের যারাই ইসলাম কবুল করেছিল তিনি তাদেরই দুশমনে পরিণত হন। লুবায়না ছিলেন তাঁরই গোত্রের একজন ক্রীতদাসী যে ইসলাম কবুল করেছিল। হযরত ওমর তাকে এমন বেদড়ক মারতেন, এমন কি মারতে মারতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন তিনি তাকে বলতেন, 'দাঁড়া, আমি দম নিয়ে নিই, তারপর আবার তোকে মারব।' লুবায়না (রা) ছাড়াও আরও যাদের ওপর তাঁর জোর-জবরদস্তি চলত তাদেরকেও মারধোর করতে ইতস্তত করতেন না। কিন্তু হলে কি হবে? ইসলামের নেশাই ছিল এমন যে, যার ওপর তা একবার চেপে বসত কিছুতেই তা তার ঘাড় থেকে নামত না। এত নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও তিনি একজনকেও ইসলাম পরিত্যাগ করাতে সম্মত করাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন তিনি স্বয়ং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষকেই (না'ঊযুবিল্লাহ) হত্যার সংকল্প করে বসেন। অতঃপর তিনি তলোয়ার কোমরে বেঁধে সোজা আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কেই হত্যার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

---

১. আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, যাহাবীকৃত, পৃ. ১০১; হাকেমকৃত মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২১-৩।

পথিমধ্যে হঠাৎ করেই নু'আয়ম ইব্নে আবদিল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা। ওমরের সংহারক মূর্তি দেখে নু'আয়ম বলেন, কী হে ওমর! সব খবর ভাল তো? কোথায় চলেছ? উত্তরে ওমর বলেন, আর নয়। আজ একটা কিছু হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব। তোমাদের মুহাম্মদকে হত্যা করতে চলেছি আমি। একথা শুনে নু'আয়ম বলে ওঠেন, আরে মুহাম্মদের খবর পরে নিও। নিজের ঘরের খবর রাখ কিছু? তোমার বোনও ভগ্নিপতি যে মুসলমান হয়েছে তা জান? আগে নিজের ঘরের খবর নাও। তারপর পরের খবর নিও। ওমর এ খবর শুনতেই নিজের বাড়ির দিকে ফিরে চললেন এবং সোজা বোন-ভগ্নিপতির ঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হলেন। বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ তখন কুরআন শরীফ পড়ছিলেন। তাঁরা ওমরের পায়ের শব্দ পেতেই চুপ মেরে গেলেন এবং কুরআন পাঠের লিখিত অংশটুকু লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তেলাওয়াতের কিছু অংশ তিনি শুনে ফেলেছিলেন। তিনি রোষভরে জিজ্ঞেস করলেন বোনকে, "আমি পড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। কী পড়ছিলে তোমরা?" বোন বললেন, কৈ কিছু নাতো! কি শুনেছেন আপনি? ওমর বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমরা দু'জনে তোমাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছ। এই বলে তিনি ভগ্নিপতি সাঈদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভীষণভাবে মারতে শুরু করলেন। স্বামীকে বাঁচাতে এসে বোন ফাতিমাও মার খেয়ে আহত হলেন। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হলো। কিন্তু এতে করে ইসলামের প্রতি তাঁর আবেগ আরো বর্ধিত হলো। তিনি বললেন, ওমর! যা করার তুমি করতে পার, কিন্তু ইসলামের যেই সত্যকে গ্রহণ করেছি কোন কিছুর বিনিময়ে তা ত্যাগ করতে পারি না। ওমর থমকে দাঁড়ালেন। বোনের আহত অন্তরের কথাগুলো তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি স্নেহভরে বোন ফাতিমার দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন তাঁর আদরের বোনটি তাঁরই আঘাতে রক্তাক্ত। কিন্তু চেহারায় যেন এক সতেজ বেহেশতী দ্যুতি খেলা করছে। গলে গেল ওমরের মন। বললেন, তোমরা কি পড়ছিলে দেখাও দেখি আমাকে। দেখতে চাই, মুহাম্মদ (সা) কী এনেছেন। বোন বললেন, আমার ভয় হয় আপনি এই কিতাবের সাথে বেআদবী না করে বসেন। তিনি অভয় দিয়ে কসম খেয়ে বললেন, ভয় নেই, আমি পড়ে ফেরত দেব। তাঁর এ কথায় বোনের মনে আশার আলোক রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল, হয়তো ওমরের হেদায়েত নসীব হবে, সময় এসে গেছে। তিনি বললেন, আপনি মুশরিক বিধায় নাপাক। এ কিতাব কেবল পাক-পবিত্র লোকই স্পর্শ করতে পারে। আপনি গোসল করে আসুন। ওমর গোসল করে এলেন এবং কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। কুরআন মজীদের সেই পৃষ্ঠাগুলোতে সূরা তাহা লিখিত ছিল। পড়া শুরু করে কিছু দূর অগ্রসর হতেই তিনি পরম আবেগভরে বলে উঠলেন, কত উত্তম কালাম এ এবং কত মর্যাদামণ্ডিত এ বাণী! ওমরের মুখে এ

কথা শুনতেই পূর্ব থেকেই ঘরের এক কোণে লুকিয়ে থাকা সাহাবী হযরত খাব্বাব (রা) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, ওমর! আমি আশা করছি আল্লাহ পাক তাঁর নবীর দোআ কবুল করেছেন। আমি গতকালই তাঁকে এই দোআ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবূ জেহেল) কিংবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে এই দীনকে তুমি সাহায্য কর।" ওমর! তুমি এই নেআমতের কদর কর। ওমর বললেন, খাব্বাব! আমাকে তুমি বল, মুহাম্মদ (সা) কোথায় আছেন যাতে পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করতে পারি। খাব্বাব ঠিকানা দিলেন। রসূলূল্লাহ (সা) সে সময় সাফা পর্বতের পাদদেশে সাহাবী আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। এ সময় হযরত ওমর (রা)-এর হাতে তলোয়ার ছিল বিধায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছিলেন। এতে হযরত আমীর হামযা (রা) বলে উঠলেন, তাকে আসতে দিন। যদি ভাল নিয়তে এসে থাকে তো ভাল, অন্যথায় তার তলোয়ার দিয়েই তার কম্ম সাবাড় করা হবে। হযরত ওমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করতেই রাসূলূল্লাহ (সা) এগিয়ে আসলেন এবং তাঁর কাপড়ের প্রান্তদেশ টেনে ধরে বললেন, কি খবর ওমর! কী মনে করে এসেছ? নবীর জালালমণ্ডিত কণ্ঠ স্বর তাঁকে কাঁপিয়ে তুলল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জওয়াব দিলেন, "ঈমান আনবার জন্যে, ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশে।" নবী করীম (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন আল্লাহু আকবার! সেই সাথে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও সমস্বরে ধ্বনি দিলেন, আল্লাহু আকবার। আর সকলের সম্মিলিত আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মক্কার তামাম পাহাড়-পর্বত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।[১]

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের নতুন যুগ শুরু হয়। তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ পঞ্চাশের মত। আরবের প্রখ্যাত বীর পুরুষ সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা মাত্র কিছু দিন আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তথাপিও মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারত না। কা'বা প্রাঙ্গণে নামায আদায় ছিল তো আরও অসম্ভব। হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই আকস্মিকভাবেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ ক্ষণে মুসলমানরা প্রকাশ্যেই ইসলামের কথা বলতে লাগল। কাফিররা প্রথম প্রথম তো খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থার মুকাবিলা করতে থাকেন, এমন কি এক পর্যায়ে তারা কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে জামা'আতের নামাযও আদায় করেন।[২]

---

১. আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, যাহাবীকৃত, পৃ,১০২-৩;সহীহ বুখারী, ওমরের ইসলাম গ্রহণ শীর্ষক অধ্যায়।
২. তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০।

আবিসিনিয়ায় কম বেশী ৮৩ জনের মত নারী-পুরুষ হিজরত করে। কিছু দিন আরাম ও পরম নিশ্চিন্তে অতিবাহিত করার পর সর্বত্র এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফিররা ইসলাম কবুল করেছে! এই খবর শুনে অধিকাংশ মক্কা মু'আজ্জমা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু নগরীর কাছাকাছি এসে তাঁরা জানতে পারেন, খবরটি ভুল, আদৌ সত্য নয়। ফলে বেশ কিছু মুসলমান পুনরায় আবিসিনিয়ায় ফিরে যান। আর অধিকাংশই লুকিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে সেখানেই থেকে যান।[১]

আবিসিনিয়া থেকে উছমান ইবন মাজ'ঊন (রা)-এর প্রত্যাবর্তন ও নির্যাতন ভোগ

এই ভুল খবর পেয়ে যাঁরা মক্কায় ফিরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উছমান ইব্ন মাজ'ঊন (রা)ও ছিলেন। তিনি আরবদের প্রথা মাফিক কুরায়শ সর্দার ওলীদ ইব্ন মুগীরার প্রতিবেশ ও আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখতে পেলেন, যে সব মুসলমান কোন কুরায়শ সর্দারের আশ্রয়ে নেই তারা কুরায়শদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার আর তিনি ওলীদের আশ্রয়ে থাকার দরুন পূর্ণ স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চলছেন, ফিরছেন। বিষয়টি তাঁর মর্যাদা বোধে আঘাত করে। তিনি আপন মনেই বললেন, তাঁর সাথীরা ইসলাম কবুলের কারণে কুরায়শ কাফিরদের সর্বপ্রকার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার, আর আমি একজন মুশরিকের আশ্রয়ে থাকার দরুন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছি এবং সাথীদের বিপদে শরীক নই আমি। এটা আমার এক ধরনের ধর্মীয় দুর্বলতা এবং আমার মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। তিনি সোজা ওলীদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন আমি আপনার আশ্রয় ও প্রতিবেশে থাকতে আর ইচ্ছুক নই। এ প্রতিবেশ ও আশ্রয় আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্যাপারে এক্ষণে আপনার আর কোন দায়িত্ব রইল না। ওলীদ বলল, সুধ্রিয়ে! আমার গোত্রের কোন সদস্য কি তোমাকে কোন রকমের কষ্ট দিয়েছে? হযরত উছমান (রা) বললেন, না, কিন্তু এখন একমাত্র আল্লাহর প্রতিবেশ ও আশ্রয় ব্যতিরেকে আর কোন আশ্রয় ও প্রতিবেশ আমার কাম্য নয়। ওলীদ বলল, ঠিক আছে। কথাটা তুমি আল্লাহর ঘরে গিয়ে ঘোষণা দাও, তুমি আর আমার আশ্রয় ও প্রতিবেশে নও। আর আমি তোমার হেফাজতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অনন্তর তারা উভয়ে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে গেলেন। সেখানে ওলীদ উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বলল, লোক সকল! উছমান আমার আশ্রয় আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। উছমান ইব্ন মাজ'ঊন (রা) তা সমর্থন করে বললেন, হ্যাঁ, কথা যথার্থ। আমি ওলীদকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও শরীফ মানুষ হিসাবেই পেয়েছি এবং তার আশ্রয় সর্ম্পকে আমার কোন অভিযোগ নেই।

১. আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, পৃ, ১১৩।

কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কারুর আশ্রয়ে থাকতে আমার মন চায় না। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যাবার সময় কুরায়শদের মজলিস ছিল গরম। আরবের প্রখ্যাত কবি লবীদ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তাঁর স্বরচিত কাসীদা শোনাচ্ছিল। তার কাসীদার একটি লাইন ছিল এ রকম ঃ

الا كل شئ ما خلا الله باطل

"আল্লাহ ভিন্ন আর সব কিছুই বাতিল, মূল্যহীন।" "হযরত উছমান (রা) বললেন, সত্যি কথা। এবার লবীদ-এর দ্বিতীয় লাইন আবৃত্তি করল,

وكل نعيم لا محالة زائل

"আর সর্বপ্রকার নে'মত ও আরাম-আয়েশ নিঃসন্দেহে একদিন ধ্বংস হবে"। হযরত উছমান (রা) এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এটা ভুল কথা। দুনিয়ার নে'মত ও আয়েশ ধ্বংস হলেও জান্নাতের অপরিমেয় নে'মত ও আরাম-আয়েশ অবিনশ্বর, ধ্বংস হবে না তা কোন দিন। আরব ভিন্ন অপর কোন সম্মানিত মেহমান এ ধরনের প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত ছিল না। লবীদ বলল, হে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ! এর আগে তো আর কখনো তোমাদের মজলিসে এ জাতীয় ব্যাপার ঘটে নি। এ ধরনের লোক কবে থেকে জন্ম নিল যারা প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করে? জনৈক ব্যক্তি বলল, কিছু দিন থেকে আমাদের মধ্যে কিছু অবুঝ লোকের একটি দল তৈরী হয়ে গেছে যারা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। হযরত উছমান (রা) আরও কিছু বলাতে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন কি জনৈক লোক তাঁর মুখে ঘুসি মেরে বসে যা চোখে গিয়ে লাগে। এতে তাঁর চোখ নষ্ট হবার উপক্রম হয়। ওলীদ দূরে বসে এ দৃশ্য দেখছিল। সে বলল, সুপ্রিয়! তুমি অনর্থক আজ তোমার চোখ হারাতে বসেছ। যতদিন তুমি আমার আশ্রয়ে ছিলে ততদিন তুমি নিরাপদে ছিলে। আমার আশ্রয় ত্যাগ করাতেই আজ তোমার এই দশা। আমার আশ্রয়ে থাকলে তোমার এ অবস্থা ঘটত না। হযরত উছমান (রা) তার একথা শুনে বলে উঠলেন, আমার সুস্থ চোখটি এই অসুস্থ চোখের সৌভাগ্য দৃষ্টে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে। সে ভাবছে, তারও যদি অনুরূপ দশা ঘটত! ওলীদ বলল, এখনও সময় আছে, চাইলে আমার আশ্রয়ে আসতে পার। তিনি সুস্পষ্টভাবে তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১]

কুরায়শ কর্তৃক বনূ হাশিম অবরুদ্ধ ও বয়কট

কুরায়শ দেখছিল, এত বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের গণ্ডি দিন দিন বেড়েই চলছে। ওমর ও হামযা (রা)-র মত লোকেরা ঈমান এনেছে, মুসলমান

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

হয়েছে। নাজাশী মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন। মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য যে দু'জন কুরায়শ দূত পাঠানো হয়েছিল, আবিসিনিয়া থেকে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। মুসলমানদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য তারা কৌশল করল, মহানবী (সা)-ও তাঁর খান্দানকে সামাজিক ভাবে বয়কট করতে হবে, অবরুদ্ধ করে রাখতে হবে যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর তারা সকল গোত্র মিলিত হয়ে একটি অঙ্গীকারনামা তৈরি করল এবং এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল যে, তাদের কেউ বনী হাশিম খান্দানের সঙ্গে আত্মীয়তা করবে না, তাদের সঙ্গে কেনাবেচা করবে না, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না, এমন কি তাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীও যেতে দেবে না যতদিন না তারা মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দেয়। এর পর অঙ্গীকারনামাটি কা'বা শরীফের দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়।[১]

মহানবী (সা)-র চাচা আবূ তালিব বাধ্য হয়ে বনূ হাশিমের সমস্ত খান্দান নিয়ে আবূ তালিব নামক পাহাড়ী উপত্যকায় আশ্রয় নিলেন। তিন বছর যাবত তাঁরা এখানে অবরুদ্ধ থাকেন। এই গোটা সময়পর্ব এমন দুঃখ-কষ্ট ও অনাহার-অনটনের ভেতর দিয়ে কাটে যে, অনেক সময় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। হাদীছ পাকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, আমরা তাল্হ নামক এক প্রকার বৃক্ষের পাতা খেয়ে থাকতাম। এ সময়ের একটি ঘটনা হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ একদিন আমি একটি শুকনো চামড়া পেলাম। আমি সেটাকে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। এরপর তা আগুনে ভূণা করলাম এবং পানি যোগে সেটাই খেলাম। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, বাচ্চারা যখন খিদেয় হুঙ্কার দিয়ে কাঁদত সেই কান্নার আওয়াজ উপত্যকার বাইরে থেকেও শোনা যেত আর পাষাণ হৃদয় কুরায়শরা সেই কান্না শুনে হাসত এবং খুশী হতো। কিন্তু তাদের ভেতর কিছু রহমদিল মানুষও ছিল যারা বাচ্চাদের কান্নায় ব্যথিত হতো এবং বেদনা বোধ করত।[২]

একদিনের কথা। হযরত খাদীজা (রা)-র ভাতিজা হাকীম ইব্ন হিযাম কিছু গম স্বীয় গোলামের হাত দিয়ে ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-র খেদমতে পাঠান। পথিমধ্যে দুষ্টমতি আবূ জেহেল তা দেখে ফেলে এবং তা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এমন সময় হঠাৎ করেই কোথাও থেকে আবুল বখতারী এসে হাজির হয়। সে তখনও যদিও কাফির ছিল, কিন্তু তার দিলে রহম ছিল। সে বলে উঠল, একজন মানুষ তার ফুফুর জন্য কিছু খাদ্য-খোরাক পাঠাচ্ছে আর তুমি তাতেও বাধ সাধছ? বাধা দিচ্ছ?[৩]

১. যাদুল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২৯ পৃ.
২. আর-রওদুল উনুফ, ১ম খণ্ড, ২২০পৃ.।
৩.সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃ.।

অঙ্গীকারনামা বাতিল ও বয়কটের অবসান

লাগাতার তিন বছর মহানবী (সা) ও বনী হাশিম খান্দান এই অসহনীয় ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। অবশেষে শত্রুদের মধ্যেই কারুর কারুর মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং স্বয়ং তাদের ভেতর থেকেই এই হৃদয়হীন অঙ্গীকারনামার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। হিশাম মাখযূমী ছিল বনী হাশিম খান্দানের নিকট সম্পর্কের আত্মীয় ও গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে মাঝে মাঝে গোপনে বনী হাশিমকে খাদ্যশস্য পাঠাত। একদিন সে যুবায়র-এর কাছে গিয়ে, যে ছিল আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র (নাতি), বলল, কি ব্যাপার যুবায়র? তুমি কি পসন্দ কর যে, তোমরা খাবে, পান করবে, মজা করবে, ফুর্তি করবে আর তোমার নানার বংশের লোকেরা একটা দানাও পাবেনা। তারা না খেয়ে মারা যাবে। যুবায়র বলল, আমি কী করব? আমি তো একা! আমার সাথে যদি একজন লোকও পেতাম তাহলে এই অন্যায় ও জুলুমের দলীল অঙ্গীকারনামাটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দূরে ছুড়ে ফেলতাম। হিশাম বলল, আমি তোমার সাথে আছি। এরপর তারা উভয়ে মুত'ইম ইব্ন আদীর কাছে গেল। মুত'ইমও তাদের সঙ্গে একমত হলো। এভাবে বখতারী ইব্ন হিশাম, যমআ ইবনুল আসওয়াদ তাদের সাথী হলো। পর দিন তারা সকলে মিলে কা'বা প্রাঙ্গণে হাজির হলো। এরপর যুবায়র উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলল, হে মক্কার লোকেরা! এ তোমাদের কেমন বিচার যে, আমরা আরামে খাব-দাব, ঘুমাব, সুখে জীবন যাপন করব। আর আমাদের আত্মীয় আরেক ভাই বনূ হাশিম না খেয়ে মারা যাবে! তাদের ভাগ্যে একটা দানাও জুটবে না। আল্লাহ্‌র কসম! এ হতে পারে না, এটা হতে দেওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জুলুম ও নিপীড়নমূলক অঙ্গীকারপত্রটি ফেড়ে ফেলা না হবে আমি এর থেকে বিরত হব না। আবূ জেহেল বরাবরের মতই প্রতিবাদ করে বলল, কখনো নয়। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে কেউ হাত দিতে পারবে না। তোমরা তো সবাই মিলে এই প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করেছ এবং এতে স্বাক্ষর করেছ। যম'আ অমনি বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। প্রতিজ্ঞাপত্র যখন লেখা হয়েছিল তখন আমরা এতে রাজী ছিলাম না।[১]

এদিকে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে আর ওদিকে নবী করীম (সা) চাচা আবূ তালিবকে ডেকে বলছেন, আপনি কা'বা প্রাঙ্গণে কুরায়শদের সভায় যান এবং সেখানে উপস্থিত কুরায়শ নেতাদের বলুন, তোমাদের অঙ্গীকারপত্র আল্লাহ্‌র মনঃপূত নয়। আর তাই কেবল আল্লাহ্‌র নামটি ছাড়া গোটা পত্রটিই পোকায় খেয়ে ফেলেছে।[২] অতএব, আল্লাহ্‌র মনোনীত নয় এমন একটি অঙ্গীকারপত্রের ওপর ভর করে তোমরা কিভাবে এই অন্যায়-জুলুম চালিয়ে যেতে পার? আবূ তালিব গিয়ে

১.সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৭৪-৭৬।
২. যাদুল মাআদ ও সহীহ বুখারী।

একথা বলতেই যুবায়র, মুত'ইম ও যম'আ এক লাফে উঠে গিয়ে কা'বা গাত্রে লটকানো অঙ্গীকারপত্রটি নিয়ে আসল, দেখা গেল, সত্যই তাই! একমাত্র আল্লাহ্‌র নামটি ছাড়া পত্রের সমস্ত বিষয়বস্তুই পোকায় খাওয়ায় তা পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অতএব, এর পর তারা তিনজনে গিয়ে আবূ তালিব উপত্যকা থেকে বনূ হাশিমকে মুক্ত করে নিয়ে এল। আর এভাবে দীর্ঘ তিন বছরের অবরোধ ও বয়কটের অবসান ঘটে।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে কুরায়শ কাফিরদের নির্মম ব্যবহার

অবশেষে কুরায়শ কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়ন কেবল দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের ওপর সীমিত থাকল না, বরং এর জের ধনী ও অভিজাত মুসলমানগণ পযর্ন্ত গিয়ে পৌছল। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন এক অভিজাত ও শক্তিশালী গোত্রের সন্তান। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। তারপরও কাফিরদের অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত অবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরতের সংকল্প করেন। এই উদ্দেশে তিনি মক্কা মু'আজ্জমা থেকে ইয়ামন অভিমুখে পাঁচ দিনের পথে বারকুল-গিমাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। এখানে ইবনুদ-দাগিনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। ইবনুদ-দাগিনা ছিলেন কারা গোত্রের সর্দার। আবূ বকর (রা)-কে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় চলেছেন? উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) জানালেন, আমার কওম আমাকে দেশে থাকতে দিচ্ছেনা। আমার জীবনকে তারা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই আমি চাচ্ছি এমন কোথাও যেতে যেখানে আমি একান্ত মনে নিরিবিলিতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারব। ইবনুদ-দাগিনা বললেন, এ হতে পারে না যে তোমার মত লোক মক্কা থেকে চলে যাবে। আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি, অভয় দিচ্ছি। এই বলে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাথে করে মক্কায় নিয়ে এলেন এবং কুরায়শ সর্দারদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আচ্ছা, তোমাদের আক্কেল কেমন শুনি? তোমরা এমন একজনকে মক্কা থেকে বের করে দিচ্ছ যিনি মেহমানপ্রিয়, অসহায় গরীবের বন্ধু ও সাহায্যকারী, যিনি আত্মীয়-পরিজনের লালন-পালন করেন, বিপদগ্রস্ত লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ান? আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। এরপর তোমরা কেউ তাঁকে কিছু বলতে পারবে না।

কুরায়শ সর্দারবৃন্দ তার আশ্রয় প্রদান মেনে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমরা তোমরা আশ্রয় প্রদানকে মেনে নিচ্ছি। তবে একটি শর্তে আর শর্তটি হলো- আবূ বকর চুপিসারে যা কিছু নামাযে পড়ার পড়ুক, কিন্ত জোরে যেন না পড়ে। কেননা যখন জোরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে তখন এর আছর ও প্রভাব আমাদের মহিলা ও শিশুদের ওপর গিয়ে পড়ে। আবূ বকর (রা) তাদের শর্ত মেনে কয়েক দিন চললেন। শেষ পযর্ন্ত তিনি ঘরের পাশে একটি মসজিদ বানিয়ে নিলেন।

মসজিদে খুশূ-খুযূর সাথে তিনি সশব্দে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী একজন মানুষ। কুরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি অঝোরে কাঁদতেন। শিশু ও মহিলারা এ দৃশ্য দেখলে অভিভূত হতো, প্রভাবিত হতো। কুরায়শরা ইবনুদ-দাগিনার কাছে অভিযোগ করল। ইবনুদ-দাগিনা আবূ বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, এখন আর আমি তোমার হেফাজতের দায়িত্ব নিতে পারছি না। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহর হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আমিও তোমার আশ্রয় থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।[১]

একদিন নবী করীম (সা) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। সেখানে মুশরিক সর্দার বসে ছিল। আবূ জেহেল নবী করীম (সা)-কে দেখতে পেয়েই বিদ্রূপের ছলে বলে উঠলঃ আবদে মনাফের লোকেরা! দেখ, তোমাদের নবী এসে গেছে।

ওকবা ইবনে রবীআ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল, আমাদের ভেতর যদি কেউ নবী হয়ে বসে কিংবা কেউ নিজেকে ফেরেশতা বলে, তবে আমাদের অস্বীকার করবার কী আছে! নবী করীম (সা) একথা শুনে ফিরে এলেন এবং তাদের কাছে গেলেন। প্রথমে তিনি ওকবাকে লক্ষ করে বললেন ঃ ওকবা! তুই কখনও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সমর্থন করিস নাই। তুই নিজের কথার মধ্যে পড়ে কেবল হাবুডুবু খাস।

এরপর তিনি আবূ জেহেলের দিকে ফিরে বললেনঃ তোমার সেই সময় খুবই কাছাকাছি, বেশী দূরে নয় মোটেই, যখন তুমি হাসবে কমই, কিন্তু কাঁদবে অনেক বেশী।

অতঃপর তিনি কুরায়শদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমাদের সে দিনই খুবই কাছাকাছি এগিয়ে আসছে যেদিন তোমরা আজ যেই ধর্মকে অস্বীকার করছ শেষ পর্যন্ত সেই ধর্মেই প্রবেশ করবে, গ্রহণ করবে।

অবশেষে পাঠক নিজেই দেখতে পাবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে![২]

আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকাল

নবূওতের দশম বছরে নবী করীম (সা)-এর চাচা আবূ তালিব ইনতিকাল করেন।[৩]

আবূ তালিব বাল্যকাল থেকে নবী করীম (সা)-কে প্রতিপালন করেছিলেন এবং যখন থেকে তিনি নবূওতের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন এবং চতুর্দিকে এর ঘোষণা

১. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ৬৫। তাবারী সূত্রে।
২. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ৬৫। তাবারী সূত্রে।
৩. ফতহুল বারী,৭ম খণ্ড, ১৯৪পৃ।

দেওয়া শুরু করেছিলেন আবূ তালিব অব্যাহতভাবে তাঁর সাহায্যকারী ও মদদগার ছিলেন। এজন্যই নবী করীম (সা) তাঁর মৃত্যুতে খুবই আঘাত পান।[১]

আবূ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পরেই তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)ও ইনতিকাল করেন।[২] তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ নবী করীম (সা)-এর সন্তুষ্টির নিমিত্ত কুরবান করে দিয়েছিলেন, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন। জিবরাইল (আ) তাঁকেই আল্লাহ্ পাকের সালাম পৌঁছিয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালে নবী করীম (সা) খুব বেশী কষ্ট পেয়েছিলেন।[৩]

এবার কুরায়শরা নবী করীম (সা)-কে খুব বেশী রকম কষ্ট দিতে শুরু করল। একবার এক দুষ্টমতি কাফির তো তাঁর পবিত্র শরীরের ওপর ময়লা-আবর্জনাই নিক্ষেপ করল। তিনি এ অবস্থায়ই ঘরে ফেরেন। মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর শরীরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছিলেন আর কাঁদছিলেন। তিনি পরম আদরে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, "বেটি! কাঁদছ কেন? তোমার বাপকে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ নিজেই তোমার বাপকে হেফাজত করবেন।"[৪]

তাঁর বড় আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক আবূ তালিব আজ আর নেই। খাদীজাতুল কুবরা (রা)-র মত প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যিনি সুখে-দুঃখে ও বিপদ-মুসীবতে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁর প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন, তাঁকে ছেড়ে চির জনমের মত চলে গেলেন। কিন্তু তাঁকে তো ভেঙে পড়লে চলবে না। তিনি পূর্ণোদ্যমে ও অধিকতর জোরেশোরে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন।

তায়েফ গমন ও কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন

অনন্তর অল্প দিনের মধ্যেই নবী করীম (সা) মক্কা থেকে বের হলেন এবং দাওয়াত ব্যাপদেশে তায়েফ গমন করলেন। সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রা)। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী যতগুলো গোত্র বসবাস করত তাদের সকলকে দাওয়াত দিতে দিতে ও তৌহিদের কথা বলতে বলতে তিনি পায়ে হেঁটে তায়েফে পৌঁছেন। তায়েফে প্রসিদ্ধ ছাকীফ গোত্র বাস করত। শ্যামল সবুজ যমীন ও মনোরম পাহাড়বেষ্টিত ভূখণ্ডের অধিবাসী হওয়ায় তাদের অহংকারের কোন সীমা ছিল না। আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব নামক তিন ভাই ছিল তাদের নেতা ও সর্দার। নবী করীম (সা) তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের

---

১. বুখারী ও মুসলিম।
২. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২২ পৃ.।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার ও মুসনাদ আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৮পৃ.।
৪. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃ.।

দাওয়াত দিলেন। তখন তাদের একজন বিদ্রূপ করে বলল, আমি কা'বার সামনে গিয়ে দাড়ি কেটে ফেলব যদি আল্লাহ তোমাকে রসূল বানিয়ে থাকে। আরেকজন বলল, আল্লাহ বুঝি তোমাকে ছাড়া নবী বানাবার আর কাউকে খুঁজে পেলেন না যার আরোহণ করবার মত একটি সওয়ারী পর্যন্ত নেই। যদি কাউকে তাঁর রসূল বানাতেই হতো তবে তিনি কোন শাসক ও সর্দারকেই বানাতেন। তৃতীয় জন বলল, আমি তোমার সাথে কথাই বলতে চাই না। কেননা যদি সত্যিই আল্লাহর রসূল হয়ে থাক যেমন তুমি বলছ, তাহলে তো খুবই বিপদের কথা হবে যদি আমি তোমার কথা রদ করি। আর তুমি যদি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে থাক তাহলে তোমার সাথে কথা বলা আমার পক্ষে শোভণীয় নয়।

আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাদের বললেন, এখন আমি তোমাদের কাছে কেবল এ টুকু চাই যে, আমি আমার ধ্যান-ধারণা তোমাদের সামনে তুলে ধরি। এমন যেন না হয় যে, আমার এসব ধ্যান-ধারণা অন্য লোকদের হোঁচট খাবার কারণে পরিণত হয়।

আল্লাহর নবী তখন ওয়াজ শুরু করলেন। এ সময় তায়েফের সর্দাররা তাদের গোলাম ও শহরের ছেলে-ছোকরাদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তিনি যখন লোকদের সামনে ইসলাম পেশ করতেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেন, আল্লাহর ওয়াহ্‌দানিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন তখন এসব গোলাম ও ছেলে-ছোকরা তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারত। পাথরের আঘাতে হুযূর আকরাম (সা) রক্তাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁর শরীর দিয়ে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়ত এবং জুতার ভেতর গিয়ে জমে যেত। এরপর ওযূর সময় পা থেকে জুতা খোলা কষ্টকর হয়ে পড়ত।

একবার বদমায়েশরা নবী করীম (সা)-কে এত গালি দেয়, তালি বাজায় ও চীৎকার দিতে থাকে যে, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা বাড়ির আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়। এই জায়গাটা ছিল ওকবা ও শায়বা নামক রবী'আর দুই পুত্রের। তারা দূর থেকে এই অবস্থা দেখতে পেয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের গোলাম আদ্দাসকে বলে, তুমি একটি প্লেটে আঙুর নিয়ে ঐ লোকটিকে দিয়ে এসো। আদ্দাস নির্দেশ মাফিক এক প্লেট আঙুর নিয়ে নবী করীম (সা)-এর সামনে দিয়ে আসে। তিনি আঙুরের দিকে হাত বাড়ান এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে শুরু করেন।

আদ্দাস বিস্ময় ভরা চোখে নবী করীম (সা)-এর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং বলে ঃ আপনি এমন এক কথা বললেন যা এখানকার লোকেরা বলে না।

নবী করীম (সা) বললেনঃ তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার ধর্ম কি?

আদ্দাস জওয়াবে বললেন, সে একজন খ্রিস্টান এবং নিনোভা শহরে তার বাড়ি '

নবী করীম (সা) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহ ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার শহরের অধিবাসী?

একথা শুনতেই আদ্দাস আরও বেশী বিস্মিত হয়। সে বলে, আপনি কিভাবে জানলেন যে, ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা কে ছিলেন এবং কি তাঁর পরিচয়?

নবী করীম (সা) তখন বললেন ঃ বাঃ! আমি ইউনুস ইবন মাত্তাকে জানব না? তাঁকে চিনব না আমি! তিনি যে আমার ভাই হন। তিনি নবী ছিলেন আর আমিও নবী।

আদ্দাস একথা শোনা মাত্রই মাথা নুইয়ে দিল এবং নবী করীম (সা)-এর মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেল। ওকবা ইবন শায়বা দূর থেকে তাদের গোলামকে এসব করতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, নাও, এখন সামলাও। গোলাম তো বুঝি আমাদের হাতছাড়াই হয়ে গেল! এরপর আদ্দাস যখন তার মনিবদ্বয়ের কাছে ফিরে এল তখন তারা রীতিমত রাগত স্বরে বলে উঠল ঃ হতভাগা! তোর কি হয়েছিল যে, ঐ লোকটার হাতে, পায়ে ও মাথায় চুমু খেতে লেগে গেলি?

আদ্দাস বলল ঃ মহাত্মন! আজ সমগ্র পৃথিবীর বুকে ঐ লোকটার চেয়ে ভাল ও উত্তম কোন লোক নেই। তিনি আমাকে এমন কথা বলেছেন যা একমাত্র নবীই বলতে পারেন।

একথা শুনে তারা তাকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করে দিল, খবরদার! ঐ লোকটার কথায় তুই যেন তোর ধর্ম না পরিত্যাগ করে বসিস। তোর ধর্ম ঐ লোকটার ধর্মের চেয়ে অনেক ভাল।

ঐ জায়গায় একবার ওয়াজ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) এত বেশী আঘাত পান যে, তিনি বেহুশ হয়ে যান এবং মাটিতে ঢলে পড়েন। হযরত যায়দ হুযূর আকরাম (সা)-কে নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং বসতির বাইরে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। চোখে মুখে পানির ছিটা দিতেই তিনি হুশ ফিরে পান।

এই সফরে এত কষ্ট ও নির্যাতন সত্ত্বেও এবং একজন মানুষও মুসলমান না হবার কারণে দুঃখ ও আঘাত পেলেও নবী করীম (সা)-এর দিল্ আল্লাহ্‌র আজমত ও মুহব্বত দ্বারা ছিল ভরপুর। এ সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে যেই দোআ করেছিলেন এবং এর মাঝ দিয়ে তিনি তাঁর পরম প্রিয় প্রভুর সামনে নিজেকে যেভাবে পেশ করেছিলেন, দোআ ও মুনাজাতের ইতিহাসে, আত্মনিবেদনের জগতে এর কোন তুলনা নেই। দোআটি এইঃ

اللهم اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا

ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى

الى بعيد يتجهمنى ام الى عدو ملكته امرى ان لم يكن على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمت وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان ينزل بى غضبك او يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك -

"হে আল্লাহ! তোমার কাছেই ফরিয়াদ জানাই আমার দুর্বলতার, আমার সম্বলহীনতার এবং মানুষের কাছে আমার নিকৃষ্টতার। রহমকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বাধিক রহম করনেওয়ালা। অসহায় ও দুর্বলদের প্রভু তো তুমিই! আর আমার প্রতিপালক রবও তুমিই। তুমি কার হাতে তুলে দিচ্ছ আমাকে? অনাত্মীয় রুক্ষ চেহারাওয়ালা লোকগুলোর কাছে অথবা এমন দুশমনদের কাছে ঠেলে দিচ্ছ আমাকে যারা আমার কাজে-কর্মে আমার ওপর কাবু পেয়ে যেতে পারে, তাদের কাছে? তুমি যদি আমার ওপর নারায না হয়ে থাক তবে এরও কোন পরওয়া করি না আমি। তবে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আফিয়াতই আমার জন্য অধিক বিস্তৃত। ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার সত্তার নূর তথা আলোক-রশ্মির আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদ্দারা সমগ্র আঁধার আলোময় হয়ে যায় এবং দীন ও দুনিয়ার সকল কাজ সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যায়। তোমার ক্রোধ আমার ওপর আপতিত হোক অথবা তোমার অসন্তোষই আমার ওপর এসে পড়ুক, সকল অবস্থায় তোমার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টিই আমার কাম্য। নেক কাজ করার কিংবা অন্যায় ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি আমি তোমার কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।"

নবী করীম (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এও বলেছিলেন, আমি সেই সব লোকের ধ্বংসের জন্য বদদোআ করতে পারি না। কেননা তারা যদি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান নাও আনে তাতে কি? আমি আশা করব তাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা একদিন অবশ্যই এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী হবে, ঈমান আনবে।[১]

আরব গোত্রগুলোর প্রতি ইসলামের দাওয়াত

মক্কায় ফিরে এসে নবী করীম (সা) নতুন পথ অবলম্বন করলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের আবাসস্থলে যেতেন কিংবা মক্কার বাইরে চলে যেতেন। কোন মুসাফির পেলে কিংবা কোন নবাগতের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে ঈমানের কথা

১. এই ঘটনা ইমাম বুখারী তদীয় সহীহ গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা নামক গ্রন্থে ১৮৫-৮৮ পৃষ্ঠায় ও ইবনে হিশাম আস- সীরাতুন-নাবাবিয়্যার ১ম খণ্ডে ৪১৯-২১পৃ.বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়ছামী মাজমাউয-যাওয়াইদ গ্রন্থে ৬- ৩৫পৃ.এর আলোচনা করেছেন। ইমাম তাবারানী বিশুদ্ধ সনদে তা বর্ণনা করেছেন।

বলতেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর ওয়াজ শোনাতেন।[১] এ সময় তিনি বনূ কিন্দাহ গোত্রে গমন করেন। গোত্রপ্রধানের নাম ছিল মলীহ। বনূ আবদিল্লাহ গোত্রেও তিনি গিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষের নাম ছিল আবদুল্লাহ। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষের নামের সত্যিকার উত্তরসুরি হিসাবে আবদুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা) হয়ে যাও। নবী করীম (সা) বনূ হানীফা গোত্রেও তশরীফ নেন। তারা সমগ্র আরবে সবচে' নিকৃষ্ট পন্থায় নবী করীম (সা)-কে অস্বীকার করে। তিনি বনূ আমের ইবন সা'সা'আ গোত্রে যান। গোত্রপতির নাম ছিল বুহায়রা ইব্‌ন ফিরাস। সে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করে, ভাল কথা! আমরা যদি তোমার কথা মেনে নিই এবং তুমি যদি বিরোধীদের মুকাবিলায় বিজয়ী হও, জিতে যাও, তাহলে কি তুমি আমাকে এই ওয়াদা দেবে, তোমার পর গোটা ব্যাপারটা আমার হাতে আসবে? নবী করীম (সা) বললেন, এই গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আমার পরে তিনি যাকে চাইবেন তিনি তাকেই নিযুক্ত করবেন। বুহায়রা আবার বলল ঃ বেশ ভাল কথা! এখন তো সারা আরবের মুকাবিলায় তাদের টার্গেট হই। আর তোমার কাজ হাসিল হয়ে গেলে তখন মজা মারবে অন্য কেউ। যাও, তোমার সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

বিভিন্ন গোত্রে অনুষ্ঠিত সফরে হুযূর আকরাম (সা)-এর সাথে সাথী হিসাবে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন।[২]

এ দিনগুলোতেই নবী করীম (সা) সুওয়াইদ ইব্‌ন সামেত -এর সঙ্গে দেখা করেন। তার সম্প্রদায়ে তার উপাধি ছিল 'কামেল'। নবী করীম (সা) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে বলে, সম্ভবত আপনার কাছে সে সব কিছুই আছে যা আমার কাছেও আছে? নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে কি আছে? সে বলল , লুকমানের হিকমত তথা প্রজ্ঞা। নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে, কিছু শোনাও। সে নিজের কিছু উত্তম কবিতা শোনাল। নবী করীম (সা) বললেন, খুবই উত্তম কথা। কিন্তু আমার কাছে কুরআন আছে যা এর চেয়েও উত্তম হেদায়েত ও নূরে পূর্ণ। এরপর নবী করীম (সা) তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। সে বিন্দু মাত্র দেরি না করে ইসলাম কবুল করে। ইয়াছরিবে প্রত্যাবর্তনের পর তার গোত্র খাযরাজের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে ফেলে।[৩]

এ সময়ই আবুল হায়সার আনাস ইব্‌ন রাফে মক্কায় আগমন করে। তার সাথে বনী আবদিল আশহালের কয়েকজন নওজোয়ানও ছিল যাদের একজনের নাম ছিল

১. ইমতাইল-আসমা, মাকরীযিকৃত, ১ম খণ্ড, ৩০।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪২৪-২৫।
৩. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪২৬-২৭।

ইয়াস ইব্ন মু'আয। এরা তাদের গোত্র খাযরাজের পক্ষ থেকে কুরায়শদের সাথে চুক্তি করবার জন্য এসেছিল। নবী করীম (সা) তাদের কাছে যান এবং গিয়ে বলেন, আমার কাছে এমন জিনিস আছে যার মধ্যে তোমাদের কল্যাণ আছে। এর প্রতি তোমাদের কি কোন আগ্রহ আছে? তারা বলল, সেটা কি? বললেন, আমি আল্লাহ্র রসূল। সমগ্র মাখলূকের নিমিত্ত আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে এই দাওয়াতই দিয়ে থাকি তারা যেন আল্লাহ্রই ইবাদত করে এবং শির্ক না করে। আর আমার ওপর আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন। এর পর তিনি তাদের সামনে ইসলামের মূলনীতি পেশ করেন এবং কুরআন মজীদ পাঠ করে শোনান। ইয়াস ইব্ন মু'আয ছিল তখনও যুবক। কুরআন মজীদের পাঠ শুনতেই সে বলে উঠল, হে আমার কওম! আল্লাহ্র কসম, এটা তোমাদের জন্য সেই উদ্দেশ্যের চাইতে উত্তম যেজন্য তোমরা এখানে এসেছ।

আনাস ইব্ন রাফে এক মুঠো নুড়ি পাথর তুলে ইয়াসের মুখের ওপর ছুড়ে মারে এবং বলে, ব্যস! চুপ থাক। আমরা এ কাজের জন্য আসি নি। এরপর রসূলুল্লাহ (সা) সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। এই ঘটনা আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত বু'আছ যুদ্ধের পূর্বের। ইয়াস ফিরে গিয়ে কয়েক দিন পরই মারা যান। মৃত্যুর সময় তার মুখে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর জারি ছিল। মরহুমের অন্তরে নবী করীম (সা)-এর সেই ওয়াজের ফলে ইসলামের বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল যা মৃত্যুকালে ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল।[১]

এ সময় যিমাদ ইয্দী মক্কায় আগমন করে। সে ছিল ইয়ামনের বাসিন্দা ও বিখ্যাত জাদুকর। সে যখন শুনতে পেল, মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর জিনের আছর হয়েছে তখন সে কুরায়শদের বলল, আমি আমার মন্ত্র দিয়ে মুহাম্মদের চিকিৎসা করতে পারি। সে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, মুহাম্মদ! এসো, তোমাকে মন্ত্র শোনাই। নবী করীম (সা) বললেন, আগে আমারটা শুনে নাও। এর পর তিনি পাঠ করতে শুরু করলেনঃ

الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ـ امابعد !

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র নিমিত্ত। আমি তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিরেকে ইবাদত পাবার যোগ্য কেউ নেই। তিনি

১. ইবনে হিশাম. ১ম খণ্ড, ৪২৭-২৮; মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৪২৭; আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, ১৪৬।

একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আম্মাবাদ ঃ

এতদূর শুনতেই যিমাদ বলে ওঠে, এই কথাগুলো আমাকে আবার শোনান। এভাবে দু'তিন দফা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাগুলো শোনার পর সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমি বহু গণক দেখেছি, জাদুকর দেখেছি, কবির কবিতাও শুনেছি। কিন্তু এ ধরনের কথা তো আর কারুর থেকে আমি শুনি নি। এই কথাগুলো তো এক অথৈ সমুদ্রের মতো। মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, হাত বাড়িয়ে দিন। আমি ইসলামের বায়আত গ্রহণ করি।

এ সময় তোফায়েল ইব্ন আমর মক্কায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন দওস গোত্রের সর্দার। ইয়ামনের আশেপাশে তাঁর গোত্রের শাসন কর্তৃত্ব ছিল। তোফায়েল স্বয়ং একজন কবি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আগমনের কথা শুনে মক্কার লোকেরা শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং সর্বোত্তম মানের সেবা ও বিনয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এ সম্পর্কে স্বয়ং তোফায়েল বলেন ঃ

"মক্কার লোকেরা আমাকে এও বলেছিল, এই যে লোকটি যার কথা তোমাকে বললাম, সে আমাদের কবিলায় আবির্ভূত হয়েছে, তাঁর থেকে সাবধানে থাকবে। সে কিন্তু জাদু জানে। তার জাদু যেন তোমাকে কাবু না করে ফেলে। সে তাঁর জাদু দিয়ে পিতা থেকে পুত্রকে, স্বামী থেকে স্ত্রীকে, ভাই থেকে ভাইকে আলাদা ও পৃথক করে ফেলে। আমাদের সমাজকে সে এভাবে পেরেশান করে তুলেছে এবং আমাদের কাজে কর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমরা চাই না তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ ধরনের কোন মুসীবত এসে দেখা দিক। অতএব, আমাদের প্রবল উপদেশ হলো, তুমি তার কাছে যাবে না, তার কথা শুনবে না এবং তার সাথে কথাও বলবে না।

"কথাগুলো তারা এত সুন্দরভাবে তারা আমার মগজে ঢুকিয়ে দিল যে, যখনই আমি কা'বায় যেতে চাইতাম অমনি তুলো দিয়ে কান বন্ধ করে নিতাম যাতে করে মুহাম্মদ (সা)-এর আওয়াজের গুণগুনানিও আমার কানে না ঢোকে। একদিন আমি সকালবেলা কা'বা ঘরে গেলাম। নবী করীম (সা) তখন সেখানে নামায পড়ছিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই ছিল এই যে, তাঁর আওয়াজ আমার কানের ভিতরেই পৌঁছুবে, সেজন্য আমি শুনেই ফেললাম। শুনতে পেলাম এক অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য কালাম তিনি পাঠ করছেন। এ সময় আমি আমাকে খুব ভর্ৎসনা করতে লাগলাম, আমি যখন নিজেই একজন কবি, জ্ঞান-বুদ্ধিও আছে, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি, তখন তাঁর কথা শুনব না কেন? কিসের বাধা আমার তাঁর কথা শুনতে? যদি ভাল কথা হয় মেনে নেব, আর তা না হলে মানব না। ব্যস! এই কথা মনে করে আমি থেমে গেলাম। এর পর যখন নবী করীম (সা) ঘরে ফেরার

উদ্যোগ নিলেন তখন আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। তিনি ঘরে পৌছলে আমি তাঁকে আমার মক্কায় আগমনের পর লোকে আমাকে যেভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তাদের কথায় যেভাবে আমি কানে তুলো দিয়েছি এবং আজ যেভাবে হুযূর আকরাম (সা)-এর পবিত্র যবান মুবারক থেকে এক অত্যাশ্চর্য কালাম শুনেছি তা বিবৃত করলাম এবং আরয করলাম তাঁর কথা শোনাবার জন্য। নবী করীম (সা) কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে আমাকে শোনালেন। আল্লাহ্‌র কসম! এমন পাক-পবিত্র কালাম আমি আর কখনো শুনিনি যা এতটা নেকী ও ইনসাফের দিক-নির্দেশনা দেয়।"[১]

মোটের ওপর তোফায়েল সেই মুহূর্তেই মুসলমান হয়ে যান কুরায়শরা যাকে কথায় কথায় মখদূম ও মুতা' (মান্যবর) বলত। তিনি কথায়-কাজে ও মনে-প্রাণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগত ও খাদেমে পরিণত হন। এ ধরনের একজন লোকের মুসলমান হয়ে যাওয়া কুরায়শদের নিকট খুবই কষ্টকর ও তিক্ত লাগে।

আবূ যর (রা) তাঁর শহর ইয়াছরিবেই বসবাস করতেন। উড়ো খবর হিসাবে তিনি নবী করীম (সা) সম্পর্কে শুনতে পান। তিনি তাঁর ভাইকে বলেন, তুমি যাও, মক্কায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসো যিনি নিজেকে নবী হিসাবে প্রচার করছেন।

আবূ যর (রা)-এর এই ভাইয়ের নাম ছিল উনায়স। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত বাকপটু কবি ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। মক্কায় এসে তিনি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে দেখা করেন। এরপর ফিরে গিয়ে ভ্রাতা আবূ যর (রা)-কে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে এমন একজন মানুষ পেয়েছি যিনি সৎ কাজ করতে ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে বলে থাকেন।

আবূ যর (রা) বলেন, এতটুকু কথায় আমি সান্ত্বনা না পেয়ে নিজেই গিয়ে হেঁটে মক্কায় আসি। তিনি নবী করীম (সা)-কে চিনতেন না, আবার কাকে জিজ্ঞেস করবেন এমন ভরসাও পাচ্ছিলেন না, পসন্দও করছিলেন না। যমযমের পানি পান করে কা'বা প্রাঙ্গণে শুয়ে বসেই কয়েক দিন কাটিয়ে দেন। একদিন হযরত আলী মুর্তাযা (রা) তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে নবাগত কোন মুসাফির মনে হচ্ছে? তিনি জওয়াবে বললেন, হ্যাঁ! আমি এক মুসাফিরই বটে। আলী মুর্তাযা (রা) বলেন, আমার সাথে চলুন। রাতে সেখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু কোন কথাবার্তা হয় নি। হযরত আলী (রা)-ও জিজ্ঞেস করেন নি তিনি কেন মক্কায় এসেছেন, আর আবূ যর (রা)-ও নিজে

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, দওস ও তোফায়েল ইবন আমর সম্পর্কিত অধ্যায়, বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩৫৩এবং শরহুল মাওয়াহিব, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭পৃ.।

থেকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নি। সকালে তিনি পুনরায় কা'বা প্রাঙ্গণে ফিরে গেলেন। তিনি মনে মনে নবী করীম (সা)-কে তালাশ করতেন বটে কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করতেন না। আলী মুর্তাযা (রা) এরপর পুনরায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবত আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা খুঁজে পান নি। আবূ যর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাই। আলী মুর্তাযা (রা) আজ আবার তাঁকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং এবার তাঁকে জিজ্ঞেসও করলেন, তিনি কে, কি তাঁর পরিচয় এবং কেন ও কোন্ উদ্দেশে এখানে তিনি এসেছেন? আবূ যর (রা) বললেন, যদি গোপন রাখেন তাহলে আমি বলতে পারি। আলী (রা) প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি বললেন, আমি শুনেছি, এই শহরে একজন লোক আছেন যিনি নিজেকে আল্লাহ্র নবী বলে থাকেন। আমি তাঁর কাছে প্রথমে আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে এখান থেকে আমার জন্য সান্ত্বনাদায়ক কোন খবর নিয়ে যেতে পারেনি। সেজন্য এবার আমি নিজেই এসেছি।

হযরত আলী মুর্তাযা (রা) বললেন, আপনি খুব ভাল জায়গায় এসেছেন এবং আরও ভাল হয়েছে, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হলো। দেখুন, আমি তাঁরই খেদমতে যাচ্ছি। আপনি আমার সাথে চলুন। আমি ভেতরে গিয়ে দেখব, যদি দেখি এ সময় সাক্ষাৎ করা মুনাসিব নয়, তাহলে আমি দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যাব যেন আমি জুতা ঠিক করছি।

মোটকথা আবূ যর আলী মুর্তাযা (রা)-এর সাথে নবী করীম (সা)-এর খেদমত মুবারকে হাজির হন এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ পেশ করেন। নবী করীম (সা) তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করেন। আবূ যর (রা) তক্ষুণি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যান।

নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, আবূ যর! তুমি এখন একে গোপন রাখ এবং নিজের ঘরে ফিরে যাও। যখন আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ী করবেন তখন তুমি চলে এসো। আবূ যর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো এসব আল্লাহ্র দুশমনদের মধ্যে এর ঘোষণা দিয়েই যাব। এই বলে তিনি কা'বার দিকে চললেন। কা'বা প্রাঙ্গণে তখন কুরায়শ সর্দাররা উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের সকলকে শুনিয়ে সজোরে কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন। আর যায় কোথায়! কলেমা শাহাদাত পাঠ শুনতেই কুরায়শরা 'মার এই বেদীনকে' বলে তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে ভূতলশায়ী করে ফেলল। এমন সময় কোথা থেকে হযরত আব্বাস (রা) এসে সেখানে উপস্থিত হন এবং আবূ যর (রা)-কে দেখা মাত্রই বলে ওঠেন, আরে হতভাগারা! তোরা করছিস কি! এ লোক তো গিফার গোত্রের লোক যেখানে তোরা ব্যবসা উপলক্ষে যেয়ে থাকিস এবং সেখান থেকে খেজুর এনে থাকিস। একথা শুনে সকল তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিল। পরদিন আবূ যর (রা)

আগের দিনের মতই সজোরে কলেমা পাঠ করলেন। লোকে পুনরায় তাঁকে প্রহার করে। এ দিনও হযরত আব্বাস (রা)-ই তাঁকে রক্ষা করেন। এর পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

বায়'আতে আকাবা ও মদীনায় ইসলামের প্রচার

নবুওতের ১১তম বছরের হজ্জ মৌসুম। নবী করীম (সা) রাতের অন্ধকারে মক্কায় হজ্জ উপলক্ষে আগত বিদেশী কাফেলার সন্ধানে ইতস্তত ঘুরছিলেন এবং এভাবে ঘুরতে ঘুরতে মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত আকাবা নামক উপত্যকায় গিয়ে হাজির হন। সেখানে এক স্থানে কয়েকজন লোককে একান্ত আলাপচারিতায় মশগুল দেখতে পান। তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। এরা সংখ্যায় ছিল ছ'জন। তারা ইয়াছরিব থেকে এসেছিল হজ্জ উপলক্ষে। নবী করীম (সা) তাদের সামনে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরলেন, তাঁর আজমত ও জালাল বয়ান করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ইশ্‌ক ও মুহব্বতের আগুনে তাদের দিল উত্তপ্ত করে তুললেন। মূর্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করলেন এবং পাক-পবিত্রতার তা'লীম দিয়ে যাবতীয় মন্দ ও গোনাহ্‌র কাজ করতে নিষেধ করলেন। এরপর তিনি কুরআন পাক তেলাওয়াত করে তাদের দিল আলোকিত করলেন। লোকগুলো যদিও মূর্তিপূজারী ছিল, কিন্তু তারা তাদের শহরে বসবাসরত প্রতিবেশী ইয়াহূদীদের একাধিকবার বলতে শুনেছিল, সত্বর একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। অতএব তারা কাল বিলম্ব না করে সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করে এবং দেশে ফিরে ইসলামের সত্যিকার দাঈ ও মুবাল্লিগে পরিণত হয়।[২]

তাঁরা যাকে দেখত, যার সাথেই সাক্ষাত হতো অমনি তাকে সুসংবাদ জানিয়ে বলত, এতদিন তোমরা যে নবীর কথা শুনতে এবং তামাম বিশ্ব যাঁর আগমন প্রত্যাশায় অধীরভাবে আগ্রহী, তিনি এসে গেছেন। আমরা নিজ কানে তাঁর কথা শুনেছি, শুনেছি তিনি যা বলেন তাও। আমাদের চোখ তাঁকে দেখেছে। তিনি আমাদের সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন যাঁর সামনে দুনিয়ার জীবন ও মৃত্যু অতি তুচ্ছ।[৩]

এ সব লোকের রসূল আকরাম (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বহন করে নেবার ফল হলো, ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে নবী করীম (সা)-এর আলোচনা হতে লাগল এবং পরবর্তী বছরে অর্থাৎ নবুওতের দ্বাদশ বর্ষে ইয়াছরিবের লোকেরা অধিক

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাব মানাকিবিল-আনসার, আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ শীর্ষক অধ্যায়ঃ সহীহ মুসলিম, ফাযাইলিস-সাহাবা,শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪২৮-২৯।
৩. সীরাত-ই-ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪২৮-২৯পৃ.।

সংখ্যায় মক্কায় আগমন করল এবং নবী করীম (সা)-এর হাতে ঈমানরূপ সম্পদ লাভ করল।

এ সব লোক যে সব কথার ওপর নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিল সেগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করব এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করব না।

(২) আমরা চুরি ও ব্যভিচার করব না।

(৩) আমরা আমাদের (কন্যা) সন্তানদের হত্যা করব না।

(৪) আমরা কারো ওপর অপবাদ আরোপ করব না এবং কারো বিরুদ্ধে চোগলখুরী করব না।

(৫) নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য করব প্রতিটি ভাল কথায় ও কাজে।[১]

এ সমস্ত লোক যখন দেশে ফিরতে উদ্যত তখন নবী করীম (সা) তাদের তা'লীম প্রদানের জন্য হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-কে তাদের সাথে দিয়ে দিলেন। হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা) ছিলেন ধনীর ঘরের আদরের দুলাল। যখন তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাস্তায় বের হতেন তখন তার আগে পিছে গোলাম থাকত। যে কাপড় তিনি পরিধান করতেন তার মূল্য দু'শো দিরহামের কম হতো না। এর পর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি ঘটলে তিনি দৈহিক ও শারীরিক আরাম-আয়েশ একবারে ত্যাগ করেন। যে সময় তিনি মদীনায় ইসলাম প্রচার করতেন সে সময় তাঁর কাঁধে কম্বলের একটি টুকরো থাকত যা সামনের দিক থেকে কাঁটা দিয়ে আটকিয়ে নিতেন।[২]

মুস'আব ইবনে উমায়র (রা) মদীনায় আস'আদ ইবনে যুরারার ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন এবং মদীনার লোকেরা তাঁকে "আল-মুকরী" (কুরআন পড়ানেওয়ালা উস্তাদ) বলত। একদিন হযরত মুস'আব ও আস'আদ ইবনে যুরারাহ (রা) কয়েকজন মুসলমানসহ একত্র হন কিভাবে বনী আবদুল আশহাল ও বনী জাফরে ইসলাম প্রচার করা যায় তার উপায় ও রাস্তা খুঁজে বের করার জন্য।

সা'দ ইবনে মুআয ও উসায়দ ইবনে হুদায়র ছিলেন এই দুই গোত্রের সর্দার। এঁরা তখনও মুসলমান হন নি। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে দেখে তাঁরা বেশ উদ্বিগ্ন। একদিন সা'দ ইব্নে মু'আয উসায়দ ইবনে হুদায়রকে ডেকে বললেন,

---

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ইবনে হিশাম তদীয় সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ১খ. ৪২১-২৪।

২. উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৪০৬ পৃ.।

"তুমি তো দেখছি বেশ ঘুমিয়ে আছ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না এরা দু'জন কিভাবে আমাদেরই বাড়ি-ঘরে বসে আমাদেরকে বেওকুফ বানাচ্ছে? তুমি যাও এবং গিয়ে তাদের শাসিয়ে এসো, তারা যেন এরপর আর কখনো আমাদের মহল্লায় না আসে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু কি করব হতভাগা আস'আদটি কিনা আমারই খালাতো ভাই।"

উসায়দ ইবনে হুদায়র একথা শুনেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং সোজা আস'আদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। উসায়দকে এভাবে আসতে দেখে আস'আদ (রা) হযরত মুস'আবকে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন, গোত্রপ্রধান উসায়দ এদিকে আসছেন। আল্লাহ করুন, যদি তিনি আপনার কথা শোনেন এবং মেনে নেন তবে কতই না ভাল হয়। মুস'আব (রা) বললেন, তিনি যদি একবার এখানে এসে বসেন তাহলে আমি অবশ্যই তার সাথে কথা বলব।

ইতোমধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গালাগালি শুরু করলেন। তিনি এও বললেন, তুমি আমাদের নাদান ও বোকা-পাঁঠা লোকগুলোকে ফুসলিয়ে পথভ্রষ্ট করতে এসেছ? তুমি আজই মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এরপর যদি তোমাকে এখানে দেখি তাহলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

মুস'আব (রা) বললেন, আপনি যদি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে না কতই ভাল হতো। যদি আমাদের কথা পসন্দ হয় কবুল করতেন। আর পসন্দ না হলে ছেড়ে চলে যাবেন। উসায়দ বললেন, বেশ ভাল কথা। বলুন, কী বলতে চান। এরপর মুস'আব (রা) তাঁকে বোঝাতে লাগলেন ইসলাম কী। অতঃপর তিনি কুরআন মজীদের কিছু আয়াত তাঁকে তেলাওয়াত করে শোনালেন। উসায়দ সব কিছু চুপচাপ শুনলেন। শেষে বললেন, হ্যাঁ এখন বলুন, কেউ যদি তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তোমরা কি কর? তিনি বললেন, আমরা তাকে প্রথমে গোসল করাই। এরপর পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে তাকে কলেমা শাহাদত পড়িয়ে দেই। সেই সাথে তাকে দু' রাক'আত নফল নামাযও পড়িয়ে দেওয়া হয়। উসায়দ উঠলেন, গোসল করে কাপড় পরে এলেন, কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন এবং দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, আমার পেছনে আরেক জন আছেন। তিনি যদি তোমাদের অনুসারী হয়ে যান তাহলে কেউ আর তোমাদের বিরোধী থাকবে না। আমি এখনই গিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলে উসায়দ চলে গেলেন।

ওদিকে সর্দার সা'দ ইব্নে মু'আয তার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলেন। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই এবং তাঁর চেহারার প্রতি নজর পড়তেই বুঝতে পারলেন ইতোমধ্যে তাঁর মাঝে এক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনি তার সঙ্গীদের দিকে লক্ষ করে বললেন, দেখ, যাবার সময় উসায়দের যেই চেহারা

ছিল এখন কিন্তু আর তাঁর সেই চেহারা নেই। এরপর উসায়দ এসে বসতেই সা'দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! কী করে এলে? উসায়দ বললেন, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি এবং সেও কথা দিয়েছে, আমাদের মর্জির বিরুদ্ধে কিছু করবে না। কিন্তু ইতোমধ্যে সেখানে আরেক ব্যাপার ঘটে গেছে। বনূ হারিছা সেখানে হাজির। তারা আস'আদ ইবন যুরারাকে হত্যা করতে চায়। তাঁর অপরাধ সে তোমার ভাই। একথা শোনা মাত্রই সা'দ ইবনে মু'আয ক্রোধান্বিত হন এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। তার ভয় হচ্ছিল না জানি বনূ হারিছা ইতোমধ্যেই তার ভাই আস'আদকে হত্যা করে ফেলল কি না! যাবার সময় উসায়দকে লক্ষ করে কেবল এতটুকু বললেন, তুমি কোন কাজের নও। এই সামান্য কাজটুকুও তোমার দিয়ে হলো না।

এরপর সেখানে পৌছে দেখতে পেলেন, মুস'আব ও আস'আদ উভয়েই নিশ্চিন্তে বসে আছেন। এক্ষণ তিনি বুঝতে পারলেন আসলে উসায়দ কৌশলে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছে যেন আমিও তাদের কথা শুনি। একথা ভাবতেই তিনি উভয়কে লক্ষ করে বকাবকি শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি আস'আদকে লক্ষ করে এও বললেন, যদি তোমার ও আমার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত এবং মেহমান যদি তোমার আশ্রয় ও প্রশ্রয় না পেত তবে তাঁর কী সাধ্য ও আমাদের মহল্লায় আসে!

আস'আদ (রা) কিন্তু সা'দ ইব্নে মু'আযকে দূর থেকে এদিকে আসতে দেখেই মুস'আব (রা)-কে বলে দিয়েছিলেন, দেখুন, আমাদের বড় সর্দার এ দিকেই আসছেন দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনি তাকে বোঝাতে পারেন তাহলে আমাদের বিরোধিতা করবার মত আর কেউ থাকবে না। মুস'আব (রা) অতঃপর সা'দকে শান্ত হয়ে বসার এবং দু'টো কথা শোনার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, আপনি মেহেরবানী করে একটু বসুন, আমাদের দু'টো কথা শুনুন। তার পর যদি ভাল লাগে গ্রহণ করবেন আর নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সা'দ হযরত মুস'আবের এরূপ বিনয় নম্র ব্যবহারে ও মিষ্ট কথায় বেশ প্রভাবিত হলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র পাশে রেখে বসে পড়লেন। মুস'আব (রা) তাঁর সামনে ইসলামের স্বরূপ ও তার হাকীকত তুলে ধরলেন। সেই সঙ্গে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে শোনালেন। অবশেষে সা'দও সে কথাই বললেন যা উ সায়দ বলেছিলেন। মোটের ওপর তিনিও উঠলেন, গোসল করলেন, পাক-সাফ কাপড় পরলেন ও কলেমা শাহাদত পাঠ করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আপন মজলিসে ফিরে এলেন এবং এসেই গোত্রের লোকদের ডেকে বললেন ঃ

"হে বনী আবদুল আশহালের লোকেরা! আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?" সকলেই সমস্বরে ও এক বাক্যে বলে উঠল, আপনি আমাদের সর্দার।

আপনার অভিমত, আপনার অনুসন্ধান- অন্বেষণ উন্নত ও উত্তম হয়ে থাকে। সা'দ বললেন, "তোমাদের পুরুষ অথবা নারী যেই হোক, আমি ততক্ষণ তার সাথে কথা বলা হারাম মনে করি যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা) -এর ওপর ঈমান আনছে।"

এ কথা বলতেই সকলেই ইসলাম গ্রহণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কার আগে কে ইসলাম গ্রহণ করবে এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে সন্ধ্যা অবধি বনী আবদুল আশহালের এমন কোন পুরুষ ছিল না যে ইসলাম কবুল না করেছে। সমস্ত গোত্র একদিনে মুসলমান হয়ে যায়।[১]

আকাবার দ্বিতীয় রায়'আত

মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর তা'লীম ও তাবলীগ দ্বারা ইসলামের আলোচনা ও চর্চা এমনিভাবে আনসারদের সকল গোত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ নবুওতের ত্রয়োদশ বছরে ইয়াছরিব থেকে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি কাফেলা মক্কায় আগমন করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কে তাদের শহরে আসার দাওয়াত দেবে এবং এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন পেতে চেষ্টা করবে, এজন্য ইয়াছরিবের নবদীক্ষিত মুসলমানরা তাদেরকে পাঠিয়েছিল।

সত্য পিয়াসী এই দলটি রাতের অন্ধকারে সেই বরকতময় স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয় যেখানে বিগত দু'বছর যাবত তারা হাজিরা দিয়ে আসছে। ওদিকে আল্লাহর রসূল (সা)ও যথাসময়ে আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা)-কে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন।

হযরত আব্বাস (তিনি তখনও মুসলমান হননি) কাফেলার লোকদের লক্ষ করে বলেন, দেখুন! আপনারা বেশ ভালভাবেই ওয়াকিফহাল আছেন, মুহাম্মদ (সা) মক্কার কুরায়শদের জানী দুশমন। আপনারা যদি তাঁর সাথে কোনরূপ অঙ্গীকারে আসতে চান তাহলে আগে খুব ভালভাবে বুঝে নিন যে, এটা খুবই কঠিন ও নাযুক কাজ। মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে কোনরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার অর্থ ছোট-বড় সাদা-কালো এক-কথায় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। যা করবেন বুঝে শুনে করুন, খুব ভেবে-চিন্তে করুন। অন্যথায় কিছু না করাই ভাল।

সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তৈরী, ইসলামের জন্য যে কোন রকমের ত্যাগ স্বীকারে রাজী, এমন কি জান কুরবান করতেও প্রস্তুত কাফেলার সাথীরা হযরত আব্বাসের কথার কোন জওয়াব দিল না। তাঁরা বরং রসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে ফিরে আরয করল, হুযূর! আপনি আমাদেরকে কিছু বলুন।

১. সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম,খণ্ড. ৪৩৫-৩৭ পৃ.।

রসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম কালামুল্লাহ শরীফ থেকে কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আয়াতে কারীমার তেলাওয়াত শুনতেই ঈমান ও এয়াকীনের নূরে তাঁদের হৃদয়-মন আপ্লুত হয়ে গেল। এরপর তাঁরা নবী করীম (সা)-কে তাঁদের শহরে ইয়াছরিব গমনের দাওয়াত দিল যাতে তারা সকলে হুযূর (সা)-এর পবিত্র ফয়েয লাভে ধন্য হতে পারে।

অতঃপর নবী করীম (সা) তাঁদেরকে বললেন :

(১) তোমরা কি আমাকে দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে?

(২) আমি যখন তোমাদের শহরে গিয়ে আবাস গ্রহণ করব তখন কি তোমরা আমার ও আমার সাথীদের তেমনি সাহায্য-সমর্থন করবে যেমনভাবে করে থাক আপন পরিবার-পরিজনকে ?

কাফেলার লোকেরা সব শর্ত মেনে নিয়ে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ হুযূর! এর বিনিময়ে আমরা কি পাব?

নবী করীম (সা) উত্তর দিলেন, জান্নাত। জান্নাত পাবে তোমরা। এরপর ইয়াছরিববাসীরা কেবল এতটুকু আরয করলঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কেবল এতটুকু সান্ত্বনা পেতে চাই যে, আপনি সেখানে গিয়ে আর কখনো আমাদের ছেড়ে আসবেন না?

নবী করীম (সা) তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন, আশ্বস্ত করলেন। বললেন ঃ না, আমার জীবন-মরণ এখন তোমাদের সাথে। বাঁচব তো তোমাদের সাথে বাঁচব আর মরলে তোমাদের সাথেই মরব। কোন অবস্থাতেই আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না।

নবী করীম (সা)-এর মুখে একথা শুনতেই ভক্তবৃন্দ আনন্দে ও খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এবং ইসলামের জন্য জান-মালসহ সর্বস্ব কুরবানী দেবার বায়আত গ্রহণের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। বরা ইব্নে মা'রূর (রা) ছিলেন প্রথম মুসলমান যিনি ঐ রাত্রে সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

এক শয়তান পাহাড়ের ওপর থেকে এই দৃশ্য দেখতে পায় এবং সে চিৎকার করে মক্কার লোকদের ডেকে বলে, হে লোকসকল! এসে দেখে যাও, মুহাম্মদ ও তাঁর দলের লোকেরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের পরামর্শ করছে।

রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে এই আওয়াজের প্রতি কর্ণপাত না করার জন্য বলেন। আব্বাস ইব্নে উবাদা(রা) বললেন, যদি হুযূর আকরাম (সা) আমাদেরকে অনুমতি দেন তাহলে আমরা আগামী কালই মক্কার লোকদেরকে আমাদের তলোয়ার বাজি দেখাতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না না, আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর পর নবী করীম (সা) তাঁদের মধ্য থেকে বারো জন

লোক বাছাই করলেন এবং তাঁদের নাম দিলেন নকীব। তিনি এও বললেন, ঈসা (আ) যেভাবে তাঁর নিজের জন্য বারো জনকে বাছাই করেছিলেন তদ্রূপ আমিও তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করছি যাতে তোমরা ইয়াছরিববাসীদের মধ্যে ফিরে গিয়ে দীনের তাবলীগ করতে পার। আর মক্কার লোকদের মধ্যে আমি নিজেই এ কাজ করব। বারো জন নকীবের নাম নিচে দেওয়া হলো ঃ

(ক) খাযরাজ গোত্রের নয়জনঃ (১) আস'আদ ইব্ন যুরারাহ, (২) রাফে' ইব্ন মালিক, (৩) উবাদা ইব্ন সামিত, এই তিনজন আকাবার ১ম বায়'আতেও শরীক ছিলেন। (৪) সা'দ ইব্ন রবী, (৫) মুনযির ইব্ন আমর, (৬) আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা, (৭) বরা' ইব্ন মা'রূর, (৮) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম ও (৯) সা'দ ইব্ন উবাদা।

(খ) আওস গোত্রের তিনজন ঃ(১) উসায়দ ইব্ন হুদায়র, (২) সা'দ ইব্ন খায়ছামা ও (৩) আবুল-হায়ছাম ইব্ন তায়্যিহান।[১]

সকালে বেলা উঠতেই কুরায়শরা ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পারে। তারা ইয়াছরিববাসীদের সন্ধানে বের হয়। কিন্তু তাদের কাফেলা খুব ভোরেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। কুরায়শরা সেখানে সা'দ ইব্ন উবাদা ও মুনযির উব্ন আমরকে পায়। মুনযির পালিয়ে যান। ফলে কুরায়শরা তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সা'দ ইব্ন উবাদাকে তারা পাকড়াও করতে সমর্থ হয়। অতঃপর তাঁর সওয়ারীর উটের ক্ষুদ্র মুখওয়ালা পাত্র খুলে তাঁর মশ্‌ক বেঁধে দেয়। এরপর মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কায় তারা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে মারত এবং তাঁর লম্বা লম্বা চুল ধরে টানা-হেঁচড়া করত। এই সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তো ছিলেন তিনি যাঁকে নবী করীম (সা) ১২ জন নকীবের অন্যতম নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বর্ণনা ছিল নিম্নরূপঃ

"কুরায়শরা যখন আমাকে প্রহার করছিল তখন দুধে আলতা রঙের মিষ্টি চেহারার একজন লোককে আমার দিকে আসতে দেখতে পেলাম। আমি নিজের মনেই বললাম, যদি এই কওমের কোন লোকের কাছে ভাল ও ভদ্র ব্যবহারের আশা করা যায় তো এই লোকের কাছ থেকেই আশা করা যেতে পারে। এরপর সে আমার কাছে এসেই আমার মুখের ওপর খুব জোরে এক চড় মারল। এ সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার থেকে ভাল কিছু আশা করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে একজন লোক এল। সে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল এবং বললঃ কুরায়শদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যার কাছে তুমি

১. মুসনাদ আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩২২-৩৯; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ৬২৪-২৫; ইমাম যাহাবী হাকেম-এর বর্ণনা সহীহ বলেছেন। বিস্তারিত দ্র. সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড।

প্রতিবেশীর হক আশা করতে পার কিংবা যার সঙ্গে তোমার কোন অঙ্গীকারনামা রয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, জুবায়র ইবন মুতইম ও হারিছ ইব্ন হরব নামক আব্দ মনাফের দুই পৌত্র আছেন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আমাদের ওখানে আসা-যাওয়া করেন এবং আমি বহুবার তাদেরকে হেফাজত করেছি। সে বলল, তাহলে তো তুমি ওদের নামে দোহাই দিতে পারতে, ওদের কাছে সাহায্য চাইতে এবং ওদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা ঘোষণা করতে পারতে। পরামর্শ মুতাবিক আমি তাই করলাম। অতঃপর উল্লিখিত লোকটিই ঐ দু'জনের কাছে গেল এবং তাদেরকে বলল, খাযরাজের একজন লোককে প্রহার করা হচ্ছে এবং লোকটি তোমাদের নাম ধরে ডাকছে । তারা লোকটি কে জানতে চাইলে সে আমার নাম বলে। তখন তারা বলে, হ্যাঁ, সে আমাদের অনেক উপকার করেছে, বিপদে-আপদে সাহায্য করেছে। এরপর তারা এসে আমাকে মুক্ত করে এবং আমি ইয়াছরিবে ফিরে আসি" ।[১]

হিজরতের অনুমতি

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবশেষে সেই সব মুসলমানকে যারা তখন পর্যন্ত মক্কার বাইরে যাননি, যাদের ওপর জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় নেমে এসেছিল এবং স্বদেশ ও স্বভূমি যাদের জন্য অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল, ইয়াছরিব গমনের অনুমতি দান করলেন। এই ঈমানদার মুসলমানরা নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, ভাইবোন ও স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগে এতটুকু দুঃখিত হয় নি, বরং তাঁরা আনন্দিত ছিল এজন্য যে, তারা ইয়াছরিবে গিয়ে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ ওয়াহদাহূ লা-শরীকা লাহূর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে, পরিপূর্ণ আযাদীর সঙ্গে আল্লাহকে ডাকতে পারবে।[২]

কিন্তু কুরায়শরা এতদ্সত্ত্বেও খুব সহজভাবে মুসলমানদের হিজরত করতে দেয় নি, বরং তারা তাঁদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগে বাধা দিয়েছে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর এসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা মুকাবিলা করেই মুসলমানদেরকে হিজরত করতে হয়েছে, ইয়াছরিবে পাড়ি দিতে হয়েছে।

সুহায়ব রূমী (রা) যখন হিজরত করতে উদ্যত হলেন তখন কাফিররা তাঁকে ঘিরে ধরল। বলল, সুহায়ব! তুমি যখন মক্কায় এসেছিলে, দরিদ্র ছিলে, রিক্ত ছিলে, কপর্দকহীন ছিলে। এখানে এসেই তুমি এসব করেছ,হাজার হাজার টাকা কামিয়েছ। আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছ আর সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ এত দিনের সঞ্চিত ও অর্জিত মালমাত্তা। কিন্তু তা হয় না। এসব তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।

১. সীরাতে ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৪৯-৫০; রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ১ম খণ্ড, ৮১।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৪৯; রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ৮২।

একা যেতে চাও যাও, আপত্তি নেই। কিন্তু এখানকার উপার্জিত টাকা-পয়সা সাথে নেবে? উহু, ওটা হবার নয়। সুহায়ব (রা) বললেন, ও এই কথা! আচ্ছা আমি যদি আমার সব মালমাত্তা ও টাকা-পয়সা তোমাদের দিয়ে দিই তাহলে তো আমাকে যেতে দেবে? কুরায়শরা বলল, হ্যাঁ। একথা শুনতেই হযরত সুহায়ব (রা) তাদের হাতে সব তুলে দিয়ে শূন্য হাতে ইয়াছরিবের পথে রওয়ানা হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই কাহিনী শুনে বললেন, সুহায়ব এই ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা কামিয়েছে।[১]

হযরত উম্ম সালামা (রা) বলেনঃ আমার স্বামী আবূ সালামা (রা) হিজরতের এরাদা করলেন। এরপর তিনি আমাকে উটের ওপর বসালেন। আমার বাচ্চা সালামা তখন আমার কোলে। আমরা যখন রওয়ানা হলাম তখন বনূ মুগীরার লোকেরা এসে আবূ সালামা (রা)-কে ঘিরে ফেলল। তারা বললঃ তুমি যেতে চাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাদের মেয়েকে আমরা যেতে দেব না। ওদিকে বনূ আবদিল-আসাদও এসে হাজির হলো। তারাও আবূ সালামা (রা) কে বলল, তুমি যেতে পার, কিন্তু বাচ্চা তো আমাদের কবীলার। ওকে তুমি নিতে পারবে না। মোটের ওপর তারা আবূ সালামা (রা)-র হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিয়ে উট বসিয়ে দিল। এর পর বনূ আবদিল আসাদ আমার কোল থেকে বাচ্চাটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওদিকে বনূ মুগীরা নিয়ে চলল আমাকে। আর এদিকে আবূ সালামা (রা) যিনি দীনের জন্য, ইসলামের জন্য হিজরত করা ফরয মনে করতেন, স্ত্রী-পুত্র রেখেই ইয়াছরিবের উদ্দেশ রওয়ানা হয়ে পড়লেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা) স্বামী-সন্তান হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে যান। তিনি প্রতিদিন সেখানে এসে যেখানে থেকে তাঁকে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, বসতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অঝোরে কাঁদতেন। এর পর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতেন। এভাবে কান্না-কাটির ভেতর দিয়ে কেটে গেল গোটা বছর। শেষ পর্যন্ত তাঁর চাচাতো ভাইয়ের দিলে দয়ামায়ার সঞ্চার হয়। সে দুই কবীলার কাছে দৌড়ঝাঁপ করে ও অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের মন ভেজাতে সক্ষম হয়। তারা উম্মু সালামা (রা)-কে স্বামীর কাছে যাবার অনুমতি প্রদান করে এবং বাচ্চাও ফেরত দেয়। অতঃপর হযরত উম্মু সালামা (রা) একটি উটের পিঠে উঠে একাকীই ইয়াছরিবের উদ্দেশে রওয়ানা হন। প্রায় সকল সাহাবীকেই এ ধরনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[২]

হযরত ওমর ফারূক (রা) বলেন, তিনি যখন মদীনায় হিজরত করেন সে সময় আয়্যাশ ও হিশাম নামক দু'জন সাহাবীও তাঁর সঙ্গে মদীনা গমনের প্রস্তুতি

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৭৭; বায়হাকীর দালাইলন-নবূওত, ২য় খণ্ড. ৫২২।
২. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৬৭-৬৮-পৃ.।

নিয়েছিলেন। আয়্যাশ ইব্ন রবীআ (রা) রওয়ানা হবার সময় কথা মাফিক নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু হিশাম ইবনে আসী (সা) সম্পর্কে কাফিররা যে কোনভাবে জেনে ফেলে। ফলে কুরায়শরা তাঁকে বন্দী করে। আয়্যাশ (রা) মদীনায় গিয়ে পৌঁছুতেই আবূ জেহেল তার ভাই হারিছসহ মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো। আয়্যাশ (রা) ছিলেন তার চাচাতো ভাই এবং তিনজনই ছিলেন সহোদর। অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভজাত। আবূ জেহেল ও হারিছ আয়্যাশ (রা)-কে বলল, তোমার অবর্তমানে ও অদর্শনে মার অবস্থা খুবই খারাপ। মা কসম খেয়েছেন আয়্যাশের মুখ না দেখা পযন্ত তিনি মাথায় চিরুনী দেবেন না, ছায়ায় বসবেন না। অতএব, ভাই তুমি চল। মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসবে ।

হযরত ওমর ফারূক (রা) আয়্যাশ (রা)-কে লক্ষ করে বলেন, আয়্যাশ! ব্যাপারটা আমার কাছে প্রতারণা মনে হচ্ছে। তোমার মাকে নিয়ে ভাবার কারণ নেই। দেখবে তোমার মা দু'দিন পরে ঠিকই চুল আঁচড়াবে যদি চুলে জটা ধরে। আর মক্কার রৌদ্র তাপ সম্পর্কেও আমার জানা আছে। রৌদ্রের তাপ প্রচণ্ড হয়ে উঠলে তিনি ঠিকই ছায়ায় গিয়ে বসবেন। আমার মতে তোমার সেখানে না যাওয়াই ভাল। প্রত্যুত্তরে হযরত আয়্যাশ (রা) জানালেন, না, আমি বরং গিয়ে মায়ের কসম ভেঙে দিয়ে চলে আসব।

ওমর ফারূক (রা) একথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। যদি এটাই তোমার মত হয় তাহলে পথ চলবার জন্য আমার উটনীটা বরং নিয়ে যাও। কেননা আমার উটনীটা খুবই দ্রুতগামী। যদি পথে ওদের গতিবিধি ও চালচলনে এতটুকু সন্দেহ হয় তাহলে তুমি এতে চড়ে খুব সহজেই ওদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

আয়্যাশ (রা) উপদেশ মত উটনীটা নিলেন। এরপর তিনজন একত্রে রওয়ানা হলেন। মক্কার কাছাকাছি হতেই একদিন পথিমধ্যে আবূ জেহেল বলল, ভাই! তোমার উটনীর সাথে চলতে গিয়ে আমার উটটা হাঁপিয়ে উঠেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে। খুব ভাল হয় যদি আমাকে তোমার সাথে বসিয়ে নাও। আয়্যাশ (রা) সরল বিশ্বাসেই বললেন, ঠিক আছে। এই বলে তিনি নিজের উটনীটাকে বসাতেই দু'জন তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলল এবং এভাবেই তারা মক্কায় প্রবেশ করল। আবূ জেহেল ও হারিছ অতঃপর খুবই গর্বের সাথে বলত, আহম্মক ও বেওকুফদের এভাবেই বোকা বানাতে হয়, শাস্তি দিতে হয়। এই বলে হযরত আয়্যাশ (রা)-কে পূর্ব থেকেই বন্দী হিশাম ইব্ন আসীর সঙ্গে একত্রে কয়েদ করা হয়। নবী করীম (সা) মদীনায় পৌঁছেই এ দু'জনের উদ্ধারের ব্যাপারে আগ্রহী হন। হুযূর আকরাম (সা)-এর আগ্রহের কথা জানতে পেরে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মক্কায় আগমন করেন

এবং একদিন রাত্রে কয়েদখানা থেকে উভয়কে মুক্ত করে রাতারাতি মক্কা থেকে বেরিয়ে যান।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে ব্যর্থ হত্যা চক্রান্ত ও মদীনায় হিজরত

অবশেষে কুরায়শরা দেখতে পেল, মুসলমানরা মদীনায় গিয়ে ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সেখানে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এ ব্যাপারে কি করা যায়, তা নিয়ে পরামর্শের জন্য কুরায়শ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়ায় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করল। সকল গোত্রের প্রধানরাই এতে শরীক ছিল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রদান করে। একজন বলল, মুহাম্মদের হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে কোন ঘরে ফেলে রাখা হোক। আরেকজন বলল, তাঁকে দেশান্তরে পাঠানো হোক, নির্বাসন দেওয়া হোক। তাই হবে যথেষ্ট। আবূ জেহেল বলল, সকল গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করা হোক, অতঃপর বাছাইকৃত লোকেরা সবাই এক যোগে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করবে। এতে করে তাঁর হত্যার দায়-দায়িত্ব কোন ব্যক্তি কিংবা গোত্র বিশেষের ঘাড়ে বর্তাবে না, বরং তা সকল আরব গোত্রের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। ফলে হাশিম পরিবার এককভাবে সকল আরব গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে না।

আবূ জেহেলের মতকেই সবাই পসন্দ করল এবং তার মতের ওপরই সকলে একমত হলো। এরপর আর কাল বিলম্ব না করে তক্ষুণি তলোয়ার হাতে রাতের অন্ধকারে রসূলুল্লাহ (সা)-এর বাসগৃহের দিকে ছুটল এবং তাঁর পবিত্র আবাসগৃহ অবরোধ করে বসে রইল। তাদের ইচ্ছা, আল্লাহর রসূল (সা) যখন সকালে ঘরের বাইরে আসবেন তখন তাঁকে একযোগে হত্যা করা হবে।[২]

রসূলুল্লাহ (সা)-র সঙ্গে কুরায়শদের প্রবল শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির ব্যাপারে তারা পূর্ণ আস্থাবান ছিল। তাই তারা তাদের মাল-সামান ও মূল্যবান দ্রব্যাদি হেফাজতের নিমিত্ত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট গচ্ছিত রাখাকেই নিরাপদ ভাবত। এ সময়ও এ ধরনের প্রচুর গচ্ছিত সম্পদ নবী করীম (সা)-এর নিকট ছিল। ওহী মারফত কুরায়শদের অভিসন্ধি সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত ছিলেন বিধায় তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে আনেন এবং বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার ওপর হিজরতের হুকুম হয়েছে। অতএব, আজ রাত্রেই আমি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ব।[৩] তুমি রাত্রে আমার বিছানায় আমার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে। কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। সকালে উঠে যার

---

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ৪৩৫ পৃ. ইমাম যাহবী একে শুদ্ধ বলেছেন।
২. সীরাত ইব্ন হিশাম. ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃ.।
৩. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হিজরত অধ্যায়।

যার গচ্ছিত দ্রব্য তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে মদীনায় আমার সাথে এসে মিলিত হবে। নির্দেশ মুতাবিক হযরত আলী (রা) তলোয়ারের মুখে নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। আর ওদিকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) নিশ্চিত মনে অবরোধরত এ সব অন্ধদের সামনে দিয়ে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘর থেকে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি।[১]

এই ঘটনা নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষের ২৭ শে সফর মুতাবিক ৬২১ খ্রি.-এর ১২ই ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবারের।[২]

হিজরতের দু'তিন দিন আগেই রাসূলুল্লাহ (সা) দুপুরের সময় হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাসগৃহে গমন করেন। নিয়ম মাফিক তিনি দরজায় করাঘাত করেন। অনুমতি মিলতেই তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলেন, আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। অন্য সবাইকে সরিয়ে দিন। আবূ বকর (রা) বলেন, এখানে আপন জন ছাড়া আর কেউ নেই। এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। আল্লাহ্‌র রসূল (সা) বললেন, আমাকে হিজরত করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একথা শোনা মাত্রই হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোন! আমি কি আপনার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য পাব? উত্তর মিলল, হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) চার মাস আগে থেকেই দু'টো উটনী বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে খাইয়ে তৈরি করছিলেন। তিনি বল লেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এর একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি নিজেই তামাম বিশ্বের জন্য ছিলেন অনুগ্রহকারী বিধায় কারুর অনুগ্রহ গ্রহণ তিনি পসন্দ করতেন না। বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে এজন্য মূল্য গ্রহণ করতে হবে। হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত বাধ্য হয়ে তা মেনে নিলেন। হযরত আয়েশা (রা) এ সময় নিতান্তই অল্প বয়স্কা ছিলেন। আয়েশা (রা)-র বড় বোন হযরত আসমা (রা) তাই এ সফরের প্রয়োজনীয় সামান তৈরি করেন। দু' তিন-দিনের খাবার সাথে দিলেন। কোমরের ফিতা দিয়ে খাবারের থলির মুখ বেঁধে দেন। কোমরের এই ফিতাকে আরবীতে 'নাতাক' বলা হয় আর আসমা (রা)-কে ঐ দিন থেকে "যাতুন-নাতাকায়ন" বলা হয়ে থাকে।[৩]

তিনি কা'বাগৃহের দিকে শেষবারের মত তাকালেন। বিদায়ী নজর বুলিয়ে নিলেন। এরপর বললেন, মক্কা! তামাম দুনিয়ার চেয়ে তুমি আমার কাছে বেশী

১.মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, ৩৪৮ ; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক , ৫ম খণ্ড, ৩৮৯।
২. সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃ. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ৮৫।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব।

প্রিয়। কিন্তু তোমার সন্তানেরা আমাকে তোমার বুকে থাকতে দিল না।[১] রাতের অন্ধকারে উভয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কা থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্তী ছূর পর্বত। এরই শীর্ষদেশে একটি গুহা ছিল। রাস্তা ছিল কংকরময়। ফলে পথ চলতে পাথরের আঘাতে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং আহত হচ্ছিলেন। আবূ বকর (রা) হুযূর আকরাম (সা)-কে কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকেন। অবশেষে তাঁরা ছূর গুহা মুখে পৌঁছেন। আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-কে বাইরে রেখে নিজে গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং ভেতরকার আবর্জনা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করেন। কাপড় ছিঁড়ে ছিড়ে ভেতরকার ছোট-খাটো গর্তগুলো বন্ধ করেন। এরপর তিনি নবী করীম (সা)-ভেতরে যাবার আমন্ত্রণ জানান।[২]

ভোর হলো। সকালের আলো ফুটতেই অভ্যাস মাফিক হযরত আলী (রা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কুরায়শরা দেখতে পেল তাদের শিকার মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবর্তে আলীকে। জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ কোথায়? হযরত আলী (রা) জওয়াব দিলেন, আমি কি জানি! তোমরা কি আমাকে তাঁর পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলে? তোমরাই তো তাঁকে বেরিয়ে যেতে দিলে এবং তিনি তোমাদের চোখের ওপর দিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় কুরায়শদের লজ্জা ও ক্রোধের আর সীমা রইল না। তাদের সব রাগ গিয়ে পড়ল হযরত আলী (রা)-র ওপর। তারা তাঁকে টেনে হেঁচড়ে কা'বা ঘর পর্যন্ত নিয়ে যায়। অবশেষে কিছুক্ষণ আটকে রেখে ছেড়ে দেয়।[৩]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মেয়ে হযরত আসমা বলেন, আমার আব্বা যাবার সময় ঘরে নগদ টাকা-পয়সা যা ছিল তা সব নিয়ে গিয়েছিলেন। টাকার পরিমাণ পাঁচ-ছয় হাজারের মত হবে। আব্বা চলে যাবার পর আমার দাদা আবূ কুহাফা বললেন, পুতি! আমার মনে হয় আবূ বকর তোমাদেরকে ডবল মুসীবতে ফেলে গেছে। সে নিজেও গিয়েছে আর নগদ টাকা -পয়সা যা কিছু ছিল তাও সাথে নিয়েছে। আসমা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম,, দাদাজান! তিনি আমাদের জন্যও অনেক টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছেন। এই বলে আমি একটি নুড়ি পাথরভর্তি থলের কাছে নিয়ে গেলাম এবং অন্ধ দাদার হাতে ধরিয়ে বললাম, এই দেখুন। তিনি আমার কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং বললেন, যাক! তোমাদের তাহলে একেবারে খালি রেখে যায়নি। তোমাদের জন্য বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে গেছে। হযরত আসমা বলেন, আমি আমার দাদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এই কৌশল

১. ইমাম তিরমিযী, ইমাম দারিমী ও ইব্নে মাজা বর্ণিত।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড; দালাইলুন -নুবূওয়াত, ২য় খণ্ড, ৪৭৭; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২২১ পৃ।
৩. তারীখে তাবারী, ১ম খণ্ড, ৫৬৮।

করেছিলাম সেদিন। নইলে আব্বা আসলে সব কিছুই সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন(নবী করীমের খেদমতের জন্য)।[১]

নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তিন দিন যাবত সেই গুহায় অতিবাহিত করেন। আবূ বকর তনয় তরুণ যুবক আবদুল্লাহ রাত্রে গুহায় এসে থাকতেন এবং ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই শহরে ফিরে যেতেন এবং সারা দিন কুরায়শরা কোথায় চক্রান্ত আঁটছে, পরামর্শ করছে, তার খোঁজ নিতে চেষ্টা করতেন। অতঃপর সন্ধ্যায় গুহায় এসে মহানবী (সা)-কে সে সব অবহিত করতেন। কিছু রাত হলে হযরত আবূ বকর (রা)-এর গোলাম এসে বিচরণরত বকরীর দুধ দোহন করে দিয়ে যেত। আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-কে নিয়ে সেই দুধ পান করতেন। তিন দিন যাবত এই দুধই ছিল তাঁদের একমাত্র খাদ্য।[২]

কুরায়শরা মহানবী (সা)-এর খোঁজে অনুসন্ধান করতে করতে এক সময় গুহা মুখে এসে হাজির হয়। তাদের পায়ের শব্দ পেতেই হযরত আবূ বকর (রা) কিছুটা ঘাবড়ে যান এবং মহানবী (সা)-এর খেদমতে আরয করেন, এখন দুশমন এতটা কাছাকাছি এসে গেছে যে, তারা ভেতরে উঁকি মারলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এখন কি হবে? নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন ঃ لاتحزن ان الله معنا

"আবূ বকর! ঘাবড়াবার কিছু নেই। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[৩]

চতুর্থ দিন তিনি সূচনা থেকেই বের হন। আবদুল্লাহ ইব্ন উরায়কিত নামক একজন বিশ্বাসভাজন কাফিরকে পথ প্রদর্শক হিসাবে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলছিল। রাত-দিন অব্যাহতভাবে পথ চলেন। দ্বিতীয় দিন দুপুর বেলা রৌদ্রের তেজ বৃদ্ধি পেলে হযরত আবূ বকর (রা) চাইলেন রসূল (সা) ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিন। চতুর্দিকেই তিনি চাইলেন। একটি পাথরের পাদদেশে একটুখানি ছায়া তাঁর চোখে পড়ল। সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে মাটির ওপর ঝাড়ু বুলিয়ে নিলেন। এরপর তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে রসূলুল্লাহ (সা) তার ওপর গিয়ে বসলেন। এর পর হযরত আবূ বকর (রা) কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে বের হলেন। পাশেই এক রাখাল তার ছাগল চরাচ্ছিল। তিনি তাকে গিয়ে বললেন, তুমি একটি ছাগীর পালানের ধুলাবালি ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। এর পর তিনি তাঁর হাত পরিষ্কার করালেন এবং তাকে দিয়ে দুধ দোহালেন। পাত্রের মুখ একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন যাতে বাইরের ধুলোবালি ভেতর গিয়ে না পড়তে পারে। অতঃপর

১. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৮৮পৃ.।
২. সহীহ বুখারী, কিতাব মানাকিবিল আনসার।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাব ফাদাইল্ আসহাবুন-নবী (সা); সহীহ মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা।

তিনি দুধ নিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে ফিরে এলেন এবং কিছুটা পানি মিশিয়ে পবিত্র খেদমতে পেশ করলেন। তিনি পান করে বললেন, এখনও কি রওয়ানা হবার সময় হয় নি? বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। এজন্য তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হলেন।[১]

সুরাকার পশ্চাদ্ধাবন

কুরায়শরা ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ কিংবা আবূ বকরকে ধরে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার হিসেবে এক শত উট দেওয়া হবে। সুরাকা নামক জনেক বেদুঈন এই ঘোষণা শুনতে পেয়ে পুরস্কারের লোভে অশ্বপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময় মহানবী (সা) রওয়ানা হচ্ছিলেন। সে মহানবী (সা)-কে দেখে ফেলে এবং অশ্ব হাঁকিয়ে কাছাকাছি এসে হাজির হয়। কিন্তু কিছুদূর থাকতেই তার অশ্ব হোঁচট খায় এবং সে ঘোড়ার পিঠ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। সে এটাকে অলুক্ষণে মনে করে ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত পৃষ্ঠদেশে রক্ষিত তূনীর থেকে তীর বের করে হামলা করব কি করব না তা নির্ধারণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে। জওয়াব না'সূচক হওয়ায় সে কিছুটা দমে যায়। কিন্তু একশত উটের লোভে সে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফলে সে তীরের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে মহানবী (সা)-কে পাকড়াও করবার উদ্দেশে পুনরায় অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হয়। নবী করীম (সা) এ সময় উদ্বেগমুক্ত চিত্তে এক মনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে চলেছিলেন। একমাত্র মহাপ্রভু ব্যতিরেকে আর কোনদিকেই তাঁর খেয়াল ছিল না। ঠিক এমনি মুহূর্তে সুরাকার ধাবিত অশ্বের সামনের দু'পা মাটিতে হাঁটু অবধি গেড়ে যায় এবং সুরাকা টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে গিয়ে পড়ে। সে কি করবে না করবে তা স্থির করবার নিমিত্ত পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষায় উদ্যত হয়। কিন্তু এবারকার উত্তরও ছিল তার জন্য হতাশাব্যঞ্জক। একবার নয় দু'বারই ভাগ্যের রায় একই হওয়ায় সে মনে বল হারিয়ে ফেলে এবং তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে, ইনি কোন সাধারণ ব্যক্তি ন। অদৃশ্য থেকে কোন মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছে, সাহায্য করছে। এর প:. সে এক পা দু'পা করে মহানবী (সা)-এর খেদমতে এগিয়ে এল এবং কুরায়শদের ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত করল। সেই সাথে তার নিজের সামানও পবিত্র খেদমতে পেশ করল। মহানবী (সা) তা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন এবং তাকে কেবল এতটুকু বললেন, পশ্চাদ্ধাবনকারীদেরকে তাঁদের সংবাদ না দিলেই তিনি খুশী হবেন। এর পর সুরাকা তাকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দাস আমের ইবন ফুহায়রা চামড়ার একটি পাতায় তাকে নিরাপত্তানামা লিখে দেন।[২]

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হিজরত অধ্যায়; সহীহ মুসলিম, কিতাবু'য-যুহদ ওয়ার রাকাইক, হিজরত অধ্যায়।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, নবী করীম (সা) -এর হিজরত অধ্যায়; সীরাত ইব্ন হিশাম।

বরকতময় ব্যক্তি

গুহা থেকে বেরিয়ে এই মুবারক কাফেলাকে পয়লা দিনই উম্মু মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে হয়। এই মহিলা ছিলেন খুযা'আ গোত্রের। পথিক-মুসাফিরের দেখাশোনা ও তাদের মেহমানদারির জন্য তিনি ছিলেন মশহূর। মহিলা তাদের পানি পান করাতেন। মুসাফিররা তার তাবুর ছায়ায় অবতরণ করত এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যেত। তাঁবুর ধারে এসে নবী করীম (সা) মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কিনা। মহিলা বললেন, নেই। যদি থাকত তাহলে জিজ্ঞেস করার আগেই আমি নিজেই আপনাদের সামনে এনে তা হাজির করতাম। অতঃপর নবী করীম (সা) তাঁবুর এক কোণে একটা ছাগী বাঁধা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই বকরীটা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? উম্মু মা'বাদ বললেন, বকরীটা খুবই দুর্বল বিধায় পালের সাথে চলতে পারে না। নবী করীম (সা) বললেন, অনুমতি পেলে আমরা তার দুধ দুইতে পারি। উম্মু মা'বাদ বললেন, তার পালানে দুধ আছে মনে করলে আপনি স্বচ্ছন্দে দুইতে পারেন। অনুমতি মিলতেই তিনি বিসমিল্লাহ বলে পালানে হাত দিলেন। এরপর তিনি একটি পাত্র চাইলেন। অতঃপর দুধ দুইতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রের কানায় কানায় দুধে ভর্তি হয়ে গেল। এমন কি কিছু দুধ ছিল্‌কে বাইরেও গিয়ে পড়ল। এই দুধ মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীবর্গ পান করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার দুইলেন। এবারও পাত্র ভর্তি হয়ে গেল। এবার তাঁর সাথীরা পান করলেন। এরপর তৃতীয়বারের মত দুধ দুইলে এবারও পাত্র ভর্তি হল। তিনি এই দুধ উম্মু মা'বাদ ও তার পরিবারের জন্য রেখে দিলেন এবং নিজে কাফেলাসহ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছুক্ষণ পর উম্মু মা'বাদের স্বামী বাইরে থেকে এসে তাঁবুতে প্রবেশ করতেই পাত্র ভর্তি দুধ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন, এখানে দুধ এল কোত্থেকে? উম্মু মা'বাদ বললেন, একজন বরকতময় লোক এসেছিলেন, আর এই দুধ তাঁরই আগমনের বরকত। উম্মু মা'বাদের স্বামী বললেন, এ লোক তো কুরায়শ গোত্রের সেই লোক যাকে আমি খুঁজছিলাম। আচ্ছা, তুমি বলতো লোকটি দেখতে কেমন? উম্মু মা'বাদ বললেন,

"আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি যাঁর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা উল্লেখ করার মত। দর্শনীয় চেহারা, উজ্জ্বল অবয়ব ভারসাম্যপূর্ণ, পবিত্রতার সাক্ষাত প্রতিমূর্তি, পসন্দনীয় প্রকৃতির। না মেদ বাহুল্যের দোষে দুষ্ট আর না দৃষ্টিকটু রকমের লকলকিে ও ছিপছিপে। ভুড়িবিশিষ্ট পেট নয়, মাথার চুল পতনোন্মুখ নয়, চেহারা র্যাদামণ্ডিত ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, শরীর সুঠাম ও বলিষ্ঠ, উচ্চতা মাঝামাঝি রকমের,

সুর্মামণ্ডিত চোখ প্রশস্ত ও কালো, চোখের মণিও কালো, চার পাশ খুবই সাদা, ভ্রূগুলো কালো ও লম্বা, গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতা কিন্তু আকর্ষণীয়, কথাগুলো মিষ্টি ও সুস্পষ্ট। বেশী কথা যেমন বলেন না, তেমনি একেবারে চুপচাপও নন। যখন কথা বলেন তখন মনে হয় তাঁর মুখ দিয়ে মুক্তা ঝরছে। দু'টো নরম ও নাযুক শাখার মাঝে একটি শাখা, জীবন্ত তরু-তাজা, দেখতে সুদৃশ্য। সাথীবৃন্দ আশেপাশেই অবস্থান করেন। তিনি যা কিছু বলেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন। হুকুম করলে তা পালনের জন্য ঝাপিয়ে পড়েন। অনুগত সেবক, কথা বলেন না এমনও নয়, আবার বাহুল্য কথাও বলেন না।"

এ সব গুণের কথা শুনে তিনি (উম্মু মা'বাদের স্বামী) বলে ওঠেন, এ লোক অবশ্যই সেই কুরায়শ হবেন যাঁকে খোঁজা হচ্ছে। আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।[১]

নবী করীম (সা) ইয়াছরিবে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বুরায়দা আসলামীর সঙ্গে পথিমধ্যে দেখা। সে ছিল তার গোত্রের প্রধান। কুরায়শ নবী করীম (সা)-কে গ্রেফতার করতে পারলে এক শত উট পুরস্কার দেবার ঘোষণা দিয়েছিল। বুরায়দা একশত উটের লোভে নবী করীম (সা)-কে অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর সামনাসামনি হতেই ও কথা বলতেই কেবল সেই নয়, বরং তার সত্তরজন সাথীসহ সবাই মুসলমান হয়ে যায়। বুরায়দা তাঁর মাথার পাগড়ী নামিয়ে বর্শার মাথায় বেঁধে নেন যার সাদা অগ্রভাগ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল এবং এই সুসংবাদ শোনাচ্ছিল যে, শান্তির বাদশাহ, সমঝোতার অগ্রদূত এবং দুনিয়াকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে ভরপুর করনেওয়ালা আসছেন।[২] পথিমধ্যে যুবায়র ইবনু'ল-আওয়াম (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। সিরিয়া থেকে তিনি ফিরছিলেন। একদল মুসলিম ব্যবসায়ী-বণিকও সে সময় তাঁর সাথে ছিল। তাঁরা নবী করীম (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর জন্য এক টুকরা সাদা কাপড় হাদিয়া পেশ করেন।[৩]

মদীনায় নবী করীম (সা)-এর সাদর অভ্যর্থনা

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন এবং তিনি সত্বর মদীনায় এসে পৌঁছবেন, এ খবর পূর্বেই মদীনার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। মদীনার অধিবাসীরা অধীর আগ্রহে দিন গুণছিল এবং প্রতীক্ষা করছিল। মাসুম বাচ্চা ও শিশু-কিশোররা জোশের সাথে ও গর্বভরে বলে বেড়াচ্ছিল, আল্লাহ্‌র রসূল আসছেন। মদীনার লোকেরা প্রতিদিন তাদের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসত

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৯-১০;তাবাকাত ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, ১৩০; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৫৬ পৃ.।
২. আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, যাহাবীকৃত, ২২৮ পৃ.।
৩. সহীহ বুখারী, হিজরত অধ্যায়।

এবং শহরের বাইরে গিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। অবশেষে না পেয়ে নিতান্তই আফসোসের সাথে ঘরে ফিরে যেত। অন্য দিনকার মত সেদিনও তারা অপেক্ষার পর ঘরে ফিরে গেছেন। এমন সময় এক ইয়াহূদী কেল্লার ওপর থেকে রসূলুল্লাহ (সা) কে উটের পিঠে চড়ে আসতে দেখে এই অনুমানে যে, নিশ্চয় এরা সেই প্রতীক্ষিত মেহমান হবেন, চীৎকার করে বলে ওঠে, যাঁর ইনতিজারে অপেক্ষা করছিলে সেই বহু প্রতীক্ষিত মেহমান এসে গেছেন। তার এই ঘোষণা শুনতেই মদীনাবাসীদের তকবীর ধ্বনিতে মদীনার অলি-গলি মুখরিত হয়ে উঠল। আনসাররা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে পাগলের মত বেরিয়ে এল। অধিকাংশ মুসলমানই এর আগে কখনো নবী করীম (সা)-কে দেখেনি। তাঁরা আল্লাহ্‌র নবী ও আবূ বকরকে দেখে বুঝে উঠতে পারছিল না, এঁদের মধ্যে কে তাদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। হযরত আবূ বকর (রা) বিষয়টি আঁচ করতে পেরে একটি রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রোদের তাপ থেকে হুযূর আকরাম (সা)-কে ছায়া করতে লাগলেন। ফলে মদীনাবাসীর চিনতে আর কোন অসুবিধা রইল না এদের মধ্যে কে খাদেম আর কে মাখদূম।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে তিন মাইল দূরে একটি উচ্চ ভূমি আছে। একে আলিয়া বা কোবা বলা হয়। এখানে আনসারদের অনেক গোত্র বসবাস করে। এ সব গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট আমর ইব্‌ন আওফ-এর খান্দান। আর কুলছূম ইব্‌নু'ল হাদ্‌ম ছিলেন গোত্রের প্রধান। মহানবী (সা) এখানে এসে পৌঁছুতেই গোত্রের লোকেরা আনন্দের আতিশয্যে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে ওঠে। তাদের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য লিখিত ছিল যে, সরকারে দো'আলম (সা) তাদের মেহমানদারি কবুল করবেন। আনসাররা দলে দলে এসে হাজির হচ্ছিল এবং পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে নবী করীম (সা)-কে সালাম করছিল।[১]

কোবায় মসজিদ নির্মাণ

এখানে এসে তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা ছিল মসজিদ নির্মাণ। কুলছুম ইব্‌নুল হাদ্‌ম-এর এক খণ্ড জমি ছিল পতিত ও অনাবাদী যেখানে খেজুর শুকানো হতো। এখানেই তাঁর মুবারক হাতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর এই মসজিদের শানে কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

১. সহীহ বুখারী, মানাবিকুল-আনসার, হিজরত অধ্যায়; সহীহ মুসলিম, হিজরত অধ্যায়; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পৃ.।

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, ওটাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন।"

[সূরা তওবা,১০৮ আয়াত]

মসজিদ নির্মাণে শ্রমিক-মজুরদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) নিজেও কাজ করতেন। তিনি ভারী ভারী পাথরগুলো বহন করতেন আর তা ওঠাতে গিয়ে তাঁর মুবারক শরীর নুইয়ে পড়ত। ভক্তেরা দৌড়ে আসত এবং আরয পেশ করত, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আপনি ছেড়ে দিন। আমরাই ওঠাব এগুলো। তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই সম ওযনের আরেকটি পাথর তুলে নিতেন।[১] আবদুল্লাহ ইব্‌নে রওয়াহা (রা) ছিলেন কবি। তিনিও শ্রমিকদের সাথে এ কাজে শরীক ছিলেন এবং যেভাবে শ্রমিকরা কাজ করার সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য গান গাইতে থাকে, তিনি তেমনি নিম্নোক্ত কবিতাটি সুর করে আবৃত্তি করতেন,

افلح من يعالج المساجدا

ويقرء القران قائما وقاعدا

ولا يبيت الليل عنه راقدا

"তারাই সফল ও কামিয়াব যারা মসজিদ মেরামত করে, ঠিক করে; উঠতে বসতে কুরআন পাঠ করে এবং রাত জেগে কাটায় (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত -বন্দেগী করে)।"

আবদুল্লাহ ইব্‌নে রওয়াহা (রা)-এর সঙ্গে মহানবী (সা)-ও সুর মিলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছিলেন।[২]

মদীনার প্রথম জুমুআ

পহেলা হিজরীর সেই রবিউল আওয়াল ছিল জুমুআর দিন। নবী করীম (সা) কোবা থেকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে মদীনার সালেম গোত্রে গিয়ে পৌঁছুতেই জুমুআর ওয়াক্‌ত হয়ে যায়। এখানে শ'খানেক লোক নিয়ে তিনি জুমুআর নামায আদায় করেন। এটাই ছিল ইসলামে পয়লা জুমুআ।[৩] নামাযের পূর্বে নিম্নোক্ত খুতবা প্রদান করেন ঃ

"সমস্ত হাম্‌দ ও প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমি তাঁরই প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দরবারে

১. ওফাউল ওয়াফা, তাবারানী কবীরের বরাতে, ১ম খণ্ড, ১৮০;

২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৮১ ইব্‌ন আবী শায়বার বরাতে।

৩. বায়হাকীর দালাইলুন-নুবুওয়া, ২য় খণ্ড, ৫০০; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৫৯।

হেদায়েত কামনা করছি। আমি তাঁরই ওপর ঈমান আনছি। আমি তাঁর নাফরমানী করি না এবং যারা তাঁর নাফরমানী করে আমি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনিই তাঁকে হেদায়েত, নূর ও নসীহতসহ এমন এক যুগে পাঠিয়েছেন যখন অনেক কাল থেকে কোন নবী-রসূল দুনিয়াতে আসেননি। ইল্‌ম হ্রাস, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁকে শেষ যমানায় কিয়ামতের কাছাকাছি এবং মৃত্যু নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছিল। যে কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে সেই পথ পায় আর কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে, না মানলে পথভ্রষ্ট হয়, রাস্তা হারায়, অন্ধকার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়।

"মুসলমানেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি তথা তাকওয়া এখতিয়ার করবার জন্য ওসিয়ত করছি। আর সর্বোত্তম ওসিয়ত যা একজন মুসলমান আরেক জন মুসলমানকে করতে পারে তা হলো, তাকে আখেরাতের জন্য, পারলৌকিক যিন্দেগীর জন্য উৎসাহিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে এবং তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলবে।

"লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব বিষয় বা বস্তু থেকে বেঁচে থাকার জন্য, পরহেয করবার জন্য বলেছেন সে সব পরহেয করো। এর চেয়ে বড় কোন নসীহত নেই, উপদেশ নেই। আর এর চেয়ে বড় কোন যিকরও নেই। মনে রেখো, আখেরাতের বিষয়গুলো সম্পর্কে সেই লোকের জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে কাজ করছে, তাকওয়া সর্বোত্তম সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। আর কেউ যখন নিজের ও তাঁর স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বু'ল-আলামীনের মধ্যবর্তী ব্যাপারগুলো প্রকাশ্যে ও গোপনে সহীহ-শুদ্ধ করে নেবে এবং এ ব্যাপারে সে আন্তরিক হবে, তার নিয়ত খালেস হবে, নির্ভেজাল হবে, এমনটি তার জন্য দুনিয়ার বুকে যিকর ও মৃত্যুর পর (যখন মানুষ আমলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জানতে পারবে) বিরাট ভাণ্ডারে পরিণত হবে। কিন্তু কেউ যদি তা না করে (তো তার উল্লেখ এই আয়াতে আছে) তখন মানুষ পসন্দ করবে যে, তার আমল তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হোক (অর্থাৎ মানুষ তার বদ আমলগুলো দেখতে চাইবে নাম, এমন কি এগুলোর কাছাকাছি থাকাকেও পসন্দ করবে না)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছেন (তোমরা তাঁর সম্পর্কে একেবারে নির্ভীক হয়ে যেও না) এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর অত্যন্ত মেহেরবানও। আর যে আল্লাহ্‌র হুকুমকে সত্য জেনেছে, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী বর্তমান, "আর আমার কথার নড়চড় হয় না আর আমি আমার বান্দার ওপর জুলুম করি না" (আল-কুরআন)।

"মুসলমানেরা! নিজেরা এখন যা করছ এবং ভবিষ্যতে যা করবে, প্রকাশ্য হোক অথবা গোপন, সকল কাজে তাকওয়া তথা আল্লাহ্-ভীতিকে সামনে রাখবে। কেননা যারা তাকওয়া এখতিয়ার করবে তারা বিরাট কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর তাকওয়াই তো আল্লাহ্র অসন্তোষ, শাস্তি ও ক্রোধ দূরে সরিয়ে দেয়। এই তাকওয়াই তো মানুষের চেহারাকে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এনে দেয় এবং তার সম্মান ও দর্জাকে বুলন্দ করে।

"মুসলমানেরা! আনন্দ কর, দুনিয়ার স্বাদ ভোগ কর। কিন্তু হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহ্র হকের ব্যাপারে, অধিকারের ক্ষেত্রে কোন রকম অবহেলা করো না। আল্লাহ পাক এজন্যই তোমাদেরকে তাঁর কিতাব শিখিয়েছেন এবং তাঁর পথ প্রদর্শন করেছেন যে, সত্য পথের পথিক ও মিথ্যানুসারীদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেওয়া হোক।

"লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তোমরাও মানুষের সাথে তেমনি আচরণ কর। যারা আল্লাহ্র দুশমন তাদের দুশমন ভাব এবং আল্লাহ্র পথে পূর্ণ হিম্মতের সাথে, মনোযোগ সহকারে মেহনত-মুজাহাদা চালিয়ে যাও। তিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন যাতে করে যারা ধ্বংস হবে তারাও উজ্জ্বল দলীল -প্রমাণের ওপর ধ্বংস হয়। আর যারা জীবন- যিন্দেগী লাভ করবে তারাও যেন উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই তা পায়। সর্বপ্রকার নেকী আল্লাহ্র সাহায্যেই লাভ করা যায়।

"লোক সকল! আল্লাহ্র যিক্র কর, আল্লাহকে স্মরণ কর, ভবিষ্যত যিন্দেগীর জন্য আমল কর। কেননা কোন লোক যখন তার ও আল্লাহ্র মাঝের সম্পর্ক ঠিক করে নেয়, সহী-শুদ্ধ করে নেয় তখন আল্লাহ তা'আলাও তার ও অপরাপর লোকের মধ্যকার ব্যাপারগুলো সহীহ-শুদ্ধ করে দেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর হুকুম পরিচালনা করেন এবং তাঁর ওপর কারুর হুকুম চলে না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান এবং বান্দা তাঁর ওপর কোন প্রকার ক্ষমতা বা এখতিয়ার রাখে না। আল্লাহ মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আর আমরা ভাল কাজের শক্তি একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।" [১]

মদীনায় হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) -এর গৃহে অবস্থান

মদীনা তাইয়েবায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের খবর মিলতেই আনন্দের আতিশয্যে লোকজন চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে লাগল। কোবা থেকে মদীনা পর্যন্ত লোকজন দু' সারি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পথিমধ্যে আনসারদের বিভিন্ন গোত্র ও

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৮০৭ পৃ.।

খান্দানের লোকেরা আসত এবং নবী করীম (সা)-এর সামনে এসে হাত জোড় করে অনুরোধ জানাত, " হুযূর! এই আমাদের ঘর আর এই আমাদের জান ও মাল"। তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। তাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোআ করতেন এবং বলতেন, আমার উটনীর রাস্তা ছেড়ে দাও। সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। এভাবে মদীনার পাঁচটি বড় বড় গোত্রের সর্দার এসে হুযূর আকরাম (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একই রূপ আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন ঃ হুযূর! এই আমাদের ঘর, আর এই রইল আমাদের জান ও মাল,আপনার খেদমতে, আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত। তিনি একই রূপ জওয়াব দিতেনঃ উটনীর পথ ছেড়ে দাও। যেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম সে সেখানেই গিয়ে থামবে।[১] এভাবেই এক সময় শহর নিকটবর্তী হল। এ সময় লোকের জোশ-জযবা ও আবেগ-উদ্দীপনার অবস্থা এমন ছিল যে, পর্দানশীন মহিলারা পর্যন্ত যার যার বাড়িঘরের ছাদে উঠে নবীজীকে দেখতে থাকে এবং গাইতে থাকে,

طلع البدر علينا ـ من ثنيات الوداع

وجب ٱلشكر علينا مادعى لله داع

ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদা পর্বতমালার পাশ দিয়ে আজ আমাদের ওপর পূর্ণ চাঁদের উদয় হয়েছে।

"অতএব, প্রার্থনাকারী যতদিন আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতে থাকবে ততদিন এই সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য।

"হে শাহানশাহে দো'আলম! আপনি অনুসরণীয় নির্দেশ নিয়ে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন।"[২]

অপর দিকে কচি কচি মাসুম বালিকারা দফ বাজিয়ে গাইছিল,

نحن جوار من بنى نجار ياحبذا محمد من جار۔

"আমরা নাজ্জার বংশীয় বালিকা! মুহাম্মদ (সা) কত উত্তম প্রতিবেশী আমাদের।"

তিনি বালিকাদের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমরা কি আমাকে চাও? আর আমাকে কি তোমরা ভালবাস, ভালবাসবে?" তারা সকলেই তখন সানন্দে ও সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয় চাই আর আমরা আপনাকে ভালবাসি,

---

১. দালাইলুন নুবূওয়া, ২য় খণ্ড, ৫০৩-৪।
২. প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, ৫০৬-৭; ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২৬১পৃ.।

ভালবাসব চিরদিন।" মহানবী (সা) তখন বলে উঠলেন, "আমিও তোমাদের ভালবাসি, ভালবাসব চিরদিন।"[১]

এভাবে চলতে চলতে বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত— এরই সংলগ্ন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ঘর ছিল— উটনী সেখানে গিয়ে বসে পড়ল। হযরত আবূ আইয়ূব-এর বাড়ি ছিল দোতলা। তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর জন্য বাড়ির ওপর তলা পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাক্ষাতে আগমনকারী লোকদের সুবিধার কথা ভেবে নিচের তলায় অবস্থান করাই সঙ্গত মনে করলেন।[২]

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) মহানবী (সা)-র খেদমতে দু'বেলা খাবার পাঠাতেন। তিনি খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত আবূ আইয়ূব ও তাঁর স্ত্রী তাই পরম তৃপ্তিভরে খেতেন। এমন কি পাত্রের যে অংশে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আঙুলের নিশানা দেখতে পেতেন আবূ আইয়ূব (রা) তাবার্রুক মনে করে সেখান থেকেই খেতেন।[৩]

একদিনের কথা। দোতলায় রক্ষিত পানির কলস ভেঙে যায়। হযরত আবূ আইয়ূব (রা) ভাবলেন, পানি গড়িয়ে নিচে গেলে হুযূর (সা)-এর শরীরে গিয়ে পড়তে পারে। এতে তিনি কষ্ট পাবেন। রাত্রে গায়ে দেবার জন্য একটিমাত্র লেপই ঘরে ছিল। তিনি সেটাকেই তাড়াতাড়ি পানির ওপর ফেলে দিলেন যাতে তা পানি শুষে নেয় এবং গড়িয়ে নিচে না যেতে পারে।[৪]

মসজিদে নববী ও বাসগৃহ নির্মাণ

মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম কাজ ছিল ইবাদতের জন্য আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ তৈরি করা। এতদিন তিনি পশুপালের খোয়াড়রূপে ব্যবহৃত একটি জায়গায় নামায পড়তেন। এর পাশেই নাজ্জার গোত্রের একখণ্ড জমি ছিল। জমিতে কয়েকটি কবর ছিল। কিছু খেজুর গাছও ছিল। তিনি তাদের ডেকে বললেন, আমি জমিটুকু কিনতে আগ্রহী। তারা বলল, আমরা জমির দাম নেব বটে, কিন্তু আপনার কাছে থেকে নয়, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আসলে ঐ জমির মালিক ছিল দুই এতিম বালক। তিনি তখন নিজেই এতিম বালকদ্বয়কে ডেকে পাঠালেন। বালকদ্বয় বিনা মূল্যে আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-কে জমি দান করতে রাজী হল। কিন্তু তিনি বিনা মূল্যে গ্রহণে রাজী হলেন না। রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবূ আইয়ূব (রা)

১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৫০৮ পৃ.; ফতহুল বারী , ৭ম খণ্ড, ২৬১ পৃ.।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড. ৪২০ পৃ.; ইমাম যাহবী একে সহীহ বলেছেন। সীরাত ইব্‌নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৯৮।
৩. সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃ.।
৪. মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪৬০ পৃ.।

জমির মূল্য পরিশোধ করেন। এর পর কবরগুলো কোদাল দিয়ে সমতল করে দেওয়া হয়। অতঃপর মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। শাহানশাহে দোআলম (সা)-এর শরীর মুবারকে এখন শ্রমিক মজদুরের পোশাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সঙ্গে তিনিও কাজ করছেন, কাজ করছেন একজন সাধারণ শ্রমিকের মতই। সাহাবায়ে কেরাম পাথর বহন করতেন এবং নিম্নোক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আবৃত্তি করছিলেন ঃ

اللهم لا خير الا خير الاخره فارحم الانصار والمهاجرة -

"হে আল্লাহ! আখেরাত জীবনের সাফল্য ব্যতিরেকে আর কোন সফলতা নেই; অতএব, আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা কর, দয়া কর।"[১]

এই মসজিদ সর্বপ্রকার লৌকিকতা ও আড়ম্বরতা থেকে মুক্ত ছিল, ছিল সর্বপ্রকার সহজ সারল্যের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ কাঁচা ইটের দেওয়ালে খেজুর গাছের খুঁটি এবং ওপরে খেজুর পাতার ছাউনি। এর কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফেরানো।[২] কিন্তু কেবলা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফ নির্ধারিত হলো তখন উত্তর দিকে একটি নতুন দরজা স্থাপন করা হয়। মেঝে ছিল মাটির বিধায় বৃষ্টি হলে কাদা হয়ে যেত। একবার সাহাবায়ে কিরাম সালাত আদায়ের উদ্দেশে আসার সময় কিছু কিছু নুড়ি পাথর সাথে নিয়ে আসেন এবং স্ব-স্ব সালাতের স্থানে বিছিয়ে দেন। রসূল (সা) খুব পসন্দ করেন এবং পাথরের টুকরো মেঝেয় বিছিয়ে ফরাশ তৈরী করে দেন। মসজিদের একদিকে একটি ছাদযুক্ত চবূতরা ছিল যাকে সুফফা বলা হতো। এটা সেই সব লোকের জন্য সংরক্ষিত ছিল যাদের ঘরবাড়ি ছিল না এবং যারা ছিলেন নও মুসলিম। মসজিদে নববীর নির্মাণ সম্পন্ন হলে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে নবীসহধর্মিনীগণের নিমিত্ত হুজরা নির্মাণ করা হয়। তখন পর্যন্ত নবী সহধর্মিনী হিসেবে কেবল হযরত সাওদা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন বিধায় এ দু'জনের জন্য দু'টো হুজরা নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে অপরাপর সহধর্মিনীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আরও হুজরা নির্মিত হয়। এ সব হুজরাও কাঁচা ইটেরই ছিল। তবে এগুলোর মধ্যে পাঁচটি ছিল খেজুর পাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। যে সব হুজরার দেওয়াল কাঁচা ইটের গাথুনি নির্মিত ছিল সেগুলোরও ভেতরের পার্টিশন খেজুর পাতার বেড়া ঘেরা ছিল। হুজরার বিন্যাস ছিল এ রকমঃ উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা, যয়নব, জুওয়াইরিয়া, মায়মূনা, যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা)-এর হুজরা ছিল সিরিয়ার দিকে আর হযরত আয়েশা, সফিয়্যা ও সাওদা (রা)-র

১. বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল -আনসার; সুনানে আবূ দাউদ।
২. যাদুল- মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃ.।

হুজরা ছিল সম্মুখ ভাগে। এসব হুজরা মসজিদে নববীর এতটা সংলগ্ন ছিল যে, নবী করীম (সা) ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং নবী সহধর্মিনিগণ তাঁদের স্ব-স্ব হুজরায় বসেই হুযূর আকরাম (সা)-র মস্তক মুবারক ধুয়ে মুছে দিতেন। হুজরাগুলো দশ হাত লম্বা এবং ছয় থেকে সাত হাত চওড়া ছিল। ছাদ এতটা উঁচু ছিল যাতে একজন ভেতরে দাঁড়ালে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। দরজার ওপর কম্বলের পর্দা টাঙানো থাকত।[১]

রাতের বেলা চেরাগ (প্রদীপ) জ্বলত না।[২] নবী করীম (সা)-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে সব আনসার ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সা'দ ইব্নে উবাদা, সা'দ ইব্নে মু'আয, আম্মারা ইব্নে হারাম ও আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) ছিলেন ধনী ও নেতৃস্থানীয়। তাঁরা নবী করীম (সা) -এর খেদমতে দুধ পাঠিয়ে দিতেন এবং এর ওপর তিনি দিনাতিপাত করতেন। সা'দ ইব্নে উবাদা (রা) রাত্রির খাবার হিসেবে সবসময় নিজের বাড়ি থেকে এক বড় পেয়ালা পাঠিয়ে দিতেন। এতে কখনো তরি-তরকারি, কখনো দুধ, আবার কখনো-বা ঘি থাকত।[৩]

হযরত আনাস (রা)-এর মা উম্মু আনাস তাঁর সম্পত্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি তা কবুল করে স্বীয় ধাত্রী মাতা উম্মু আয়মানকে দিয়ে দেন এবং নিজে দারিদ্রের জীবন অবলম্বন করেন।[৪]

আযানের প্রচলন

ইসলামের সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর মূল কেন্দ্র ঐক্য ও সামাজিক সংহতি। তখন পর্যন্ত কোন বিশেষ আলামত না থাকার কারণে সালাতের ক্ষেত্রে জামাআতের কোন এন্তেজাম ছিল না। লোকে আগে পরে আসতেন এবং যিনি যে সময় আসতেন, সালাত আদায় করে নিতেন। নবী করীম (সা)-এর এটা পসন্দনীয় ছিল না। তিনি একজন লোক নিযুক্ত করতে চাইলেন যিনি সময়মত লোকদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু এতেও সমস্যা ছিল। তাই তিনি সাহাবাদের ডেকে পরামর্শ করলেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন, সালাতের ওয়াক্ত হলে মসজিদে একটি পতাকা লটকিয়ে দেওয়া হবে যাতে করে লোকে তা দেখে মসজিদে এসে যাবে। তিনি এই তরীকা পসন্দ করলেন না। খ্রিস্টান ও ইয়াহূদীদের মাঝে ইবাদত-বন্দেগীর সময় লোকজন ডেকে আনবার যে পন্থা প্রচলিত ছিল কেউ কেউ সেই পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিলেন।

---

১. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানীকৃত,১ম খণ্ড, ২৮১-৮২;তাবাকাত ইবনে সাদের বরাতে।
২. বুখারী, কিতাবুস-সালাত।
৩. তাবাকাত ইব্নে সা'দ, কিতাবুন,-নিসা, পৃ.১১৬।
৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল হেবা, মুনায়হার ফযীলত সম্পর্কিত অধ্যায়।

শেষ পর্যন্ত হযরত ওমর (রা)-প্রদত্ত পরামর্শ মহানবী (সা) পসন্দ করলেন এবং হযরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন।[১] এর ফলে একদিকে তো সালাতের ব্যাপারটা সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে যেত, অন্যদিকে দিনে পাঁচবার ইসলামের দাওয়াতের ঘোষণাও হয়ে যেত।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন

মুহাজিররা মক্কা মুআজ্জমা থেকে একেবারে নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যদিও ধনী ও সচ্ছল লোকও ছিল, কিন্তু কাফিরদের চোখ এড়িয়ে চুপিসারে আসতে হওয়ায় তাঁরা কিছুই সাথে আনতে পারেন নি। যদিও আনসারদের ঘরে মুহাজিরদের খানাপিনার সাধারণ ইন্তেজাম ছিল, তারপরও এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী ইন্তেজামের প্রয়োজন ছিল। মুহাজিররাও দান-খয়রাতের ওপর জীবন যাপন করা পসন্দ করতেন না। তাঁরা চাইতেন কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু কি করবেন? তাঁরাতো ছিলেন একেবারেই খালি হাত, কপর্দকহীন। এজন্য হুযূর আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণের কাজ সমাপ্তপ্রায় হতেই আনসারদের ডেকে পাঠালেন। হযরত আনাস ইব্নে মালিক (রা)-এর বয়স ছিল তখন দশ বছর। তাঁর ঘরেই লোকেরা সমবেত হলো।[২] এ সময় মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন। হুযূর আকরাম (সা) আনসারদের সম্বোধন করে বললেন, এঁরা (অর্থাৎ মুহাজিররা) তোমাদেরই ভাই। এরপর তিনি একজন মুহাজির ও একজন আনসারকে ডেকে বললেন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং কি আশ্চর্য! একথা বলার পর তাঁরা দু'জন আপন ভাই হয়ে গেলেন। এরপর আনসাররা তাঁদের মুহাজির ভাইদের ডেকে সাথে করে ঘরে নিয়ে যান এবং বাড়িঘরের সব কিছু চুলচেরা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, এখন থেকে এসবের অর্ধেক তোমার এবং অর্ধেক আমার।[৩] সা'দ ইবনুর রবী (রা)-র ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর সঙ্গে। সা'দ (রা)-এর ছিল দুই স্ত্রী। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে বলেন, আমি আমার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি। আপনি তাকে বিয়ে করুন। কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা অস্বীকার করেন।[৪]

আনসারদের ধন-সম্পদ বলতে যা ছিল তা ছিল খেজুর বাগান। টাকা-পয়সা সে যুগে বলতে গেলে ছিলই না। তাঁরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আবেদন

১. বুখারী, কিতাবুল আযান, সহীহ মুসলিমসহ আরও দ্র।
২. যাদু'ল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃ.।
৩. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানীকৃত, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃ.; ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৫০৪-৭.পৃ.।
৪. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব।

জানান, আমাদের এ সব বাগান আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন সমান অংশে। মুহাজিররা পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। এজন্য ক্ষেত-খামার সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ ও অপরিচিত। সেজন্য রসূল আকরাম (সা) মুহাজিরদের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব অস্বীকার করেন। আনসাররা বললেন, সব কাজ-কর্ম আমরা নিজেরাই করব। ফল-ফসল যা-ই উৎপন্ন হবে আমরা আধা-আধি ভাগ করে নেব অর্থাৎ অর্ধেক আমাদের হবে আর অর্ধেক হবে মুহাজির ভাইদের। মুহাজিররা এ প্রস্তাব মেনে নেন।[১] এই সম্পর্ক আপন আত্মীয় সম্পর্কের ন্যায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোন আনসার মারা গেলে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে মুহাজির ভাই অংশ পেত এবং ভাই-বন্ধু মাহরূম হত। এটা ছিল সেই খোদায়ী নির্দেশ পালন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْ وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা ঐ সব লোককে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা একে অন্যের ভাই ভাই।" [সূরা আনফাল, ৭২ আয়াত]

বদর যুদ্ধের পর যখন মুহাজিরদের আর সাহায্যের প্রয়োজন রইল না তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ -

"আত্মীয়রা পরস্পরে পরস্পরের অধিক হকদার।" [সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত] দুনিয়া আনসারদের এই আত্মোৎসর্গের ঘটনা নিয়ে সর্বদাই গর্ব করবে। কিন্তু এটা-ও লক্ষ্যণীয় যে, মুহাজিররা কি করেছেন? সা'দ ইব্নুর রবী (রা) যখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে বাড়ীঘরের সব কিছু তুলে ধরে অর্ধেক নেবার জন্য বললেন তখন তিনি কেবল এটুকু বললেন, আমাকে বাজারের পথটি বলে দিন। তিনি তাঁকে বনূ কায়নুকার বিখ্যাত বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিলে আবদুর রহমান কিছু ঘি আর পনীর কিনে বাজারে যান এবং সন্ধ্যা নাগাদ কেনাবেচা করেন। এভাবে কিছু দিনের মধ্যেই এত বিত্তবান ও সম্পদশালী হয়ে ওঠেন যে, তিনি এর পর বিয়ে করেন।[২] ক্রমান্বয়ে তিনি ব্যবসায় এত উন্নতি করতে সক্ষম হন যে, তিনি বলতেন, আমি মাটিতে হাত রাখলেও তা সোনায় পরিণত হয়। তাঁর ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী সাত শত উট বহন করত এবং এই কাফেলা যখন পণ্যসামগ্রী নিয়ে মদীনায় পৌঁছুত তখন গোটা মদীনায় হৈ চৈ পড়ে যেত।[৩] কোন কোন সাহাবী দোকান খুলে বসেন।

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব; ২. প্রাগুক্ত;
৩. উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড ৩১৪-১৫ পৃ.।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর কারখানা ছিল সানাহ নামক স্থানে। সেখানে তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন।[১] হযরত উছমান (রা) বনূ কায়নুকার বাজারে খেজুর কেনাবেচা করতেন। হযরত ওমর (রা) ও ব্যবসা শুরু করেন এবং এর পরিধি ও বিস্তৃতি পারস্য পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।[২] অন্যান্য সাহাবীও ছোটবড় নানা রকম ব্যবসা শুরু করেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র যখন অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয় যেখানে অন্যান্য সাহাবী এত পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করতেন না তখন এর জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, "এতে আমার অপরাধ কোথায়? লোকেরা যখন বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করত আর আমি রাত-দিন অষ্ট প্রহর দরবারে নববীতে পড়ে থাকতাম।"[৩]

অতঃপর খয়বর বিজিত হলে সমস্ত মুহাজির সাহাবী আনসারদের খেজুর বাগানগুলো তাদের ফিরিয়ে দেন। সহীহ মুসলিম-এর জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম (সা) যখন খয়বর যুদ্ধ থেকে অবসর পেলেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুহাজিররা আনসারদের প্রদত্ত খেজুর বাগানগুলো ফেরত দিলেন। মুহাজিরদের বসবাসের বাড়িঘরের ব্যবস্থা হিসেবে আনসারদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী যেসব বিরান জমি পড়েছিল সেগুলো তারা দিয়ে দিলেন এবং যাদের এ ধরনের জমি ছিল না তারা নিজেদের বাড়িঘরই তাঁদের (মুহাজিরদের) দিয়ে দিলেন।[৪]

এ সময় আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি মেহমানদারি ও সহানুভূতির যেই অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজীর মেলা ভার। যখন বাহরায়ন বিজিত হল তখন হুযূর আকরাম (সা) আনসারদের ডেকে বললেন যে, আমি বাহরায়নকে আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চাই। তখন তারা বলেছিলেন, আমরা কেবল তখনই তা নিতে পারি যখন আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও প্রথমে সমপরিমাণ জমি প্রদান করা হবে।[৫]

একবার একজন ক্ষুধার্ত লোক নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে জানাল, সে খুবই ক্ষুধার্ত। তিনি ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে খাবার মত কিছু আছে কিনা। জওয়াব এল, পানি ছাড়া কিছু নেই। তিনি তখন উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন কেউ আছ যে, একে মেহমানদারি করতে পার? সাহাবী আবূ তালহা (রা) বললেন, খেদমতের জন্য আমি হাজির আছি। এরপর তিনি

---

১. তাবাকাত ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, ১২০ পৃ.।
২. মুসনাদে আহমদে এ বর্ণনা পাওয়া যাবে।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল-ইল্‌ম।
৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার।
৫. সহীহ বুখারী, মানাকিব আল-আনসার অধ্যায়; ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ১১৯।

ক্ষুধার্ত লোকটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ঘরের অবস্থাও তথৈবচ। আবূ তালহা (রা)-র স্ত্রী জানালেন, ঘরে কেবল বাচ্চাদের খাবার আছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, বাতি নিভিয়ে দাও এবং সেই খাবারই এনে মেহমানের সামনে রাখ। এরপর তাঁরা মেহমানসহ খেতে বসলেন। মেহমান খেতে থাকলেও স্বামী-স্ত্রী খাওয়ার অভিনয় করে হাত-মুখ নাড়তে লাগলেন এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটালেন। তাঁদের এই ত্যাগের ঘটনা উপলক্ষেই এই আয়াত নাযিল হয়,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

"তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে নিজেদের মুকাবিলায় অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়।"[১]

মসজিদে নববীর সুফফা

মসজিদে নববীর প্রান্তে অবস্থিত মসজিদ সংলগ্ন নির্মিত একটি চবুতরা।[২] চবুতরাকে আরবী ভাষায় সুফফা বলা হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অধিকাংশই ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণের সাথে সাথে সব রকম পার্থিব কাজ-কারবার, যথাঃ ব্যবসা -বাণিজ্য কিংবা কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদের জীবন কেবল ইবাদত- বন্দেগী ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর তরবিয়তী ধারা থেকে উপকৃত হবার নিমিত্ত উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ সব সাহাবীর ছেলেমেয়ে ছিল না। আর কেউ বিয়ে-শাদী করলে তাঁরা এই হাল্কা থেকে বেরিয়ে যেতেন। তাঁদের ভেতর একদল দিনের বেলায় জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে সাথীদের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতেন। এঁরা দিনের বেলায় দরবারে নববীতে হাজির থাকতেন। রসূল আকরাম (সা) যা বলেন তা শুনতেন এবং রাতের বেলায় এই চবুতরায় (সুফফায়) পড়ে থাকতেন।[৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) এঁদেরই অন্তর্গত ছিলেন। এঁদের কারুর কাছেই চাদর-লুঙ্গি একত্রে থাকত না। তাঁরা চাদর গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিতেন যা হাটু পযর্ন্ত গিয়ে পড়ত।[৪] অধিকাংশ সময় আনসাররা খেজুরভর্তি শাখা কেটে নিয়ে আসতেন এবং ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতেন। পাকা খেজুরগুলো পড়লে তাঁরা উঠিয়ে খেয়ে নিতেন। কখনো দু'দিন ধরে খাবার মিলত না। অনেক সময় এমন হতো যে, রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আসতেন এবং নামায পড়াতেন, সুফফার

১. সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার; ফতহুল-বারী, ৭ম খণ্ড, ১১৯ পৃ.।
২. ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খণ্ড, ৩২১;।
৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা।
৪. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ; হিলয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃ.।

সদস্যরা এসে নামাযে শরীক হতেন, কিন্তু ক্ষুধায় কাতর ও দুর্বল হওয়ায় তাঁরা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যেতেন। বাইরের লোকেরা আসত এবং মনে করত, লোকগুলো পাগল হবে।[১] রসূল আকরাম (সা)-এর খেদমতে কোথাও থেকে সাদকার খানা এলে গোটাটাই তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর দাওয়াতের খানা এলে তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠাতেন এবং একত্রে বসে খেতেন।[২] অধিকাংশ সময় এমন হত যে, রাত্রি বেলা তিনি তাঁদেরকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য মাফিক প্রত্যেকেই একজন দু'জন করে নিজেদের সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে খানা খাওয়াতেন।[৩] সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও ধনী মানুষ। তিনি কখনো কখনো আশি জনের মত মেহমান নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। নবী করীম (সা) এদের প্রতি এত বেশী খেয়াল রাখতেন যে, একবার নবী করীম (সা)-এর কাছে তাঁরই কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) দরখাস্ত পেশ করলেন, যাতায় গম পিষতে পিষতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে গেছে। তাঁকে একজন দাসী দেওয়া হোক। তখন নবী করীম (সা) বললেন, এটা হতে পারে না যে, আমি তোমাকে দেব আর ওদিকে সুফফার লোকেরা না খেয়ে মারা যাক![৪] রাতের বেলা সাধারণত তাঁরা ইবাদত করতেন এবং কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। তাঁদের জন্য একজন মুআল্লিম নিযুক্ত ছিল। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁরা পড়তেন। এজন্য তাঁদের অধিকাংশকেই কারী বলা হতো। ইসলামের দাওয়াতের জন্য কখনো কোথাও কাউকে পাঠাতে হলে এঁদেরকেই পাঠানো হতো। বীরে মাউনার যুদ্ধে এঁদের ভেতর থেকেই সত্তর জন কারীকে ইসলাম শেখাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল।[৫]

বদর যুদ্ধ

হিজরতের সাথে সাথেই কুরায়শরা মদীনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে তারা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তোমরা হত্যা কর, নইলে আমরাই এসে তোমাদের ফয়সালা করছি।[৬] কুরায়শদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী মদীনার দিকে টহল দিয়ে ফিরত। কুর্য ফিহরী মদীনার চারণ ক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত এসে মাঝে-মধ্যে লুট পাট করত। আক্রমণের জন্য সবচে' বেশী প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের জন্য দরকারী সমরোপকরণ ও রসদপত্র বন্দোবস্ত করা।

১. তিরমিযী, আবওয়াবুয-যুহদ।
২. বুখারী, কিতাবুর রিকাক।
৩. প্রাগুক্ত, মাওয়াকিত।
৪. সুনান বায়হাকী, ৯ম খণ্ড, ৩০৪ পৃ.; মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, ৭৯-১০৬পৃ.।
৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বুখারীতেও এর উল্লেখ রয়েছে।
৬. সুনান আবী দাউদ, ২য় খণ্ড, ৬৭ পৃ.।

এতদুদ্দেশ্যে এবারকার মৌসুমে কুরায়শদের যেই বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে তাতে মক্কার সকল লোক যার কাছে টাকা-পয়সা যা ছিল তার সবটাই এতে বিনিয়োগ করেছিল। কেবল পুরুষরাই নয়, বরং মহিলারাও, যারা সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবারে খুব কমই অংশ গ্রহণ করত, তারাও সকলেই এতে অংশ নিয়েছিল। কাফেলা তখনও সিরিয়া থেকে রওয়ানা হয়নি ঠিক এমনি মুহূর্তে হাদরামীর নিহত হবার আকস্মিক ঘটনা সংঘটিত হয় যা কুরায়শদের ক্রোধাগ্নিকে আরও উস্কে দেয়। ইতোমধ্যে মক্কার সর্বত্র এই খবর ছড়িয়ে পড়ে, মুসলমানরা তাদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করবার উদ্দেশে এগিয়ে আসছে। ফলে কুরায়শদের ক্রোধ ও রোষবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং আরবের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে।[১]

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এসব অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে একত্র করেন এবং পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন।[২]

হযরত আবূ বকর (রা) প্রমুখ সাহাবী আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দান করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কেননা আনসাররা বায়'আতে আকাবাতে শপথ করার সময় কেবল এতটুকু অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা কেবল তখন তলোয়ার ধারণ করবেন যখন দুশমন মদীনার ওপর চড়াও হয়ে হামলা করবে। তিনি দ্বিতীয়বার পরামর্শ করলেন। তৃতীয়বারে আনসাররা বুঝতে পারলেন, রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এ সময় আনসারদের পক্ষে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হুযূর আকরাম (সা) সম্ভবত ভেবেছেন, আনসার তাদের শহর থেকে বেরিয়ে হুযূর (সা) কে সাহায্য-সহযোগিতা করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে কি না। আমি আনসারদের পক্ষ থেকে আরয করতে চাই, আমরা সর্বাবস্থায় হুযূর (সা)-এর সাথে আছি। আপনি কারুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ

---

১. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃ.; কুর্য ফিহরীর ঘটনা তাবাকাত ইব্নে সা'দ - এর ২য় খণ্ডে ৯ম পৃষ্ঠায় এবং হাদরামীর ঘটনা সুনান বায়হাকীর ৯ম খণ্ডে, ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্তমান।

২. উল্লেখ্য, এই ঘটনা মদীনা তাইয়িবা থেকে বেরিয়ে যাবার পরে। রসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলা ধরার নিয়তে বেরিয়েছিলেন। সহীহ হাদীছগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হবার পর আকস্মিকভাবেই এ বিষয়টি ধরা পড়ে যে, কুরায়শ বাহিনী বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করাবার জন্য কাছাকাছি এসে গেছে। সে সময় নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা পাকড়াও করার উদ্দেশ্য ছিল সেই বিপদাশংকা দূর করা যা মদীনার ওপর হামলার আকারে মাথার ওপর ঘুরছিল। ইতিহাসে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরায়শরা এই কাফেলা মূলত সমরাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশে পাঠিয়েছিল।

হোন অথবা কারুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হোন, আমাদের অর্থ-সম্পদ যতটা খুশী আপনি গ্রহণ করুন এবং যত খুশী আপনি দান করুন, আমাদের সম্পদের সেই অংশ যা আপনি গ্রহণ করবেন আমাদের নিকট অধিক পসন্দনীয় হবে সেই অংশ থেকে যা আমাদের কাছে রেখে দেবেন। হুযূর (সা) আমাদের যেই হুকুম দেবেন আমরা তা পালন করব। যদি হুযূর (সা) গামদানের ঝর্না পর্যন্ত অগ্রসর হন আমরা সাথী হব। হুযূর (সা) যদি সমুদ্রেই ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে আমরাও হুযূর (সা)-এর সঙ্গে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব।[১] হযরত মিকদাদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাদের মত নই যে, মূসা (আ)-এর কওমের মত বলব,

فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون -

"তুমি আর তোমার রব গিয়ে লড়াই কর; আমরা তো এখানে বসে থাকব" বরং আমরা তো হুযূর (সা) -এর সামনে ও পেছনে, ডানে ও বামে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকব। এসব বক্তৃতায় হুযূর আকরাম (সা)-এর চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে।[২]

বদর অভিমুখে যাত্রা এবং কাফির ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান

২য় হিজরীর ১২ই রমযান তারিখে মহানবী (সা) প্রায় তিন শ' জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীসহ শহর থেকে বের হন। এক মাইল পথ যাবার পর তিনি সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন। যাদের বয়স কম ছিল তাদেরকে তিনি ফেরত পাঠান। কেননা এমত বিপদ মুহূর্তে অল্প বয়স্ক তরুণ কোন কাজে আসবে না। উমায়র ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন অল্পবয়স্ক। তাঁকে ফেরত যেতে বলা হলে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে হুযূর আকরাম (সা) তাঁকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। উমায়র-এর ভাই হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এই কিশোর সৈনিকের গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৩১৩। এদের মধ্যে ৬০ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকী সব আনসার।[৩] বাহিনীতে কেবল দু'টোই ঘোড়া ছিল। একটিতে সওয়ার ছিলেন হযরত যুবায়র (রা) এবং অপরটির আরোহী ছিলেন হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। উটের সংখ্যা ছিল ৭০।

---

১. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬২৫ পৃ.; ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২৮৭-৮৮; সহীহ মুসলিম,কিতাবুল জিহাদ, বদর যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযী।
৩. বিস্তারিত দ্র. তাবাকাত ইব্ন সা'দ; উমায়র-এর ঘটনা উসদুল গাবায়ও বর্ণিত হয়েছে ।

একটি উটের ওপর দু'জন তিনজন করে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ও হযরত মারছাদ গানাবীর সঙ্গে পালাক্রমে একটি উটের ওপর সওয়ার হতেন।[১] মক্কা মুআজ্জমা থেকে কুরায়শরা বিরাট জাঁক-জমক ও আড়ম্বর সহকারে বেরিয়েছিল। সহস্র সৈন্যের এই বাহিনী দশটি প্লাটুনে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্লাটুনে ১০০ সৈন্য ছিল। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সকলেই এতে শরীক ছিল। আবূ লাহাব বিশেষ জরুরীর দরুন এতে শরীক হতে পারেনি। এজন্য সে তার পক্ষে ও পরিবর্তে অন্য লোক পাঠায়। রসদপত্রের ব্যবস্থা ছিল এরূপ যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যেমন আব্বাস, ওৎবা ইব্ন রবীআ, হিরছ ইব্ন আমের, নসর ইবনুল হারিছ, আবূ জেহেল, উমায়্যা প্রমুখ পালাক্রমে প্রতিদিন দশটি করে উট যবাই করত এবং লোকদের খাওয়াত। কুরায়শদের প্রধানতম ও সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা ওৎবা ইব্ন রবী'আ ছিল কুরায়শ বাহিনীর সিপাহসালার।[২]

কুরায়শরা বদরের কাছাকাছি পৌঁছে জানতে পারে যে, আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা বিপদ কাটিয়ে নিরাপদেই বেরিয়ে গেছে। এতে বনূ যুহরা ও বনূ আদীর নেতৃবৃন্দ বলল, এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবূ জেহেল তাদের এ কথা মানতে অস্বীকার করল। ফলে বনূ আদী ও বনূ যুহরার লোকেরা ফিরে গেল। অবশিষ্ট বাহিনী সামনে অগ্রসর হলো।[৩]

কুরায়শরা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল বিধায় সুবিধাজনক জায়গাগুলো প্রথমেই দখল করে নিয়েছিল। মুসলমানরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিল সেখানে পানির কুয়া কিংবা ঝর্না কিছুই ছিল না। এমন কি যমীনও এত বেশি বালিপূর্ণ ছিল যে, উটের পাগুলো বালিতে বসে যাচ্ছিল। সাহাবী হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) রসুলূল্লাহ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে আর য করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছাউনি ফেলার স্থান হিসাবে যে জায়গা আপনি নির্বাচন করছেন তা কি ওয়াহীর ভিত্তিতে, না কি সামরিক কৌশলগত দিক বিবেচনায় ? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওয়াহীর ভিত্তিতে নয়। হুবাব (রা) বললেন, তাহলে ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সামনে অগ্রসর হয়ে ঝর্নাগুলো দখল করা ভাল হবে এবং চারপাশের কুয়াগুলো অকেজো করে দেয়া যাক।

রসূলূল্লাহ (সা) তাঁর অভিমত পসন্দ করলেন এবং সেমত ব্যবস্থা নিলেন। এমন সময় আল্লাহ্র অপার সাহায্য ও গায়বী মদদ হিসেবে আকস্মিকভাবেই বৃষ্টি

১. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬১৩; যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ; মুসনাদ আহমদ ও হাকেম-এর মুস্তাদরাক গ্রন্থে বিশুদ্ধ বর্ণনায় মারছাদ গানাবীর স্থলে আবূ লুবাবার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

২. সীরাত ইব্নে হিশাম, বদর যুদ্ধের কাহিনী ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৩৬০পৃ.; মুসনাদ আহমদ, ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃ. কাফির বাহিনীর সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে।

৩. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড. ৪২৬ পৃ.; সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬১৯ পৃ.।

নেমে এল। ফলে বালি মাটি জমে চলাচলের উপযোগী হয়ে গেল এবং এখানে সেখানে পানি জমে ছোট ছোট জলাশয়ের রূপ নিল। এতে সাহাবায়ে কিরামের ওযূ-গোসলের আর কোন সমস্যা রইল না। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর সেই অনুগ্রহের কথাই তুলে ধরেছেন,

وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ـ

"আর তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করলেন যাতে তোমরা এর সাহায্যে পাক-পবিত্রতা হাসিল করতে পার।"

পানির উৎসগুলো যদিও তিনি দখল করলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি শত্রুদের এর থেকে মাহরূম করেন নি, বরং তিনি কুরায়শ কাফিরদেরকেও পানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।[১] সময়টা ছিল রাত্রিকাল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) খুব আরামেই রাতটা ঘুমিয়ে কাটালেন। কেবল রসূলে আরাবী (সা)-ই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনিই কেবল জেগে এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ ও মুনাজাতের ভেতর দিয়ে গোটা রাত অতিবাহিত করেন। ভোর হতেই ফজরের নামাযের জন্য আওয়াজ দেওয়া হলো। নামায অন্তে তিনি জিহাদের ওপর ওয়াজ করেন।[২]

যুদ্ধ প্রস্তুতি

কুরায়শরা যুদ্ধের জন্য ছিল অধীর। কিন্তু এরপরও আল্লাহর এমন কিছু নেকদিল বান্দাও ছিলেন যাঁরা এই রক্তাক্ত যুদ্ধ এড়াতে চাইছিলেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন হাকীম ইব্নে হিযাম (যিনি পরে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন)। তিনি কুরায়শ বাহিনীর অধিনায়ক ওৎবা ইব্নে রবী'আর কাছে গিয়ে বললেন, আপনি চাইলে আজকের দিনে সুনামের অধিকারী হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। ওৎবা বলল, তা কিভাবে ? হাকীম বললেন, কুরায়শদের দাবি মাফিক আপনি হাদরামীর রক্তপণ আদায় করে দিন। এর বেশী তো তাদের আর কোন দাবি নেই। আর সে আপনার হালীফ (মিত্র) । ওৎবা ছিল নেক দিল মানুষ । সে খুব সন্তুষ্ট চিত্তেই তার একথা মেনে নিল। কিন্তু যেহেতু আবূ জেহেলের সম্মতির প্রয়োজন ছিল সেজন্য হাকীম ওৎবার পক্ষে এ প্রস্তাব নিয়ে আবূ জেহেলের কাছে গেলেন । আবূ জেহেল এ সময় তূনীর থেকে তীর বের করে ছড়িয়ে রাখছিল। ওৎবার পয়গাম শুনতেই বলে উঠল,

---

১. সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬২০-২১; বায়হাকীর দালাইলুন নবুওত,৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃ; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ইমাম যাহাবী এ হাদীছকে মুনকির বলেছেন।

২. যাদুল মা'আদ; ৩য় খণ্ড, ১৭৯ পৃ.; বায়হাকীর দালাইলুন নবুওত, ৩য় খণ্ড, ১৩৯; নাসাঈর সুনানুল কুবরা, সালাত অধ্যায়।

'বুঝতে পাচ্ছি, ওৎবা সাহস হারিয়ে ফেলেছে!' ওৎবার পুত্র আবূ হুযায়ফা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই যুদ্ধে হুযূর আকরাম (সা) -এর সাথী ছিলেন। সে জন্যই আবূ জেহেল ওৎবার নিয়ত নিয়ে সন্দেহ করেছিল যে, ওৎবা যুদ্ধ এড়াতে চাইছে যাতে তার পুত্রের ওপর যুদ্ধের আঁচ না লাগে।

আবূ জেহেল উঠে গিয়ে হাদরামীর ভাই আমেরকে ডেকে আনল এবং বলল, দেখতে পাচ্ছ, তোমার ভাই য়ের রক্তপণ তোমারই চোখের সামনে এসে কিভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একথা শুনতেই আমের আরবদের প্রথা মাফিক তার পরিধেয় বস্ত্র ফেড়ে ফেলল এবং ধুলো উড়িয়ে واعمراه! واعمراه বলে চীৎকার জুড়ে দিল। ব্যস, অমনি কুরায়শ বাহিনীতে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ওৎবা আবূ জেহেলের ভর্ৎসনা বাক্য শুনতেই ক্ষেপে উঠল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, যুদ্ধের ময়দানই বলে দেবে কে কাপুরুষ ও ভীরু। এই বলে সে মিগফার চাইল। কিন্তু তার মাথা এত বড় ছিল যে, মিগফার (লৌহ শিরস্ত্রাণ) তার মাথায় ঠিকমত লাগছিল না। অতএব, বাধ্য হয়ে তাকে কাপড় বেঁধেই যুদ্ধে নামতে হয়।[১]

রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাতকে মানুষের রক্তে রক্তাক্ত করতে পসন্দ করতেন না বিধায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) ময়দানের এক পাশে একটি ঝুপড়ি স্থাপন করলেন যেখানে তিনি তশরীফ নেন। সা'দ ইব্নে মু'আয (রা) খোলা তরবারি হাতে পাহারায় দাঁড়িয়ে যান যাতে এ দিকে কেউ অগ্রসর হতে না পারে।[২]

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল। জাগতিক সকল উপাদানই সাহায্য করতে উন্মুখ ছিল। ফেরেশতাদের দল ছিল মুসলমানদের সহযোগী। এতদ্সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) জাগতিক ও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সমর নীতি মাফিক সেনা বিন্যস্ত করেন। মুহাজিরদের একটি ও আনসারদের দু'টি গোত্র আওস ও খাযরাজের দু'টি, মোট তিনটি কোম্পানী তৈরি করেন। মুহাজিরদের পতাকা মুস'আব ইব্ন উমায়রকে, খাযরাজ গোত্রের পতাকা হুবাব ইবনুল মুনযির এবং আওস গোত্রের পতাকা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন।

সকাল হতেই তিনি কাতার বন্দী শুরু করেন। হাতে ছিল তীর। এর সাহায্যে তিনি কাতার ঠিক করছিলেন যাতে কেউ কাতার থেকে এক তিলও আগে কিংবা পিছনে থাকতে না পারে। যুদ্ধে শোরগোল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সকলকেই নিষেধ করে দেওয়া হয় যাতে মুখ দিয়ে সামান্য শব্দও বের না হয়।[৩]

---

১. সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬২২-২৩; যাদুল মা'আদ,৩য় খণ্ড, ৭৭৯ পৃ.।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৭৭৯; সীরাত ইব্নে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬২০পৃ.।
৩. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড , ৩২০ পৃ.।

যে সময় বিশাল শত্রুবাহিনী সম্মুখীন সেই মুহূর্তে মুসলিম ফৌজে একজন সদস্যের বৃদ্ধিও বিরাট আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সর্বদাই অটল ছিলেন। আবূ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আবূ হাস্‌ল (রা) নামক দু'জন সাহাবী মক্কা থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে কাফিররা তাঁদের বাধা প্রদান করে এই বলে যে, তোমরা নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যে যাচ্ছ। তাঁরা অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধে যোগ দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। ছাড়া পেয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র খেদমতে এসে সকল কিছু বিবৃত করার পর তিনি তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের কেবল খোদায়ী মদদ প্রয়োজন।[১]

এখন দু'দল মুখোমুখী। মুখোমুখী হক ও বাতিল, আলো ও অন্ধকার, কুফর ও ইসলাম।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِى فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ -

"যে সব লোক পরস্পর লড়ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে। এক দল আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়ছিল আর অপর দল ছিল কাফির, মুনকিরীনে খোদা।"

এ ছিল এক আশ্চর্য দৃশ্য। এত বড় বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীতে তৌহীদের কিসমত ছিল কেবল কয়েকটি জীবনের ওপর নির্ভরশীল। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হুযূর আকরাম (সা) তখন খুবই কান্না-ভারাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। দু'হাত তুলে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করছিলেন আর বলছিলেন ঃ রব্বুল 'আলামীন! তুমি আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছ আজ তা পূরণ কর। আত্মবিশ্বাস ও আত্মহারা অবস্থায় তাঁর চাদর কাঁধ থেকে বার বার গড়িয়ে পড়ছিল। কখনো বা তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ছিলেন আর বলছিলেন ঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة لاتعبد -

"হে আল্লাহ! আজ যদি এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কেয়ামত অবধি তোমার আর ইবাদত হবে না।"

এই অস্থির ও আত্মহারা অবস্থা দৃষ্টে আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাদের কান্না ভারাক্রান্ত অবস্থা দেখা দেয়। হযরত আবূ বকর (রা) আরয করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন"।[২] অবশেষে আত্মিক প্রশান্তি সহকারে

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, باب الوفاء بالعهد
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার باب الامداد بالملئكة فى غزوة بدر

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ 'সত্বর বাহিনী পরাজিত হবে এবং পলায়ন করবে" পড়ে তিনি বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন।[১]

কুরায়শ বাহিনী তখন একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে, তথাপি তিনি মুসলমানদের অগ্রসর হতে বাধা দিয়ে বললেন, দুশমন আরও কাছে এলে তীর নিক্ষেপ করে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেবে।

এরপর তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার ফযীলত এবং এর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে বিজয়, সাফল্য ও পারলৌকিক পুরস্কারের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, যে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব ও অবধারিত করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে উমায়র ইবনুল হাম্মাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন জান্নাত যার প্রশস্ততা হবে আসমান-যমীন বরাবর ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। তখন উমায়র (রা) বললেন, ওহ! এই কথা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি একথা বলছ কেন ? উমায়র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই আগ্রহে বলছি যে, আমার ভাগ্যে যেন তা নসীব হয়। রসূল (সা) বললেন, তোমার ভাগ্যে নসীব হবে। এর পর তিনি (উমায়র) ঢাল থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। তারপর বলতে লাগলেন, আমি যদি খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে খুব বেশি লম্বা সময় লেগে যাবে। এই বলে খেজুরগুলো দূরে ফেলে দিলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।[২]

এই যুদ্ধ আত্মোৎসর্গ ও জীবন বাজির সর্বাধিক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল। উভয় দল মুখোমুখি হলে দেখা গেল স্বয়ং তাদের হৃদয়ের টুকরো সন্তানরাই তলোয়ারের সামনে। হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র (যে তখন পর্যন্ত কাফির ছিল) যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে তিনি তলোয়ার হাতে বের হন।[৩] ওৎবা ময়দানে অবতরণ করলে পুত্র হযরত হুযায়ফা (রা) (কুরায়শ বাহিনীর অধিনায়ক ওৎবার পুত্র) তার মুকাবিলায় বেরিয়ে এলেন। হযরত ওমর (রা)-এর তলোয়ার এ যুদ্ধে আপন মামার রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল।[৪]

যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এভাবে ঃ সর্বপ্রথম আমের হাদরামী ভাই-এর রক্তের দাবিদার হিসেবে সামনে অগ্রসর হয়। হযরত ওমর (রা)-এর গোলাম হযরত

১.সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ;
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত।
৩. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৩৮; সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃ.।
৪. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃ.।

মিহজা' তার মুকাবিলায় অগ্রসর হলে সে মারা যায়।[১] সেনাপতি ওৎবা আবূ জেহেলের ভর্ৎসনায় খুবই ক্ষুব্ধ ছিল, উত্তেজিত ছিল। তাই সর্বপ্রথম সেই আপন ভাই ও পুত্রসহ যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বি আহ্বান করে। আরবে নিয়ম ছিল, খ্যাতিমান ব্যক্তিরা কোন বিশেষ চিহ্ন বহন করে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করত। ওৎবার বুকের ওপর উটপাখির পালক ছিল। আওফ, মু'আয ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহা নামক তিন যুবক মুকাবিলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন। ওৎবা তাঁদের নাম ও বংশ পরিচয় জানতে চাইল। যখন সে জানতে পারল তারা আনসার তখন ওৎবা তাঁদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অস্বীকার করল এবং বলল, তোমাদের দরকার নেই। এরপর মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করে বলল, মুহাম্মদ! এরা আমাদের সমপর্যায়ের নয়। মুকাবিলায় আমাদের (কুরায়শদের) মধ্য থেকে কাউকে পাঠাও। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ মাফিক আনসার যুবকত্রয় ময়দান থেকে সরে আসলেন এবং হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত উবায়দা (রা) সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ তিনজনের চেহারাই কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল বিধায় তাঁদেরকে চেনা যাচ্ছিল না। ফলে ওৎবা তাঁদের নাম ও বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করল। তাঁরা তাঁদের নাম ও বংশ পরিচয় প্রদান করলে ওৎবা বলল, হ্যাঁ তোমরা আমাদের সমকক্ষ বটে।

অতপঃর ওৎবা হযরত হামযা (রা)-র সঙ্গে এবং ওৎবা পুত্র ওয়ালীদ হযরত আলী (রা)-র সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং দু'জনেই মারা পড়ে। কিন্তু ওৎবার ভ্রাতা শায়বার হাতে হযরত উবায়দা (রা) আহত হন। এসময় হযরত আলী দ্রুত অগ্রসর হয়ে শায়বার ওপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং তাকে হত্যা করেন। অতঃপর হযরত উবায়দা (রা)কে কাঁধে তুলে রসূলুল্লাহ (সা)-র খেদমতে নিয়ে আসেন। হযরত উবায়দা (রা) আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি শাহাদত লাভের সৌভাগ্য থেকে মাহরূম রইলাম? তিনি বললেন, না তুমি শাহাদত লাভ করেছ। এ কথা শুনে হযরত উবায়দা (রা) বলে ওঠেন, আজ যদি আবূ তালিব বেঁচে থাকত তাহলে সে স্বীকার করত যে, তার এ কবিতার হকদার আমি।[২] এরপর তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ونسلمه حتى نصرع حواله ـ ونذهل عن ابنا ئنا والحلائل ـ

---

১. প্রাগুক্ত।

২. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল জিহাদ; মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ.; যুরকানী তাঁর মাওয়াহিব গ্রন্থে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়ায়ে বদর শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন যে, هذان خصمان اختصموا فى ربهم এ সম্পর্কেই নাযিল হয়।

"আমরা মুহাম্মদ (সা) কে তখন শত্রুর হাতে সোপর্দ করব যখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে মারা যাব। আর আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য আমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে ভুলে যাই।"

এরপর সাঈদ ইবনু'ল আসের পুত্র উবায়দা আপাদমস্তক লৌহ বর্মে সজ্জিত হয়ে কাতার থেকে বেরিয়ে এল এবং চীৎকার করে বলে উঠল, আমি আবূ কুরশ (আছে কেউ তোমাদের মধ্যে যে আমার মুকাবিলা করবে?)। মুসলিম ফৌজ থেকে হযরত যুবায়র (রা) বেরিয়ে এলেন। যেহেতু তার কেবল চোখ দু'টোই দেখা যাচ্ছিল, তাই তিনি তার চোখ লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। বর্শার আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। বর্শা এভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, পরে হযরত যুবায়র (রা) কে তার লাশের ওপর পা রেখে বহু কষ্টে তা টেনে বের করতে হয়েছিল এবং বের করতে গিয়ে এর দুই প্রান্তই ভোতা হয়ে গিয়েছিল। হযরত রসূল আকরাম (সা) এই বর্শাটি স্মৃতি হিসাবে হযরত যুবায়র থেকে চেয়ে নেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেটি খোলাফায়ে রাশেদার চারজন খলীফার কাছেই হস্তান্তরিত হতে থাকে।[১] অতঃপর তা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর হাতে আসে। হযরত যুবায়র (রা) এই যুদ্ধে কয়েকটি মারাত্মক আঘাত পান। কাঁধের যখমটি এত গভীর ছিল যে, ভাল হয়ে যাবার পরও এর মধ্যে আঙুল ঢুকে যেত। পুত্র ওরওয়া ইবন যুবায়র (রা) শৈশবে আহত এই স্থানটি নিয়ে খেলা করতেন। তিনি যেই তলোয়ার নিয়ে সেদিন লড়াই করেছিলেন লড়াই করতে করতে তা পড়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন শাহাদত বরণ করেন তখন আবদুল মালিক ওরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) কে বলেন, তুমি কি যুবায়র (রা)-এর তলোয়ার চিনতে পারবে? তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, চিনতে পারব। আবদুল মালিক বললেন, কিভাবে? বললেন, বদর যুদ্ধে এর মুখের ধার পড়ে গিয়েছিল। আবদুল মালিক তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং এই পংক্তিটি আবৃত্তি করলেন ঃ بهن فلول من قراع الكتائب।[২] এরপর আবদুল মালিক তলোয়ারটি ওরওয়াকে দিয়ে দেন। বিক্রয়ের জন্য এর মূল্য উঠেছিল তিন হাজার দিরহাম। এর হাতলে ছিল রৌপ্যের কারুকাজ।[৩] এরপর ব্যাপক ও সাধারণ আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। কাফির মুশরিকরা লড়ছিল তাদের নিজস্ব দৈহিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ওদিকে সরওয়ারে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল আল্লাহ্র সাহায্যের ওপর ভরসা করেছিলেন এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছিলেন।[৪]

---

১. সহীহুল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, بعد شهود الملائكة بدر। অধ্যায়।

২. এটা নাবিগা যুবয়ানীর কবিতার একটি পংক্তি যার প্রথম লাইনটি হল ঃ ولا عيب فيهم غيران سيوفهم

৩. বুখারীর কিতাবুল মাগাযী, আবূ জেহেল হত্যার অধ্যায়।

৪. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড, ৩২৪ পৃ.।

বিখ্যাত কুরায়শ কাফির সর্দারদের হত্যা

আবূ জেহেলের শয়তানী ও ইসলাম দুশমনী মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিল। সেজন্য আনসারদের মধ্যে মু'আয ও মু'আওওয়ায নামক দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই হতভাগাকে যেখানেই দেখা যাবে সেখানেই তাকে শেষ করে দেওয়া হবে অথবা তাকে শেষ করতে গিয়ে নিজেরা শেষ হয়ে যাবে। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলেন, আমি সেনা কাতারের মাঝেই অবস্থান করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করেই আমার ডানে বামে দুই নওজোয়ানকে দেখতে পেলাম। তাদের একজন আমার কানের কাছে এসে বলল, চাচা, আবূ জেহেল কে বলতে পারেন? আমি বললাম, ভাতিজা! আবু জেহেল সম্পর্কে জেনে কি করবে? সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি, আবূ জেহেলকে যেখানেই দেখতে পাব হয় তাকে আমি হত্যা করব অথবা তাকে হত্যা করতে গিয়ে আমি মারা যাব। আমি তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেও পারিনি এমন সময় দ্বিতীয় যুবকও প্রথমোক্ত যুবকের ন্যায় আমার কানের কাছে এসে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করল। আমি তক্ষুণি তাদেরকে ইশারায় আবূ জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। আমি দেখাতেই তারা বাজপাখির মত গিয়ে তার ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ভূমিশয্যা গ্রহণে তাকে বাধ্য করল। এই দুই যুবক ছিল আফরার পুত্র মু'আয ও মু'আওওয়ায।[১] এ সময় আবূ জেহেল পুত্র ইকরামা পিতার এহেন অবস্থাদৃষ্টে দ্রুত ছুটে এসে পেছন থেকে মু'আয -এর বাম বাহুর ওপর আঘাত হানে। ফলে তা কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। মু'আয এ রকম অবস্থাতেও হতোদ্যম না হয়ে ইকরামার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু ইকরামা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। মু'আয এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায়ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ঝুলন্ত হাতটি খুব সমস্যার সৃষ্টি করছিল। ফলে তিনি পায়ের নিচে চেপে ধরে এক ঝটকায় হাতটিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এবার লড়তে আর কোন সমস্যা রইল না।[২]

হুযূর আকরাম (সা) যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বলেছিলেন, কাফিরদের মধ্যে যে সমস্ত লোক যুদ্ধে এসেছে তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে নয়, বরং কুরায়শ নেতাদের চাপে পড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তিনি তাদের নামও বলে দিয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে আবুল বখতারীও ছিল। মিজযার আনসারীর দৃষ্টি তার ওপর পড়তেই তিনি তাকে বলেন, যেহেতু রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আবুল বখতারীর সাথে

১. বুখারীর কিতাবুল খুমুস; মুসলিম শরীফের কিতাবুল জিহাদ ওয়া'স-সিয়ার।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬৩৫ পৃ.; মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড ৪৪৪ পৃ. বিস্তারিত বর্ণনা এতে রয়েছে।

তার এক বন্ধুও ছিল। আবুল বখ্তারী তার দিকে ইশারা করে বলল,[১] একেও কি? মিজযার বললেন, না। একথা শুনে আবুল বখতারী বলল, আরব নারীদের এ তীব্র ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপবান শুন্‌বার জন্য আমি বাঁচতে চাই না যে, আবুল বখতারী নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য তার বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিল। এই বলে আবুল বখতারী এই ছন্দোবদ্ধ কবিতাটি পড়তে পড়তে মিজযারের ওপর আক্রমণোদ্যত হয় ও মারা পড়ে।

لن يترك ابن حرة زميله - حتى يموت اويرى سبيله -

"শরীফ ও ভদ্র সন্তানেরা আপন বন্ধুকে পরিত্যাগ করতে পারে না যতক্ষণ না সে মারা যায় কিংবা মরণ পথ দেখতে পায়।"

ওৎবা ও আবূ জেহেলের মৃত্যুতে কুরায়শদের পদস্খলন ঘটে এবং বাহিনীর মধ্যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

নবী করীম (সা)-এর নিকৃষ্টতম দুশমন উমায়্যা ইবন খালফও বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কোন এক সময় তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সে কখনো মদীনায় এলে তিনি তার জীবনের যামিন হবেন। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্‌র এই দুশমন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের খুব ভাল সুযোগ মিলেছিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন ও প্রতিশ্রুতি পূরণ যেহেতু ইসলামের রীতি, তাই হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) চাচ্ছিলেন সে তার হাত থেকে বেঁচে যাক। কাজেই তিনি তাকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর গমন করেন। এমন সময় হযরত বেলাল (রা) তাকে দেখে ফেলেন। ফলে তিনি আনসারদেরকে জানিয়ে দেন। জানতেই তাঁরা তার ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা উমায়্যার পুত্রকে সামনে ঠেলে দিলে আনসাররা তাকে হত্যা করে। কিন্তু তথাপি তাঁরা এতে তৃপ্ত হয়নি। তারা উমায়্যাকে লক্ষ করে অগ্রসর হন। তিনি এতদ্দৃষ্টে উমায়্যাকে মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্য বলেন। সে শুয়ে পড়লে তিনি তাকে বাঁচাতে তাঁর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। ফলে লোকে তাকে মারবার জন্য সুযোগ পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার ঠ্যাং ধরে তাঁর নিচ থেকে তাকে বের করে আনা হয় এবং হত্যা করা হয়। এ সময় হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-এর একটি পা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং যখমের চিহ্ন বহু কাল যাবত ছিল।[২] আবূ জেহেল, ওৎবা প্রমুখের নিহত হবার পর কুরায়শরা হাল ছেড়ে দেয় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলমানরা তাদের ধরে ধরে বন্দী করতে থাকে। হযরত আব্বাস, আকীল ('আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ভ্রাতা), নওফাল, আসওয়াদ ইব্‌ন আমের, আব্‌দ ইব্‌ন যাম'আ এবং অনেক বড় বড় সম্মানিত লোকও বন্দী হন।

---

১. উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল উকালা।

নবী করীম (সা) কাউকে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে খবর সংগ্রহ ও অবস্থা পরিদর্শনের নির্দেশ দান করেন। বিশেষ করে, আবূ জেহেলের পরিণতি কি হয়েছে তা জেনে আসতে বলেন। নির্দেশ মাফিক হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) গিয়ে দেখতে পান লাশের মাঝে আবূ জেহেল আহত হয়ে পড়ে আছে, জীবন সফরের শেষ প্রান্তে বসে ধুকছে। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল? সে বলল, হ্যাঁ, সেই লোক যাকে তার কওমের লোকেরা হত্যা করেছে। এতে গর্বের কি আছে? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এরপর তার মাথা কেটে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদপ্রান্তে এনে সোপর্দ করলেন।[১]

সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিজয়

যুদ্ধ শেষে জানা গেল, মুসলমানদের মধ্যে কেবল ১৪ জন শাহাদত লাভ করেছেন যার মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার।[২] অপর দিকে কুরায়শদের মূল শক্তি ভেঙে পড়ে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ, বীরত্বে ও শৌর্য-বীর্যে যারা ছিল খ্যাতিমান ও গোত্রের সিপাহসালার, এক এক করে সবাই মারা পড়ে। এদের মধ্যে ওৎবা, শায়বা, আবূ জেহেল, আবুল বখতারী, যম'আ ইবনুল আসওয়াদ, আস ইবনে হিশাম, উমায়্যা ইবন খালফ, মুনাব্বিহ ইবনুল হুজ্জাজ ছিল কুরায়শদের শীর্ষ স্থানীয় শিরোভূষণ। তাদের ৭০ জন নিহত হয় এবং সমসংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়।[৩] যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে উকবা ও নযর ইবন হারিছকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকীদেরকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। এদের মধ্যে হযরত আব্বাস, আকীল ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর জামাতা আবুল আস ছিলেন।[৪]

যুদ্ধে হুযূর আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, যেখানেই লাশ পড়ে থাকতে দেখা যেত তাকে সেখানেই দাফন করা হত। কিন্তু এবার লাশের সংখ্যা ছিল বেশী বিধায় পৃথকভাবে দাফন করা মুশকিল ছিল। বদর প্রান্তরে একটা বড় আকারের কুয়া ছিল। সবগুলো লাশ এতে নিক্ষেপ করা হয়।[৫] কিন্তু উমায়্যার লাশ ফুলে এমন বীভৎস আকার ধারণ করেছিল যে, তা দাফন উপযোগী ছিল না। ফলে যেখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই তা মাটি চাপা দেওয়া হয়।[৬]

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

যুদ্ধবন্দীদেরকে দু'জন চারজন করে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয় সেজন্য বিশেষভাবে

১. প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, আবূ জেহেলের হত্যা শীর্ষক অধ্যায়;
২. সীরাতে ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, ৪৬৩ পৃ.।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বদর যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৪. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮ পৃ.; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৯৭;
৫. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
৬. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃ.।

তাকীদ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাদের সঙ্গে এই আচরণ করেছিলেন, তাদেরকে খাইয়ে নিজেরা খেজুর চিবিয়ে রাত কাটাতেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আবূ আযীয বলে মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-এর একজন ভাই ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে যে সব আনসারী তাদের ঘরে বন্দী করে রেখেছিল তাঁরা যখন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় আমার জন্য খাবার নিয়ে আসতেন তখন আমার সামনে রুটি রেখে নিজেদের জন্য খেজুর তুলে নিতেন। আমার তখন খুব লজ্জা লাগত। আমি তাঁদের হাতে রুটি তুলে দিতাম। কিন্তু তাঁরা তা হাত দিয়ে স্পর্শও করতেন না এবং আমাকেই ফিরিয়ে দিতেন। তাঁরা এসব এজন্য করতেন, স্বয়ং রসূল আকরাম (সা) তাঁদেরকে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্য তাকীদ করেছিলেন।[১]

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সুহায়ল ইবন 'আমর নামক একজন ছিল অত্যন্ত অলংকার-সমৃদ্ধ বাগ্মিতার অধিকারী। সাধারণত সে সাধারণ সমাবেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। হযরত ওমর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয পেশ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার নিচের পাটির দু'টো দাত তুলে ফেলা হোক যাতে সে আর আমাদের বিরুদ্ধে ভাল করে বলতে না পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যদি তার কোন অঙ্গ বিকৃত করি তবে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্-এর প্রতিবিধান হিসাবে আমার অঙ্গও বিকৃত করে দেবেন[২] (অতএব আমি তা করতে পারি না)।

যুদ্ধবন্দীদের অনেকের কাছে কাপড় ছিল না। নবী করীম (সা) তাদেরকে কাপড় দেন। কিন্তু হযরত আব্বাস-এর শরীরিক ও দৈহিক উচ্চতা বেশী হওয়ায় কারুর জামাই তার শরীরের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই দৈহিক দিক দিয়ে হযরত আব্বাস-এর সম মাপের ছিল বিধায় সে তার জামাটি চেয়ে পাঠায় এবং হযরত আব্বাসকে তা প্রদান করে। বুখারী শরীফে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর মৃত্যুর কাফন হিসেবে নিজের জামা প্রদান ছিল উল্লিখিত ইহসানের বিনিময়।[৩]

যুদ্ধবন্দীদের থেকে চার হাজার দিরহাম করে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। কিন্তু অক্ষমতার দরুন যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি অর্থাৎ যাদের মুক্তিপণ আদায়ের সামর্থ ছিল না তাদের বিনাপণেই মুক্তি প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে মুক্তিপণ হিসেবে মদীনার দশ জন করে বালককে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বলা হয়।[৪] হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) এভাবেই সে সময় লেখাপড়া শিখেছিলেন।[৫]

---

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃ.; তাবাকাত ইবন সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃ.।
২. সীরাতুন-নবী, ১ম খণ্ড, ৩৩০; তারীখে তাবারীর বরাতে।
৩. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।
৪. মুসনাদ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, ১ম খণ্ড, ২৪৭।
৫. সীরাতুন-নবী, তাবাকাত ইব্ন সা'দ-এর বরাতে।

এ সময় আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে আবেদন করলেন যে, হযরত আব্বাস আমাদের ভাগ্নে। আমরা তাঁকে বিনা পণেই ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু নবী করীম (সা.) সাম্যর কারণে তাদের এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নি এবং বিনা পণে মুক্তি প্রদান সমীচিন মনে করেন নি। ফলে তাঁকে মুক্তি পণ আদায় করতে হয়।[১]

মুক্তিপণের সাধারণ হার ছিল বন্দী প্রতি চার হাজার দিরহাম। ধনীদের ক্ষেত্রে এই হার থেকে বেশী নেয়া হয়। হযরত আব্বাস ছিলেন ধনী মানুষ। ফলে তার থেকে বেশী অর্থ গ্রহণ করা হয়। তিনি নবী করীম (সা)-এর কাছে এজন্য অভিযোগ করেন। কিন্তু তিনি কি করে জানবেন ইসলাম যে সাম্য কায়েম করেছে সেখানে কাছের ও দূরের, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং বিশিষ্ট ও সাধারণের সর্বপ্রকার পার্থক্য রেখা মুছে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে একদিকে ছিল যিম্মাদারী আদায়ের ক্ষেত্রে এই সাম্য, অপর দিকে ভালবাসার দাবি ছিল এই যে, হযরত আব্বাসের আর্ত চীৎকার ও সকাতর আর্তনাদ শুনে রাত্রে তিনি ঘুমুতে পারেন নি। লোকেরা তার বাধন একটু ঢিলা করে দিলে তিনি স্বস্তি লাভ করেন।[২]

হযরত আবুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ

নবী করীম (সা)-এর জামাতা আবুল আস ছিলেন যুদ্ধবন্দীদের অন্যতম। তার কাছে মুক্তিপণ দেবার মত কোন অর্থ ছিল না। রসূল তনয়া হযরত যয়নব (আবুল আস-এর স্ত্রী, সে সময় মক্কায় ছিলেন) কে বলে পাঠান তার মুক্তিপণের টাকা পাঠিয়ে দিতে। হযরত যয়নব-এর বিবাহের সময় মা হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে একটি মূল্যবান হার দিয়েছিলেন, হযরত যয়নব সেই হারটিই গলা থেকে খুলে পাঠিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) হারটি দেখতেই বিগত দীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সেই মধুময় ও প্রীতিপূর্ণ দিনগুলি তাঁর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা রাযী থাকলে যয়নব (রা) কে তাঁর মায়ের স্মৃতি বিজড়িত এই হারটি ফিরিয়ে দিই। সকলেই অবনত মস্তকে নবী করীম (সা)-এর এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং হার ফেরত পাঠানো হয়।

আবুল আস মুক্তি পেয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন এবং হযরত যয়নব (রা) কে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কয়েক বছর পর তিনি বিপুল বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে মুসলিম বাহিনী তার সমস্ত মাল-মাত্তা সহ তাকে বন্দী করে। অতঃপর সে

১. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ শীর্ষক অধ্যায়।
২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২য় খণ্ড, ৩০০ পৃ.।

সব মাল সৈনিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। তিনি লুকিয়ে হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে আসেন। তিনি তাকে আশ্রয় দেন। রাসূল আকরাম (সা) বিষয়টি অবগত হয়ে মুসলমানদের বলেন, তোমরা ভাল মনে করলে আবুল আসের মাল-সামান ফেরত দাও। সকলেই তা মাথা পেতে নিয়ে যার কাছে যা ছিল এমনকি এক টুকরো সূতা পর্যন্ত এনে আবুল আসকে দিয়ে দিল। এই মহানুভবতার ফল হলো এই যে, আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন এবং অংশীদারদের তাদের সকল প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে অতঃপর ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন। এরপর তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে দিলেন, আমি এজন্য এখানে এসে তোমাদের হিসাব-কিতাব বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছি যাতে তোমরা একথা না বলতে পার যে, আবুল আস আমাদের টাকা-পয়সা মেরে দিয়েছে এবং পরিশোধ করতে হবে এই ভয়ে সে মুসলমান হয়ে গেছে।[১]

উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব-এর ইসলাম গ্রহণ

উমায়ের ইবন ওয়াহ্ব ছিল কুরায়শদের মধ্যে ইসলামের কট্টর দুশমন। একবার সে এবং সফওয়ান ইবন উমায়্যা হিজর নামক স্থানে বসে বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করছিল। এ সময় সফওয়ান বলল, আল্লাহ্র কসম! এখন আর বেঁচে থাকার স্বাদ নেই। একথা শুনে উমায়ের বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আমার যদি ঋণ না থাকত এবং ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব না থাকত তাহলে আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করে আসতাম। তাছাড়া আমার ছেলেও সেখানে বন্দী। সফওয়ান বলল, তুমি ঋণের বিষয় ও ছেলেমেয়েদের ব্যাপার নিয়ে ভেবো না। আমি তাদের দায়িত্ব নিচ্ছি। এরপর উমায়ের বাড়ি এল, তলোয়ারে বিষ মেশাল এবং মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

মদীনায় পৌঁছুতেই হযরত ওমর (রা)-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা) তাকে দেখতেই তার কলার চেপে ধরে হুযূর আকরাম (সা)-এর খেদমতে নিয়ে আসেন। তিনি তখন হযরত ওমর (রা) কে বলেন, ওমর (রা)! তাকে ছেড়ে দাও। আর উমায়ের! তুমি আমার কাছে আস। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি কি মনে করে এসেছ বল দেখি? সে উত্তরে জানাল, আমি বন্দী পুত্রকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে তলোয়ার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? উমায়ের বলল, এ তলোয়ার বদরের ময়দানে আমাদের কোন্ উপকারে এসেছে? এবার হুযূর (সা) বললেন, কেন নয়। আচ্ছা বলতো দেখি, তুমি আর সফওয়ান হিজ্র-এ বসে আমাকে হত্যার ব্যাপারে কি কোন চক্রান্ত কর নি? উমায়ের এ কথা শুনে তো একেবারে থ' মেরে গেল। সে তখন

১. সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৬৫৭; বায়হাক্বীর দালাইলুন নবূওয়া, ৩য় খণ্ড, ১৫৪-৫৭; তাবারীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৪৩-৪৪।

বে-এখতিয়ার বলে উঠল, মুহাম্মদ (সা)! নিশ্চিতই তুমি আল্লাহ্‌র নবী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর সফওয়ান ছাড়া এ ব্যাপার কেউ জানত না। অতঃপর কুরায়শরা যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হত্যার খবর শোনার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করেছিল তারা উমায়ের-এর মুসলমান হবার খবর শুনল।

এরপর নবী করীম (সা) সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে দীন শেখাও, কুরআন মুখস্থ করাও এবং তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও। উমায়ের নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন মক্কায় ফিরে যাবার। আমি সেখানে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেব। আমার মন চাচ্ছে, এখন থেকে আমি পুতুল পূজারীদেরকে সেভাবেই জ্বালাতন করব যেভাবে এতদিন মুসলমানদের জ্বালিয়ে এসেছি।

ওদিকে উমায়ের মদীনায় যাবার পর থেকেই সফওয়ানের অবস্থা ছিল এই যে, সে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে বলত, দেখো, কয়েক দিনের মধ্যেই এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যার ফলে তোমরা বদরের শোক ভুলে যাবে। কিন্তু যখন শুনতে পেল, উমায়ের মুসলমান হয়ে গেছে তখন সে এক কঠিন আঘাত পেল। অতঃপর সে কসম খেল, যতদিন জীবিত আছি উমায়ের-এর সাথে কথা বলব না, তার কোন উপকার করব না। অপর দিকে উমায়ের মক্কায় ফিরে এলেন এবং মক্কার অলি-গলিতে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অনেক লোক তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিল।[১]

হযরত ফাতেমা (রা)-র বিয়ে

হযরত ফাতেমা (রা) ছিলেন হুযূর আকরাম (সা)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। এ সময় তাঁর বয়স ১৮ বছর। বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর বিয়ের পয়গাম আসতে শুরু করেছে। হযরত আলী (রা)-র পয়গাম পেতেই তিনি হযরত ফাতেমা (রা)-র অভিপ্রায় জানতে চাইলেন। তিনি নিশ্চুপ রইলেন। মৌন থাকা সম্মতির লক্ষণ জ্ঞানে তিনি হযরত আলী (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, বিয়ের মোহর দেবার মত তোমার কাছে কি আছে? বললেন, কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বদর যুদ্ধে যেই লৌহ বর্মটি পেয়েছিলে সেই হুতায়তা নামক বর্মটি কোথায়? হযরত আলী (রা) বললেন, সেটি তো আমার কাছেই আছে। হুযূর আকরাম (সা) বললেন, ব্যাস! সেটাই যথেষ্ট।

পাঠক ধারণা করবেন যে, হয়তো অনেক দামী জিনিস হবে। কিন্তু যদি এ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে জানতে পারবেন, লৌহ বর্মটির মূল্য সোয়া শো দিরহামের বেশী ছিল না। লৌহ বর্মটি ছাড়া হযরত আলী (রা)-র সম্পদ বলতে যা

১. বায়হাকীর দালাইলুল-নুবুওয়া, ৩য় খণ্ড, ১৪৭-৪৯; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খণ্ড, ৬৬১ পৃ.।

ছিল তা হল ভেড়ার একটি চামড়া আর একটি পুরনো য়ামানী চাদর। হযরত আলী (রা) এগুলোই বিয়ের পর হযরত ফাতেমা (রা) কে সোপর্দ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) এ যাবত হুযূর আকরাম (সা)-এর পরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর কাছেই থাকতেন। বিয়ের পর স্বতন্ত্র আবাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত হারিছা ইব্ন নু'মান আনসারীর অনেকগুলো বাড়ি ছিল। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি তিনি ইতোমধ্যেই নবী করীম (সা) কে দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা) ওগুলোর মধ্যেই তাঁকে একটি বাড়ি দেবার জন্য বলেন। তিনি বললেন, আর কত? এরপর আর তাকে বলতে আমার লজ্জা লাগে। হারিছার কানে একথা যেতেই তিনি দৌড়ে আসেন এবং বলেন, হুযূর! আমি এবং আমার কাছে যা কিছু আছে তা সবই আপনার। আল্লাহ্‌র কসম! যে বাড়ি আপনি নেন আমি তাতে বেশি খুশী হই যেটা আমার কাছে থাকে তার চেয়ে। মোটের ওপর তিনি তার একটি বাড়ি খালি করে দিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) সে বাড়ি গিয়ে উঠলেন।

দো-জাহানের সর্দার তদীয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) কে যৌতুক হিসেবে যা দিয়েছিলেন তা ছিল দড়ির চারপায়ী, চামড়ার তোষক যার ভেতর তুলার পরিবর্তে খেজুর গাছের পাতা ছিল, একটি ছাগল, একটি পানির মশক, দু'টি যাতা এবং দু'টো মাটির কলস।

হযরত ফাতেমা (রা) নতুন ঘরে উঠতেই নবী করীম (সা) তাঁর কাছে গেলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলতেই তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। এরপর এক পাত্র পানি চাইলেন। অতঃপর পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সেই (ভেজা) হাত হযরত আলী (রা)-র বুক ও বাযূর ওপর ছিটিয়ে দিলেন। এরপর হযরত ফাতেমা (রা) কে ডাকলেন। তিনি লাজ-নম্র ভাবে এসে পিতার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর ওপরও অনুরূপভাবে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার খান্দানের সর্বোত্তম ব্যক্তির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছি।[১]

জাহিলী অহংবোধ ও বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ

আরবে কোন একজনের হত্যাই এক অব্যাহত লড়াই-এর সূচনার জন্য যথেষ্ট ছিল যা শত বছরেও শেষ হত না। উভয় পক্ষের যেই পরাজিত হোক না কেন, পরাজিত পক্ষ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকে এমন এক অপরিহার্য দায়িত্ব জ্ঞান করত যা পালন না করে সে স্বস্তি পেত না। কেননা এ ছাড়া তার অস্তিত্বই থাকত না। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের ৭০ জন নিহত হয় যাদের অধিকাংশই ছিল তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ফলে সমগ্র কুরায়শ এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছিল পাগল পারা।[২]

---

১. সুনান আবী দাউদ, কিতাবুন নিকাহ; বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়া, ৩য় খণ্ড, ১৬০ পৃ.।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৩৬৯।

কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা, যে কাফেলা বদর যুদ্ধকালে বিরাট মুনাফা অর্জন করে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, এর মূল পুঁজি অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মুনাফার অংশ আমানত তথা গচ্ছিত সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত ছিল।

বদর যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল তাদের জন্য শোক ও মাতম প্রকাশ থেকে ফুরসত মিলতেই এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের প্রতি কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কতিপয় কুরায়শ সর্দার, যাদের মধ্যে আবু জেহেল পুত্র ইকরামাও ছিল, নিহতদের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আবু সুফিয়ান এর কাছে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সা) আমাদের কওমকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়েছে। এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সময় সমুপস্থিত। আমরা চাই বাণিজ্যের মাধ্যমে আমরা যে মুনাফা কামিয়ে ছিলাম যা এখন পর্যন্ত জমা আছে তা এই কাজে ব্যয় করা হোক। এ এমন দরখাস্ত ছিল যা পেশ করবার পূর্বেই কবুল করা হয়েছিল। কিন্তু এবার কুরায়শরা মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছিল। তারা জানত, বদর যুদ্ধে তারা যে সমর-সম্ভার ও রসদ-পত্রসহ গিয়েছিল এবার তার চেয়ে কিছু বেশীই সমর-সম্ভার দরকার। আরবে উত্তেজনা ছড়াবার এবং লোকদের উত্তপ্ত করে তুলবার সবচে বড় হাতিয়ার ছিল কবিতা। কুরায়শদের মধ্যে যে দু'জন কবি তাদের কাব্য-প্রতিভায় বিখ্যাত ছিল তাদের একজন ছিল আমর জুমাহী এবং অপর জন ছিল মুসাফি। আমর বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু রসূল আকরাম (সা) দয়া পরবশ হয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কুরায়শদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সে এবং মুসাফি' মক্কা থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন কুরায়শ গোত্রে গিয়ে আগুন উদগীরণকারী ও জ্বালাময়ী ভাষণের সাহায্যে তাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তা প্রদর্শন ও রণোম্মাদনা সৃষ্টি একটি বড় মাধ্যম ছিল অন্তপুরের মহিলাদের যুদ্ধে যোগদান। যে যুদ্ধে মহিলারা যোগ দিত সে যুদ্ধে আরব সৈনিকরা জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করত এই আশংকায় যে, পরাজিত হলে তাদের মহিলারা হবে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা। যোগদানকারী অনেক মহিলা এমনও ছিল যাদের সন্তান-সন্ততি বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। সেজন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের আকাংক্ষায় ছিল পাগলপারা। তারা মানত করেছিল, তাদের সন্তানদেরকে যারা হত্যা করেছে তাদের রক্ত পান করেই তারা দম নেবে। মোট কথা, সেনাবাহিনী গঠিত হলে বড় বড় অভিজাত ঘরের মহিলারাও তাতে যোগ দিল।[১]

হযরত হামযা (রা) হিন্দের পিতা ওৎবাকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। জুবায়র ইব্ন মুত'ইম-এর চাচাও হযরত হামযা (রা)-এর হাতেই মারা পড়ে।

১. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৫৮-৫৯; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬০-৬১।

এজন্য হিন্দ জুবায়র-এর গোলাম ওয়াহশীকে, যে বর্শা নিক্ষেপে খুবই অব্যর্থ ছিল, হযরত হামযা (রা) কে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বিনিময়ে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে।[১]

রসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) যদিও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সার্বিক অবস্থা লিখে একজন দ্রুতগামী কাসেদের হাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠান এবং কাসেদকে তাকীদ দেন যাতে তিন দিন-রাত্রির মধ্যেই সে মদীনায় পৌঁছে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেতেই ৩য় হিজরীর পাঁচই শাওয়াল তারিখে আনাস ও মু'নিস নামক দু'জন গুপ্তচরকে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠান। তারা এসে খবর দিল যে, কুরায়শ বাহিনী মদীনার কাছাকাছি এসে গেছে এবং মদীনার চারণভূমি (উরায়দ) তাদের অশ্ব সাফ করে দিয়েছে।[২]

তিনি হুবাব ইবন মুনযির (রা) কে কুরায়শদের সৈন্য সংখ্যা কত তা জেনে আসার জন্য পাঠান। তিনি সঠিক সংবাদ জেনে নবী করীম (সা) কে তা জানান। শহরে হামলা হবার আশংকা থাকায় মদীনার চতুর্দিকে পাহারা বসান হয়। হযরত সা'দ ইবন উবাদা এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সমগ্র রাত মসজিদে নববীর দরজায় পাহারায় নিযুক্ত থাকেন।[৩]

সকালে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। মুহাজিরগণ সাধারণভাবে এবং আনসারদের মধ্য থেকে প্রধান নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন, মহিলাদেরকে বাইরের দুর্গগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া যাক এবং শহরের ভেতর থেকে তাদের মুকাবিলা করা হোক। আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইব্ন সলূলকে এযাবত কখনো পরামর্শ বৈঠকে ডাকা হয় নি। সেও এ বৈঠকে উপস্থিত থেকে এ ধরনেরই রায় পেশ করে। কিন্তু উঠতি বয়সের নবীন সাহাবায়ে কিরাম (রা), যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারে নি, তাঁরা শহরের বাইরে গিয়ে মুকাবিলার জন্য জিদ ধরে ও পীড়াপীড়ি করতে থাকে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় ঘরে প্রবেশ করেন এবং লৌহ-বর্ম পরিধান করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। নবী করীম (সা)-এর প্রবেশ দৃষ্টে সাহাবায়ে কিরাম লজ্জিত হন এই ভেবে যে, আমরা আল্লাহ্র রসূল (সা)-কে তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে বাইরে বেরুতে বাধ্য করেছি। অতএব তাঁরা সকলেই বিনীত নিবেদন পেশ করেন, আমরা আমাদের রায় প্রত্যাহার করছি। তাঁদের এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) ইরশাদ করেন, নবীর পক্ষে একবার অস্ত্রসজ্জিত হবার পর তা খুলে ফেলা শোভন নয়।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হামযা ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা.)-এর শাহাদত অধ্যায়।
২. সীরাতে হালাবিয়্যা, ২য় খণ্ড, ৪৯০ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত।
৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, وامرهم شورى بينهم শীর্ষক অধ্যায়; মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, ৩৫১পৃ.; সুনান দারিমী, ২য় খণ্ড, ১২৯।

ওহুদের পাদদেশে

কুরায়শ বাহিনী বুধবার মদীনার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয় এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ছাউনি ফেলে। রাসূলে আকরাম (সা) জুমুআর দিন জুমু'আর সালাত আদায় অন্তে এক হাজার সাথীসহ শহর থেকে বহির্গত হন। এই এক হাজার সাথীর মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর তিনশ' সহচরও ছিল। পথিমধ্যে মুহাম্মদ তার কথা শোনেন নি, তার মতকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এই অজুহাত তুলে তার তিনশ' সঙ্গী নিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী ত্যাগ করে এবং মদীনায় ফিরে যায়। ফলে নবী করীম (সা) জীবন উৎসর্গকারী অবশিষ্ট সাতশ' সাহাবী নিয়েই সম্মুখে অগ্রসর হন।[১] এই সাতশ'র মধ্যে একশ'জন ছিলেন লৌহ বর্ম পরিহিত। মদীনার বাইরে বেরিয়ে তিনি সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণ করলেন। যারা অল্প বয়স্ক তরুণ বালক ছিলেন তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবন ছাবিত, বরা' ইবন আযিব, আবূ সাঈদ খুদরী, আবদুল্লাহ্ ইবন ওমর ও উরাবা ওয়াইসীও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে জীবন উৎসর্গের প্রেরণার অবস্থা এমন ছিল যে, এঁদেরই অন্যতম রাফে' ইবন খাদীজকে যখন বলা হল, তোমার বয়স কম, তুমি ফিরে যাও তখন সে আপন বৃদ্ধাঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যাতে তাঁকে লম্বা দেখা যায়। তাঁর এই কৌশল ফলপ্রসূ হয় এবং তাঁকে নেওয়া হয়। এ সময় সামুরা নামক আরেক কিশোর, যে ছিল তাঁরই সমবয়সী, বলল, আমি রাফে'কে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারি। সুতরাং সে যুদ্ধে যাবার অনুমতি পেলে আমারও সে অনুমতি পাওয়া উচিত। ফলে উভয়কে মল্ল যুদ্ধে নামতে বলা হল। সামুরা রাফে'কে হারিয়ে দেওয়ায় তাঁকেও যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়।[২]

মহানবী (সা) ওহুদ পর্বতকে পেছনে রেখে সাহাবীদেরকে কাতারবন্দী করেন। মুস'আব ইবন উমায়রকে তিনি যুদ্ধের পতাকা প্রদান করেন। যুবায়র ইবনুল-আওয়াম (রা) কে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। লৌহ বর্মহীন বাহিনীর সেনানায়ক নিযুক্ত হন হযরত হামযা (রা)।[৩] পর্বতের পেছনে দিকে থেকে শত্রু-বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা থাকায় সেখানকার গিরিপথে পঞ্চাশ জন তীরন্দায সৈন্যের এক প্লাটুন নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁদেরকে এই তাকীদ দেওয়া হয়, আমরা যুদ্ধে হারি অথবা জিতি কোন অবস্থাতেই তারা যেন গিরিপথ পরিত্যাগ না করে। আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র (রা) কে এই ক্ষুদ্র দলের সেনানায়ক নিযুক্ত করা হয়।[৪]

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ১৯৪পৃ. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬৪ পৃ.।
২. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬১; সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬৬ পৃ.।
৩. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬১-৬২।
৪. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

বদর যুদ্ধে কুরায়শদের বেশ ভাল রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং তারা আচ্ছা রকম শিক্ষা পেয়েছিল। সেজন্য তারা বেশ ভেবে-চিন্তে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করেছিল। ডান বাহুতে খালিদ ইবন ওয়ালীদ, বাম বাহুর দায়িত্বে ইকরামা ইবন আবূ জেহেলকে প্রদান করা হয়। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব পায় সফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, যে ছিল কুরায়শদের বিখ্যাত সর্দার। তীরন্দাযদের কোম্পানী ছিল পৃথক। এর অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবন রবী'আ। তালহা ছিল পতাকাবাহী। দু'শ' ঘোড়ার তিল ছিল রিকাবীতে যাতে প্রয়োজন মুহূর্তে কাজে লাগে।[১]

কুরায়শ মহিলারা সর্বপ্রথম রণ দামামা বাজায়। তারা দক্ষ হাতে রণ সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হয় যেই রণসঙ্গীতে বদর যুদ্ধের নিহতদের জন্য শোক ও মাতম এবং তাদের খুনের বদলা গ্রহণে সৈন্যদের উত্তেজিত করা হয়েছিল। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ আগে আগে থেকে ছন্দোবদ্ধ রণ সঙ্গীত গাইছিল। তার সাথে ছিল আরও চৌদ্দজন কুরায়শ মহিলা। রণ সঙ্গীতের কয়েকটি লাইন ছিল এরূপ ঃ

نحن بنات طارق - نمشى على النمارق

ان تقبلوا نعانق - او تدبروا نفارق

"ঐ নীল আসমানের অগণিত নক্ষত্ররাজির কন্যা আমরা, মখমল সজ্জিত কার্পেটের ওপর চলতে আমরা সতত অভ্যস্ত।

"যদি তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তাহলে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব। আর যদি ভীরু-কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাদপসরণ কর তাহলে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।"[২]

যুদ্ধের সূচনা

অতঃপর এভাবে যুদ্ধের সূচনা হলো। প্রথমে আবূ আমের নামক মদীনা মুনাওয়ারার জনসাধারণের কাছে একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব দেড়শ' লোকসহ যুদ্ধের ময়দানে এসে হাজির হয়। ইসলাম আগমনের পূর্বে যুহদ তথা সংসারের প্রতি নিরাসক্তি ও পাক-পবিত্র জীবন যাপনের দরুন সমগ্র মদীনায় তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। তার ধারণা ছিল, আনসাররা যখন তাকে দেখবে তখন তারা আল্লাহ্র রসূল (সা) কে পরিত্যাগ করবে। সে ময়দানে নেমেই হাঁক ছেড়ে উচ্চ স্বরে বলতে লাগল, তোমরা কি আমাকে চেন? আমি আবূ আমের। আনসাররা

১. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬২-৬৩ পৃ.।

২. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩১ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২৭-২৮; হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক নামক গ্রন্থে কবিতাটির কথা বলেছেন। ইমাম যাহবী একে সহীহ বলেছেন, ৩য় খণ্ড, ২৫৬ পৃ.।

জওয়াবে বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে আমরা খুব ভাল করেই চিনি। আল্লাহ যেন তোমার অভিলাষ পূরণ না করেন।[১]

এরপর কুরায়শদের পতাকাবাহী ছিল তালহা। সে কাতার ভেদ করে সামনে এসে চীৎকার দিয়ে বলল, কী মুসলমানরা! তোমাদের মধ্যে কেউ আছ যে, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারে কিংবা আমার হাতে (শাহাদত লাভের মাধ্যমে) সরাসরি জান্নাতে পৌঁছুতে পার? এতদশ্রবণে হযরত আলী মুর্তাযা কাতার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমি আছি। এই বলে তিনি তাকে তলোয়ারের আঘাত হানলেন এবং এক আঘাতেই সে ভূপাতিত হল ও তার লাশ তড়পাতে তড়পাতে স্থির হয়ে গেল। তালহার পর তৎপুত্র উছমান, যার পেছনে মহিলারা রণসঙ্গীত গাইতে গাইতে আসছিল, পতাকা হাতে তুলে নিল এবং ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আক্রমণোদ্যত হলো ঃ

ان على اهل اللواء حقا ان تخضب الصعدة او تندقا

"বর্শাধারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বর্শা রক্তে রঞ্জিত করবে অথবা তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

উছমানের মুকাবিলায় হযরত হামযা (রা) এগিয়ে গেলেন এবং তার কাঁধে এমনভাবে তলোয়ারের আঘাত হানলেন যা তার কোমর অবধি পৌঁছে গেল। এবং সেই সাথে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, আমি তাঁর সন্তান যিনি হাজ্জীদের পানি পান করিয়ে থাকেন। এরপর আম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।[২]

হযরত হামযা, হযরত আলী, হযরত আবূ দুজানা প্রমুখ শত্রু ব্যূহে প্রবেশ করেন এবং কাতারের পর কাতার নির্মুল করতে করতে এগিয়ে চলেন।[৩] আবূ দুজানা (রা) ছিলেন আরবের বিখ্যাত পাহলোয়ান। হুযূর আকরাম (সা) তাঁর মুবারক হাতে একটি তলোয়ার তুলে ধরে বলেন, "কে এর হক আদায় করবে?" এই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভের জন্য অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে একযোগে তাঁদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য ও গৌরব লাভ হযরত আবূ দুজানার ভাগ্যেই ছিল। এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও গৌরব লাভ তাঁকে গর্বিত করে তোলে। তিনি মাথায় লাল রূমাল বাঁধলেন এবং দৃপ্ত পদচারণা ও গর্বিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে বাহিনী থেকে বেরুলেন। হুযূর আকরাম (সা) আবূ দুজানার এই গর্বিত অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টে বলেন, তার এই আচরণ আল্লাহ্‌র অত্যন্ত অপছন্দ, কিন্তু এই মুহূর্তে তা পছন্দের। অতঃপর আবূ দুজানা (রা) ফৌজের সারি অতিক্রম করতে থাকেন এবং লাশের পর লাশ

১. মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬ পৃ.; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ১০৭-৮; তাবারীর তারীখ, ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃ.।
২. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃ.; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃ.।
৩. তাবারীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৬৪ পৃ.।

ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হন। এরই একটি পর্যায়ে তাঁর সামনে হিন্দ এসে যায়। তিনি তার মাথার ওপর তলোয়ার তোলার পরও তা এজন্য নামিয়ে নেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত তলোয়ার এর উপযোগী নয় যে, তার ধার একজন নারীর ওপর পরীক্ষা করা হবে।[১]

হযরত হামযা (রা) দু'হাতে তলোয়ার চালাচ্ছিলেন এবং যেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন কাতারের পর কাতার সাফ করে চলছিলেন। এমতাবস্থায় নিবা' গাবশানী সামনে এসে পড়ে। তিনি তাকে ডেকে বলেন, ওহে মহিলাদের খতনা কারির বাচ্চা! কোথায় যাচ্ছ? এই বলে তাকে আঘাত করতেই সে লাশে পরিণত হলো। ওয়াহশী নামক এক হাবশী গোলামকে তার মনিব জুবায়র ইব্ন মুতইম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, হামযা (রা) কে হত্যা করতে পারলে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। সে হামযা (রা) কে আঘাত করবার আশায় ওঁৎ পেতে বসেছিল। হযরত হামযা (রা) সামনাসামনি হতেই সে হারবা নামক একটি ক্ষুদ্রাকার বর্শা, যা হাবশীদের বিশেষ হাতিয়ার, সজোরে তাঁকে লক্ষ করে ছুড়ে মারে যা নাভিতে লেগে এফোঁড়-ওঁফোড় হয়ে যায়।[২] হযরত হামযা (রা) বর্শা নিক্ষেপকারীর দিকে অগ্রসর হয়ে তার ওপর হামলা করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি টলতে টলতে পড়ে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তিনি সায়্যিদুশ শুহাদার সৌভাগ্যপূর্ণ আসনে সমাসীন হলেন।[৩]

যুদ্ধের পাশা পাল্টে গেল

কাফিরদের পতাকাবাহী লড়াই করতে করতে মারা পড়ত, নিহত হতো, কিন্তু যুদ্ধের পতাকা ভুলুণ্ঠিত হতে দিত না। একজন ধরাশায়ী হতেই আরেক জন জানবায লড়াকু সিপাহী তা হাতে তুলে নিত। সওয়াব নামক একজন এই পতাকা হাতে নিতেই কোন একজন সামনে অগ্রসর হয়ে তার ওপর এমন জোরে তলোয়ারের আঘাত হানে, সে দু'হাতসহ কর্তিত বৃক্ষের ন্যায় ভূপাতিত হয়। কিন্তু সে জাতীয় পতাকাকে তার চোখের সামনে ভুলুণ্ঠিত দেখতে পারত না। পতাকা ভুলুণ্ঠিত হতেই বুকের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল এবং পতাকাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। এইরূপ অবস্থায় সে একথা বলতে বলতে মারা গেল যে, আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছি। অতঃপর অনেকক্ষণ পতাকা মাটিতে পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত একজন বীরাঙ্গনা মহিলা (উমরা বিনতে আলকামা) পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে বীরের ন্যায় অগ্রসর হয় এবং পতাকা হাতে নিয়ে

---

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২৫৬ পৃ; তাবারীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃ; সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩০-৩২ পৃ.।

২. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হামযা ইবন আবদিল-মুত্তালিব (রা)-এর শাহাদত অধ্যায়।

৩. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃ.।

উপরে তুলে ধরে। এতদ্দৃষ্টে চতুর্দিক থেকে কুরায়শরা তার চারপাশে এসে জড়ো হয় এবং উৎখাতপ্রায় কদম আবার দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।[১]

আবূ আমের কাফিরদের পক্ষে লড়ছিল। কিন্তু তার পুত্র হানযালা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হুযূর আকরাম (সা)-এর কাছে গিয়ে পিতার বিরুদ্ধে লড়বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু দয়াল নবী করুণার ছবি এটা পছন্দ করেন নি, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলবে। এরপর হানযালা (রা) কাফিরদের সেনাপতি আবূ সুফিয়ানের ওপর হামলা করলেন। তিনি তাঁর তলোয়ার দিয়ে আবূ সুফিয়ানের কম্ম সাবাড় করারই যোগাড় করেছিলেন প্রায়, এমন সময় অতর্কিতে এক পাশ থেকে এসে শাদ্দাদ ইবনুল আসওয়াদ ক্ষিপ্র গতিতে হযরত হানযালা (রা)-র আঘাত প্রতিরোধ করে এবং তাঁকে শহীদ করে দেয়। এতসব সত্ত্বেও যুদ্ধের পাল্লা ছিল মুসলমানদেরই অনুকূলে।[২] বীরাঙ্গনা মহিলারা রণ সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে সৈনিকদের অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত করছিল। শেষ পর্যন্ত তারা দিশেহারা ও দিকভ্রান্তের ন্যায় পেছন ফিরে পালাতে থাকে। ফলে বিপদের মেঘ কেটে যায়। কিন্তু সেই সাথে মুসলমানেরা গণীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লুটপাটে মেতে ওঠে। এ দৃশ্যে পেছনের গিরিপথে পাহারারত তীরন্দাযগণ গিরিপথ ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে এবং তারাও অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে লুটপাটে যোগ দেয়। সেনানায়ক আবদুল্লাহ্ জুবায়র (রা) তাদেরকে বাধা দিতে খুবই চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাদের ফেরাতে পারেন নি।[৩] তীরন্দাযদের স্থান ফাঁকা দেখে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ পেছন দিক থেকে এসে হামলা করেন। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) তাঁর কতিপয় জানবায মুজাহিদ নিয়ে দৃঢ়তার সাথে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন। অতঃপর সকলেই শহীদ হয়ে যান।

এক্ষণে রাস্তা ছিল একেবারে ফাঁকা। খালিদ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত নির্মম ও বেপরোয়া গতিতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসেন। সকলেই ছিলেন গণীমতের মাল লুণ্ঠনে ব্যস্ত। যখন পেছনে ফিরলেন দেখতে পেলেন কাফিরদের তীর ও তলোয়ার অজস্র ধারায় তাঁদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। দিশেহারা অবস্থায় সমগ্র ফৌজ একে অপরের মধ্যে এমনভাবে মিশে গেল, কে যে আপন আর কে যে পর, কে যে শত্রু আর কে যে মিত্র তা পার্থক্য করবার মত অবস্থা রইল না। ফলে মুসলমানের হাতে মুসলমান মারা পড়ল।[৪] মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর চেহারা ছিল অনেকটা হুযূর আকরাম (সা)-এর চেহারার ন্যায়।

১. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭৮ পৃ.
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২২৫ পৃ.; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃ.।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৪. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃ. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭৮ পৃ.;

তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। ইবন কামিয়্যা নামক এক দুরাত্মার হাতে তিনি শাহাদত লাভ করেন।[১] এরপর কাফির বাহিনীর এমন এক প্রবল তরঙ্গ এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর আছড়ে পড়ে। ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পদস্খলন ঘটে এবং দুশমন রসূলুল্লাহ্ (সা) অবধি পৌঁছে যায়। শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে মস্তকোপরির লৌহ শিরস্ত্রাণের দু'টো কড়া মাথায় ঢুকে যায় এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে তাঁর নিচের পাটির ডান দিককার দু'টি দাত শহীদ হয়ে যায়। ফলে তাঁর গোটা চেহারা রক্তাক্ত হয়ে যায়।[২] চতুর্দিক থেকে তীর ও তলোয়ার বর্ষিত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি গর্তে পড়ে যান। হযরত আলী (রা) হাত ধরেন এবং হযরত তালহা (রা) তাঁকে কোলে তুলে নেন।[৩]

এইরূপ অস্থির ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় খবর ছড়িয়ে পড়ে, রসূল আকরাম (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। ফলে অনেক সাহাবীই উৎসাহ ও সাহস হারিয়ে বসেন এবং যিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে পড়েন।[৪] হযরত আনাস ইব্‌ন নযর (রা) কয়েকজন মুসলমানকে দেখতে পান, তাঁরা হাতের অস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এবং বিষাদ ক্লিষ্ট অবস্থায় হাল ছেড়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বসে কি করছ? তাঁরা বললেন, হুযূর (সা)-তো শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আর বেঁচে থেকে কী করবে? ওঠো; যে জন্য ও যে পথে তিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তোমরাও সে পথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দাও। এরপর হযরত আনাস (রা) মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে আল্লাহ্! তাদের কৃতকর্মের দরুন আমি ওযরখাহি করছি এবং মুশরিকদের কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করছি। অতঃপর সামনে অগ্রসর হতে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর সঙ্গে দেখা। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সা'দ! ওহুদ পাহাড়ের ঐদিক থেকে আমি জান্নাতের খোশবূ এদিকে ভেসে আসতে পাচ্ছি। এই বলে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে হামলা শুরু করলেন এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, তাঁর শরীরে আশিটির ওপর আঘাতের চিহ্ন। ফলে তাঁর লাশ দেখে তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর বোন তাঁর আঙুলের ওপর একটি বিশেষ চিহ্ন দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন।[৫] একজন আনসারীর পাশ দিয়ে একজন মুহাজির যাবার সময় তিনি আনসারীকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি আনসারীকে বললেন, তুমি কি জান, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন? আনসারী জওয়াব দিলেন, যদি তিনি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তবে তিনি তাঁর

১. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃ. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃ.।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী باب ما اصاب النبى صـ من الجراح يوم احد;
৩. যাদু'ল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ১৯৭ পৃ.; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮০ পৃ.।
৪. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৮ পৃ.।
৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বদর যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। এবার তুমিও আপন দীনের জন্য তোমার জীবন বিলিয়ে দাও।[১]

প্রেম, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গের নমুনা এবং মুসলমানের পুনর্বার ব্যূহ রচনা

আত্মোৎসর্গকারী বিশিষ্ট সাথীরা অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করে চলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চোখ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুঁজে ফিরছিল। সর্বপ্রথম হযরত কা'ব ইব্ন-মালিক (রা)-এর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। চেহারা মুবারকের ওপর ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ (মিগফার)। কিন্তু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। কা'ব (রা) চিনতে পেরেই চীৎকার দিয়ে ওঠেন, মুসলমানেরা! তোমাদের রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে। আওয়াজ শুনতেই সাহাবারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এলেন।[২] কাফির মুশরিকরাও রসূলুল্লাহ (সা) বেঁচে আছেন জেনে চারিদিক থেকে সরে এসে তাদের সকল শক্তি এখানেই সমবেত করল। তারা দলে দলে এদিক লক্ষ্য করেই অগ্রসর হচ্ছিল। হযরত তালহা (রা) পূর্ণ শক্তিতে হামলা চালিয়ে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলেন। চতুর্দিক থেকে মুষলধারে তীর বৃষ্টি হচ্ছিল।[৩] হযরত আবূ দুজানা (রা) এই তীর বৃষ্টির মুখে নিজের পিঠকেই ঢাল হিসেবে পেতে দিলেন। কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তাঁর পিঠে এসে পড়ছিল আর তিনি স্থির ও নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে ছিলেন।[৪] একবার জোরে শোরে হামলা হলো। এ সময় আল্লাহ্র রসূল (সা) বললেন, কে আছ যে এই হামলা প্রতিহত করবে এবং জান্নাত লাভ করবে? সাতজন আনসার সাহাবী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন আর এঁরা একে একে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিলিয়ে চলছিলেন। এভাবে পর পর সাতজন আনসারীই আল্লাহ্র রসূল (সা) কে রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদত লাভ করেন।[৫]

হযরত তালহা (রা) তাঁর হাতকেই ঢাল হিসেবে পেতে দেন এবং রসূলুল্লাহ্ সা)-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত তীরগুলো প্রতিহত করতে থাকেন। ফলে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর হাতটি অবশেষে অবশ হয়ে যায়।[৬] হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের দল হমতে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল। আর তনি বলে চলেছিলেন, رب اغفر قومى فانهم لا يعلمون "হে আল্লাহ! ামার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না।"[৭] হযরত তালহা (রা) আঘাতে

সীরাত ইব্ন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৬১ পৃ.;
তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃ.; সীরাত ইবন কাছীর ৩য় খণ্ড ৬৮ পৃ.;
হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪১৭ পৃ.;
তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃ.।
সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়;

আঘাতে জর্জরিত হয়ে অবশেষে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ফিরে আসতেই তিনি তাঁদেরকে বললেন, আগে তালহার খোঁজ নাও। তার অবস্থা বড়ই নাযুক। সকলে মিলে তাঁকে উঠালে দেখা গেল তাঁর শরীরে দশের ওপর যখম। হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-এর শরীরে বিশটিরও ওপর যখম ছিল।[১] হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.) ছিলেন বিখ্যাত তীরন্দায। তিনি এ পরিমাণ তীর বর্ষণ করেছিলেন যে, দু'তিনটি ধনুক তাঁর হাতে ভেঙে যায়। তিনি ঢালের সাহায্যে আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক আড়াল করে রেখেছিলেন যাতে করে তাঁর ওপর কোন আঘাত না আসতে পারে। কখনো তিনি মাথা তুলে শত্রু বাহিনী দেখতে গেলে তিনি বলতেন, আপনি মেহেরবানী করে মাথা তুলবেন না। এমন না হয় যে, মাথা তুলতে গিয়ে কোন তীর লাগুক। আপনার সামনে আমি বুক পেতে রেখেছি।[২] হযরত সা'দ ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) ও ছিলেন মশহুর তীরন্দায এবং সে সময় তিনি তাঁর রেকাবেই হাযির ছিলেন। রসূল আকরাম (সা) আপন তূনীর তার সামনে ফেলে দিয়ে বলেন, তোমার ওপর আমার পিতামাতা কুরবান! তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।[৩] আরেক বার আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) বললেন, কে আমার জন্য জীবন দেবে? যিয়াদ ইবন সাকান (রা) পাঁচ জন আনসার নিয়ে এই খেদমতের জন্য অগ্রসর হলেন এবং জীবনের বাযী ধরে একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন। যিয়াদ (রা) এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, রসূল আকরাম (সা) তাঁর লাশ কাছে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। লোকেরা তাঁকে উঠিয়ে আনল। তখনও তাঁর জীবনের সামান্য স্পন্দন বাকী ছিল। তাঁকে তুলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কদম মুবারকের ওপর এনে রাখা হয় এবং সে অবস্থায় তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়।[৪]

سر بوقت دبح اپنا اس کے زیر پائے ہے

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

একজন বাহাদুর মুসলমান এমতাবস্থায়ও বেপরোয়াভাবে দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি মারা যাই তবে আমার জায়গা হবে কোথায়? তিনি বললেন, জান্নাতে। এই সুসংবাদ

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৩৪৮ পৃ.। সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, পুরুষদের সাথে মহিলাদের যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. বুখারী কিতাবুল মাগাযী।
৪. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৫-৬৬; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮১ পৃ.।

শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন। এভাবে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত লাভ করেন।[১] ঠিক সে সময় যখন কাফিররা ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল এবং নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে কতিপয় আত্মোৎসর্গকারী সাথী ব্যতিরেকে আর কেউ ছিলেন না, সে সময় উম্মু আমারা (রা.) মহানবী (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হন এবং নিজের বুক পেতে দেন। কাফিররা যখন অগ্রসর হতো তখন তিনি তীর ও তলোয়ারের সাহায্যে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইবনে কামিয়্যা যখন বজ্র ধ্বনি সহকারে প্রচণ্ড বেগে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলো তখন এই উম্মু আমারা (রা)-ই অগ্রসর হয়ে তাকে প্রতিহত করেন। ইবনে কামিয়্যা সে সময় উম্মু আমারা (রা)-কে আঘাত হানে। সেই আঘাত তাঁর কাঁধে গিয়ে লাগে এবং সেখানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। তিনি তার ওপর তলোয়ারের পাল্টা আঘাত হানেন, কিন্তু সেদিন দুরাত্মা দু'টো লৌহ বর্ম পরিধান করেছিল বিধায় সে আঘাত নিষ্ফল হয়।[২]

উবাই ইবন খাল্‌ফ আপাদমস্তক লৌহবর্মে সজ্জিত হয়ে হুযূর আকরাম (সা)-এর দিকে অগ্রসর হয়। সে অগ্রসর হচ্ছিল আর বলছিল, যদি মুহাম্মদ (সা) আজ বেঁচে যায় তাহলে আমার কল্যাণ নেই। সে মক্কায় কসম খেয়েছিল যে, সে মুহাম্মদকে হত্যা করবে। তাকে এক হাসুলী ঘেরা ও লৌহ শিরস্ত্রাণের মাঝে দেখা যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্শার সাহায্যে তাকে আঘাত করেন। ফলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে গিয়ে পড়ে। তার সাথীরা তাকে ধরে ওঠায়। সে তখন ষাড়ের মত চেঁচাচ্ছিল। লোকেরা তাকে বলল, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? ঘাবড়াবার কি আছে? এ তো একটা মামুলী আঘাতমাত্র। সে বলল, তোমরা জান না, মুহাম্মদ (সা.) আমাকে বলেছিল, সে আমাকে হত্যা করবে। আমার এ আঘাতে এত কষ্ট হচ্ছে যে, এর ব্যথা যদি যুল-মাজায বস্তির সকলের মধ্যেও বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে সকলেই মারা যাবে। অতঃপর উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ রাবিগ নামক স্থানে পৌঁছে মারা যায়।[৩]

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) চতুর্দিক থেকে এসে হুযূর আকরাম (সা)-এর চারপাশে সমবেত হলেন। লৌহ শিরস্ত্রাণের একটি কড়া তাঁর চেহারা মুবারকের একপাশে ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি তা বের করে ফেলতে চাচ্ছিলাম। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তখন আমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বললেন, আমাকে এ খেদমতের সুযোগ দিন। তিনি কড়াটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে এমনভাবে আস্তে আস্তে তুলে আনতে লাগলেন যাতে হুযূর (সা) আদৌ কোন কষ্ট

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড ৬৭ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮১-৮২ পৃ.।
৩. তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃ.; সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃ.; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃ.।

না পান। কড়া বেরিয়ে এল বটে, তবে আবূ উবায়দা (রা)-র একটি দাঁত উপড়ে গেল। দ্বিতীয় কড়াটি বের করার জন্য আমি আবার অগ্রসর হলাম। আবূ উবায়দা (রা) পুনরায় আমাকে কসম দিলেন এবং পূর্বের মতই দ্বিতীয় কড়াটি আস্তে আস্তে বের করতে শুরু করলেন। এতে তাঁর দ্বিতীয় দাঁতও উপড়ে গেল।[১] মালিক ইবন সানান আনসারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকের রক্ত মুখ দিয়ে চুষে নিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কুলি করে তা ফেলে দিতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কখ্খনো কুলি করব না। এই বলে তিনি যখন সেখান থেকে চললেন, তখন হুযূর (সা) বললেন, কারোর বেহেশ্তী মানুষ দেখার আগ্রহ থাকলে তাকে দেখে নাও।[২]

এ দিকে হুযূর আকরাম (সা) মারা গেছেন, এই খবর মদীনাতে পৌঁছুতেই মুখলিস মুসলমানরা পাগলের মত ওহুদের দিকে ছুটে চললেন। নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমাতুয-যাহরা (রা) এসে দেখতে পেলেন, তখনও চেহারা মুবারক থেকে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। হযরত আলী (রা.) ঢালে করে পানি নিয়ে এলেন আর সায়্যিদা ফাতেমা (রা) নিজ হাতে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই রক্ত প্রবাহ থামছিল না। শেষাবধি তিনি চাটাই পুড়িয়ে এর ছাই ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।[৩] অতঃপর তিনি একটি পাথর খণ্ডের ওপর আরোহণ করতে চাইলেন। কিন্তু রক্তপাতজনিত দুর্বলতার দরুন তিনি উঠতে পারলেন না। হযরত তালহা (রা.) বসে গেলেন এবং নিজেকে সিঁড়ি হিসেবে পেশ করলেন।[৪] ফলে তিনি এবার আরোহণ করতে সক্ষম হলেন। সালাতের ওয়াক্ত হলে তিনি বসে বসেই সালাতের ইমামতি করেন।[৫]

এই যুদ্ধে কোন কোন সাহাবা হুযূর আকরাম (সা)-এর খেদমতে (যে সময় তিনি আঘাতে জর্জরিত ও আহত) বিনীত নিবেদন পেশ করেন, তিনি যদি কাফির মুশরিকদের উদ্দেশে বদদোআ করতেন। নবী করীম (সা) একথা শুনতেই বলে ওঠেন ঃ

انى لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون -

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২৯ পৃ.; সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৮০।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৪. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২৮ পৃ.; কিতাবুল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার; ইমাম যাহাবী একে মুসলিম-এর শর্তের ওপর অভিহিত করেছেন।
৫. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ৭ম খণ্ড, ৮৬-৮৭।

"আমাকে অভিশাপ বর্ষণের জন্য নবী বানিয়ে পাঠানো হয় নি, বরং আমি দাঈ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, প্রেরিত হয়েছি আপাদমস্তক রহমত হিসেবে। হে আল্লাহ্! আমার কওমকে তুমি হেদায়াত দান করো; কেননা তারা জানে না।"[১]

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করলেন যাতে দুশমন এদিকে না আসতে পারে। আবূ সুফিয়ান দেখে ফেলেন। সসৈন্য পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) ও আরও কতিপয় সাহাবীর প্রবল পাথর বর্ষণের ফলে তারা আর অগ্রসর হতে পারে নি।[২] আবূ সুফিয়ান সম্মুখস্থ পর্বতোপরি আরোহণ করে চীৎকার করে বললেন, এখানে মুহাম্মদ (সা) আছে? তিনি জবাব দিতে নিষেধ করলেন। এরপর আবূ সুফিয়ান একইভাবে আবূ বকর ও ওমর (রা)-এর নাম ধরেও ডাকলেন। এবারও কেউ জওয়াব দিলেন না। জওয়াব না পেয়ে আবূ সুফিয়ান বলে উঠলেন, বোঝা গেল সকলেই মারা গেছে। তার এ কথায় হযরত ওমর (রা) আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, আরে আল্লাহ্র দুশমন! আল্লাহ্ আমাদের সবাইকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এরপর আবূ সুফিয়ান বললেন, اعل هبل "হোবলের জয় হোক!"

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, الله اعلى واجل "মহত্ত্বে ও মর্যাদায় আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।"

আবূ সুফিয়ান বললেন, لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উযযা (দেবতা) নেই।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, الله مولنا ولا مولى لكم "আল্লাহ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নেই।"

এরপর আবূ সুফিয়ান বললেন, আজিকার এ দিন বদরের দিনের জওয়াব। সৈন্যরা তোমাদের নিহত লোকদের নাক-কান কেটেছে। এজন্য আমি তাদের কোন হুকুম দেইনি। কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম তখন কিন্তু আমি সেজন্য কোন কষ্টও পাইনি এবং আমার কোন আফসোসও নেই।[৩]

কয়েকজন শহীদের অবস্থা

হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-কে দেখার জন্য পাঠালেন এবং আমাকে বললেন, যদি তুমি তাকে পাও তবে তাকে আমার সালাম দেবে এবং বলবে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে চেয়েছেন, তুমি এখন কি অবস্থায় আছ এবং কেমন অনুভব করছ? হযরত যায়দ

১. রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, কাযী ইয়াযকৃত আশ-শিফার বরাতে, ৪৭ পৃ.।
২. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৪৫ পৃ.।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

(রা) বলেন, আমি লাশ খুঁজে ফিরছিলাম। এমন সময় সা'দ ইবনুর রবী'র ওপর আমার নজর পড়ল। তাঁর প্রাণবায়ু নিভু নিভু প্রায়। তাঁর শরীরে তখন তীর-তলোয়ার ও বর্শার সত্তরের ওপর যখম। আমি বললাম, সা'দ! আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন তুমি এখন কি অবস্থায় আছ? তিনি উত্তরে বললেন, হুযূর (সা)-কে আমার সালাম দেবে এবং বলবে, আমি জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আমার কওম আনসারকে এ বার্তা বলবে, যতক্ষণ চোখের একটি পলকও বাকী আছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুশমন যদি নবী করীম (সা) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমরা কোন ওযর পেশ করতে পারবে না। একথা বলতেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।[১]

শহীদদের মধ্যে হযরত আমর ইবন ছাবিত (রা)-এর লাশও ছিল। তাঁর উপাধি ছিল উসায়রিম। কবীলা বনূ আবদুল আশহালের সঙ্গে তিনি ছিলেন সম্পর্কিত। ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে তিনি সব সময় ইসলামকে অস্বীকার করতেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তাঁর দিলে ইসলামের প্রতি আবেগ সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামসহ ওহুদে গিয়ে পৌঁছেছেন। তিনি এ সময় মুসলমান হন, তলোয়ার হাতে নেন এবং যুদ্ধে গিয়ে শরীক হন। তাঁর এ ব্যাপারটি কেউ জানত না। ময়দান পরিষ্কার হতেই বনূ আবদুল আশহালের লোকেরা তাদের গোত্রের শহীদদের লাশের সন্ধানে বের হয়। দেখতে পায় উসায়রিম আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। তখনও তাঁর শ্বাস চলছিল। তারা বলল, এতো উসায়রিম মনে হচ্ছে! সে এখানে কিভাবে এল? সে তো ইসলামকে অস্বীকার করত। এরপর তারা তাঁকেই জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কিভাবে এলে? জাতির টানে, নাকি ইসলামের প্রতি ভালবাসায়? তিনি বললেন, না, বরং ইসলামের প্রতি ভালবাসায় আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি হুযূর আকরাম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছি এবং এই সৌভাগ্যে উপনীত হয়েছি। এই বলতেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। লোকেরা তাঁর কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আলোচনা করতেই তিনি বললেন, সে জান্নাতী। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, উসায়রিম-এর এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সুযোগও হয়নি (ইসলাম গ্রহণের পর পরই শহীদ হয়ে যান)।[২]

শহীদদের কাতারে হযরত জাবির (রা)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরও ছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে হযরত মুবাশশির ইবন আবদুল মুন্‌যিরকে (যিনি বদর যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন) স্বপ্নে দেখতে পান যিনি তাঁকে বলছিলেন, তুমি কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের কাছে এসে যাবে। তিনি তাঁকে

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২২১; সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র মানাকিব সম্পর্কিত বর্ণনা।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃ.; মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৪২৮-২৯ পৃ.।

বললেন, তুমি কোথায় আছ? মুবাশশির বললেন, জান্নাতে। এখানে আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি। আবদুল্লাহ্ তাঁকে বললেন, তুমি কি বদরে শহীদ হও নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু এরপর আমাদের জীবিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, এটা তোমার শাহাদতের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।[১] হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার পিতার লাশ রসূল আকরাম (সা.)-এর খেদমতে আনা হলো। শত্রুরা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করেছিল। যখন তাঁর সামনে লাশ রাখা হলো তখন আমি তাঁর মুখ খুলতে গেলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ফেরেশতারা বরাবর তাঁর ওপর ছায়া করে আসছে।[২]

শহীদদের তালিকায় হযরত খায়ছামা (রা)-ও ছিলেন। তাঁর পুত্র বদর যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে আরয করলেন, বদর যুদ্ধে আমি যেতে পারি নি, পেছনে থেকে গিয়েছিলাম, অথচ আমার আগ্রহ ছিল বিরাট। লটারীতে আমার পুত্রের নাম ওঠে এবং শাহাদত লাভ তার ভাগ্যেই ছিল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাত্রে আমি আমার পুত্রকে স্বপ্নে দেখলাম সুন্দররূপে ও উত্তম আকৃতিতে। জান্নাতে ফলের বাগান ও নহরগুলোর মাঝে সে চলাফেরা করছে। সে আমাকে বলছে, আমার কাছে এসে যান, এক সাথে থাকব। আমার প্রভু আমার সঙ্গে যা কিছু ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্য পেয়েছি। আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে আমি তার সঙ্গে মিলিত হতে প্রবল আগ্রহী। আমার বয়সও হয়েছে। দুর্বলতা আমাকে ঘিরে ধরেছে। এখন আমি আমার প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী। আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন যেন তিনি জান্নাতে আমাকে তাঁর সাহচর্য দান করেন। তিনি দোআ করেন এবং ওহুদে শাহাদত লাভ করেন।[৩]

ঐসব শহীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন জাহ্শ (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তোমার কসম, কাল যেন এমন শত্রুর সম্মুখীন হই যে আমাকে হত্যা করবে, আমার পেট ফাড়বে, নাক-কান কাটবে। এরপর তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে, এসব কি জন্য হলো? আমি তখন বলব, সবই তোমার জন্য, তোমার খাতিরে।[৪]

শহীদদের মধ্যে আমর ইবনু'ল-জামূহ (রা)-ও ছিলেন। তাঁর পা ছিল খোঁড়া। আর ছিল তাঁর চার পুত্র যাঁরা সব সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে জিহাদে শরীক থাকতেন। ওহুদ যুদ্ধের সূচনায় আমরও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাইলেন। ছেলেরা

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২২৫ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
৩. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২০৮ পৃ.।
৪. উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, ৯১; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২০৮ পৃ.।

বলল, আল্লাহ্ আপনাকে জিহাদে যোগদান করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনি ঘরেই থাকুন, আমরা যুদ্ধে যাই। তিনি রসূল আকরাম (সা)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ছেলেরা আমাকে জিহাদে যোগদান করতে বাধা দিচ্ছে। আমি তো আশা করি, আমি শহীদ হই এবং আমার এই ল্যাংড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটা-চলা করি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে জিহাদের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, তোমাদের ক্ষতি কি সে গেলে? যেতে দাও তাকে। সম্ভবত আল্লাহ তাঁকে শাহাদত দ্বারা সৌভাগ্যবান করবেন।[১]

ঐসব শহীদের কাতারে হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-ও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাঁর শরীরে দু'শ দিরহামের কম মূল্যের পোশাক দেখা যায় নি এবং যিনি (ইসলাম গ্রহণের পর) কেবল একটি কম্বল রেখে শাহাদত লাভ করেন। কম্বলটিও আবার এত ছোট ছিল যে, কাফন দেবার সময় যখন সেটা দিয়ে মাথা ঢাকা হচ্ছিল ওদিকে তখন পা আলগা হয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢাকতে গেলে মাথা আলগা হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে রসূল আকরাম (সা) বললেন, কম্বল দিয়ে মাথা ঢাক আর খোলা পা দু'টো ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও।[২]

এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রিয়তম চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-ও শহীদ হন। দুশমন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের অবমাননা করেছিল। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিল। এরপর তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে সে চিবিয়েছিল। কিন্তু খেতে না পেরে উগরে দিয়েছিল।[৩]

হযরত সফিয়্যা (রা) ছিলেন হযরত হামযা (রা)-র বোন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু। মুসলমানদের পরাজয়ের খবর পেয়ে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে ওহুদের দিকে ছুটে আসেন। তাঁকে আসতে দেখে নবী করীম (সা) তৎপুত্র যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে ডেকে বলে দেন, তোমার মাকে আসতে নিষেধ করে দাও এবং তিনি যেন (হযরত) হামযার লাশ না দেখতে পান। যুবায়র (রা) তাঁর মাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম পৌঁছে দেন। পয়গাম পেতেই তিনি বলে ওঠেন, আমার ভাইয়ের সঙ্গে যা কিছু হয়েছে তার সবই আমি শুনেছি। আল্লাহ্র রাস্তায় এ কোন বড় কুরবানী নয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাঁর ভাইয়ের লাশ দেখার অনুমতি দেন। তিনি লাশ দেখেন। রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রিয়তম ভাইয়ের শহীদী লাশ চোখের সামনে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি শান্ত কণ্ঠে

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২২৬ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯০পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯১ পৃ.।

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন' পড়লেন এবং ভাইয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করলেন।[১]

ইসলামের সেবায় মহিলাদের ভূমিকা ও অনন্য ত্যাগ

এই যুদ্ধে অনেক মুসলিম মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আনাস (রা.)-এর মা হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) আহতদের পানি পান করাতেন। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) ও উম্মু সুলায়ম (রা)-কে দেখতে পেলাম, তাঁরা কাপড় গুটিয়ে মশক ভর্তি করে পানি আনছেন এবং আহতদের পানি পান করাচ্ছেন। মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে আবার গিয়ে পানি ভরে আনছেন।[২] অপর বর্ণনায় হযরত উম্মু সুলায়ত (রা) ছিলেন সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর মা। তিনিও ঐ একই খেদমত আঞ্জাম দেন।[৩] ঠিক সেই মুহূর্তে যখন কাফিররা একযোগে ব্যাপক হামলা শুরু করে দিয়েছে এবং তিনি কয়েকজন জানবাযকে সাথে নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আনসারদের ভেতরকার একজন মহিলার বাপ, ভাই ও স্বামী সকলেই এ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন। একের পর এক এই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার সংবাদ যখন তাঁর কানে আসছিল তখন মহিলাটি কেবল একটি কথাই বারবার বলছিলেন, তোমরা আগে বল, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) কেমন আছেন? লোকেরা যখন তাঁকে জানাল, তিনি ভাল আছেন, তখন মহিলাটি আবার জানালেন, আমি আগে তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে চাই তিনি কেমন আছেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ও চেহারা মুবারকের ওপর নজর পড়তেই মহিলাটি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বলে ওঠেন ঃ كل مصيبة بعدك يارسول الله جلل "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বেঁচে থাকলে আর সকল বিপদ-আপদই তুচ্ছ।"[৪]

میں بھی باپ بھی شوہربھی برادر بھی فدا - اے شہ دین ترے

ہوتے ہوئےکیا چیزیں ہیں ہم

"আমি, আমার পিতা, স্বামী ও ভাই তোমার জন্য কুরবান! দীনের হে বাদশাহ! তোমার উপস্থিতিতে আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই।"

মুসলমানদের ৭০ জন্য শাহাদত লাভ করেন যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার। অপর দিকে মুসলমানদের দরিদ্র দশা ছিল এমন যে, তাদের কাছে এমত

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ২১৮ পৃ; তাবারীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড.৭২।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. প্রাগুক্ত. উম্মু সুলায়ত সম্পর্কিত আলোচনা।
৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃ.; সীরাত ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৯৩ পৃ.; তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃ.।

পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যা দিয়ে শহীদদের লাশগুলোর কাফনের ব্যবস্থা হতে পারে। শহীদদের লাশগুলোকে গোসলবিহীন রক্তমাখা কাপড়সহ দু'জন একত্রে একই কবরে দাফন করা হয়। যাঁদের কুরআনুল করীমের অধিক সংখ্যক সূরা কিংবা আয়াত মুখস্থ ছিল দাফনের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হতো। সে সময় পর্যন্ত জানাযার হুকুম অবতীর্ণ না হওয়ায় এসব শহীদের জানাযা আদায় করা হয়নি।[১] আট বছর পর ইনতিকালের এক দুই বছর আগে যখন নবী করীম (সা) ওহুদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এসব শহীদের কথা মনে পড়তেই তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। এ সময় তাঁদের লক্ষ্য করে তিনি এমন সব ব্যথাভরা কথা বলেন যেন কোন জীবিত লোক কোন মৃতের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এরপর তিনি খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, "ওহে মুসলমানেরা! তোমাদের নিয়ে আমি এ বিষয়ে ভীত নই যে, তোমরা আবার মুশরিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ভয় হয়, তোমরা দুনিয়াতে আবার মত্ত হয়ে না যাও, দুনিয়া তোমাদের ওপর না চেপে বসে।"[২]

হামরাউল আসাদ অভিযান

উভয় বাহিনী যে যার পথে ফিরে চলল। মুসলমানরা মদীনায় প্রত্যাগমন করল। তারা ছিল আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত। তথাপি তাদের আশংকা ছিল, না জানি আবূ সুফিয়ান মুসলমানদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত ভেবে পুনরায় মদীনার ওপর আক্রমণোদ্যত হয়। তিনি মুসলমানদেরকে কুরায়শ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আহ্বান জানালেন। আহ্বান মিলতেই ৭০ জনের একটি দল এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলো যাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন।[৩]

আবূ সুফিয়ান ওহুদ থেকে রওয়ানা হয়ে রওহা নামক স্থানে পৌঁছুতেই তাকে এই ধারণায় পেয়ে বসল, আমাদের মিশন তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! তারা যে এমনটি ভাবতে পারে কিংবা এ জাতীয় চিন্তা করে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে পারে এ রকম একটি ধারণা রসূল আকরাম (সা) করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় দিনেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, কেউ যেন আপন বাড়ি-ঘরে ফিরে না যায়। অতঃপর কুরায়শ বাহিনীর সন্ধানে তিনি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গমন করেন। খুযা'আ গোত্র তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা ছিল ইসলাম ও তার নবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। এই খুযাআ

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওহুদ যুদ্ধে যাঁরা শাহাদত লাভ করেছিলেন শীর্ষক অধ্যায়।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত, الذين استجابوا لله وللرسول শীর্ষক অধ্যায়।

গোত্রের সর্দার মা'বাদ খুযা'ঈ ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের খবর শুনে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলো। এরপর ফিরে গিয়ে আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে দেখা করল। আবূ সুফিয়ান তার কাছে মদীনা আক্রমণের অভিপ্রায় জাহির করল। মা'বাদ তখন বলল, আমি এইমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করে এলাম। মুহাম্মদ (সা) এবার অধিকতর প্রস্তুতি নিয়ে বিরাট আয়োজনসহ ধেয়ে আসছেন। এবার তাঁর মুকাবিলা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যা পেয়েছ সেটুকু নিয়ে ফিরে যাবার মধ্যেই মঙ্গল। মা'বাদের একথা শুনতেই আবূ সুফিয়ান ফিরে যাবার মধ্যেই কল্যাণ বিবেচনা করে মক্কার পথ ধরলেন।[১]

রসূলুল্লাহ (সা) আবূ সুফিয়ানের ফিরে যাবার খবর পেয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। মদীনা তখন শোকের সাগরে মুহ্যমান। ঘরে ঘরে তখন কান্নার রোল। সকলেই আপন আপন আত্মীয়-বান্ধবদের শাহাদতে কান্নাকাটি করছিল। সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-র ঘর তখন নিস্তব্ধ। সে ঘরে কান্নার মত কেউ ছিল না। প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসার আবেগে তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যবান মুবারক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে গেল ঃ اما حمزه فلا بواكى له হায় হামযা! তাঁর জন্য আজ কেউ কাঁদবার নেই!

আনসারদের কানে এ কথা যেতেই তাঁরা অস্থির হয়ে উঠলেন। সকলেই নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আপন স্ত্রীদের বললেন, তোমরা সবাই হামযা (রা)-র ঘরে গিয়ে শোক প্রকাশ কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেন ঘরের দরজায় পর্দানশীন মহিলাদের ভিড়। তাঁরা হামযা (রা)-র শাহাদতে শোক প্রকাশ করছে। তিনি তাঁদের জন্য দোআ করলেন এবং বললেন, সমবেদনা প্রকাশের জন্য আমি তোমাদের শোক্র গুযারী করছি। কিন্তু (মনে রেখো) কোন মৃতের জন্য বিলাপ করা জাইয নয়।

আযল ও কারা গোত্র এবং বীরে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনা ও হযরত খুবায়ব (রা)-এর পুরুষোচিত সাহসিকতা প্রদর্শন

ওহুদ যুদ্ধের পর শত্রুরা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন ও নির্মূল করার উদ্দেশে বিবিধ অপকৌশলের বাস্তবায়নে জোর প্রয়াস চালায়। অনন্তর হিজরী ৫ সনে কুরায়শরা বনূ আযল ও কারার সাতজনকে একত্রে মদীনায় নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পাঠায়। তারা গিয়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয পেশ করে, আমাদের কবিলা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মুআল্লিম দিন যারা আমাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর তালিম দেবে।[২] নবী করীম (সা)

১. মুস্তাদরাক হাকেম, ৩য় খণ্ড, ২১৫ পৃ.; ইমাম যাহবী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। সীরাত ইবন হিশাম, ২খ. ৯৯ পৃ.।

২. তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২য় খণ্ড, ৫০ পৃ.।

দশজন বুযর্গ সাহাবীকে হযরত আসিম ইবন ছাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে পাঠান। এই সব সাহাবী তাদের আওতায় গিয়ে পৌঁছুতেই তাদের দু'শ জন লোক তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এঁদেরকে তারা জীবিত গ্রেফতার করবে। তীরন্দাযরা তাঁদেরকে বলল, তোমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এস। আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। জবাবে হযরত আসেম (রা) বললেন, আমি কাফিরদের আশ্রয় গ্রহণ করি না। এই বলে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করেন, আল্লাহ্! তুমি তোমার নবীকে আমাদের খবর জানিয়ে দাও। মোটের ওপর সাতজন সহ তিনি লড়াই করে বিপক্ষীয় তীরন্দাযদের তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে যান।[১] কুরায়শরা কয়েকজন লোক পাঠাল যারা হযরত আসেম (রা)-এর শরীর থেকে এক টুকরো গোশত কেটে আনবে যাতে তাঁকে চেনা না যায়। আল্লাহ্ পাকের অপার কুদরত তাঁর শহীদ বান্দার লাশের অবমাননা বরদাশ্‌ত করেন নি। তিনি মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন যারা লাশের চতুর্দিকে ঘিরে পাহারায় বসল। ফলে কাফিররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।[২] কিন্তু তাঁর সাথীদের মধ্যে হযরত খুবায়ব ও হযরত যায়দ ইব্‌ন দাছনা (রা) কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসেন। কাফিররা তাঁদের বন্দী করে। সুফিয়ান হুযালী তাঁদের মক্কায় নিয়ে যায় এবং কুরায়শদের হাতে বিক্রি করে দেয়। কুরায়শরা তাঁদেরকে হারিছ ইবন আমের-এর ঘরে কয়েকদিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় বন্দী করে রাখে। একদিন হারিছের একটি বাচ্চা খেলতে খেলতে খুবায়ব (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছে। সে সময় তাঁর হাতে ছিল ক্ষুর। তিনি হারিছের বাচ্চাকে তাঁর রানের ওপর তুলে নেন। বাচ্চার মা তার বাচ্চাকে বন্দীর কোলে দেখতে পেয়ে, যে বন্দীকে তারা কয়েকদিন যাবত ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রেখেছে, যাঁর হাতে সে সময় ক্ষুর ছিল, তীব্র চীৎকার দিয়ে ওঠে। খুবায়ব (রা) তখন মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, তুমি ভেবেছ, আমি বাচ্চাটিকে হত্যা করব! তুমি কি জান না একজন মুসলমান কখনো গাদ্দারী করে না?

জালিম কুরায়শরা কয়েক দিন পর হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলের নিচে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল এবং বলল, যদি তুমি ইসলাম পরিত্যাগ কর তবে তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। দু'জনেই উত্তর দিয়েছিলেন, যদি ইসলামই না থাকল তাহলে আর জীবন রেখে কি করব?

এরপর কুরায়শরা বলল, তোমার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকলে বল। হযরত খুবায়ব (রা.) বললেন, দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের অবকাশ দাও। অবকাশ দেওয়া হলো। তিনি সালাত আদায় করলেন। হযরত খুবায়ব (রা) বললেন, আমি সালাতে বেশি সময় ব্যয় করতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোমরা একথা না বল, আমি

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, রাজী'র যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.।

মৃত্যু থেকে ভয় পেয়ে গেছি। এরপর নিষ্ঠুরেরা তাঁদের দু'জনকে শূলে লটকিয়ে দেয়। অতঃপর তারা বর্শাধারীদের বলল, তোমরা এমনভাবে ওদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ কর যেন ওদের শরীরের প্রতিটি অংশ ঝাঁঝরা হয়ে যায়।[১]

আল্লাহু আকবার! তাঁদের দিল্ ইসলামের ওপর কতটা অটল ও মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের ছিল সত্য সুন্দর দীনের প্রতি কতটা দৃঢ়তা ও সংহতি! তাঁদের চিরস্থায়ী মুক্তি ও আল্লাহ্র রেযামন্দীর প্রতি কত গভীর প্রত্যয় ও একীন ছিল যে, সর্বপ্রকার কষ্ট-তকলীফ ও আঘাত বরদাশ্ত করেছেন, এতটুকু আহ্ কিংবা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করেন নি।

জনৈক কঠিনহৃদয় পাষণ্ড হযরত খুবায়ব (রা)-কে কলিজা ফেড়ে জিজ্ঞেস করে, বল, এখন যদি মুহাম্মদ (সা)-কে ধরে এনে শূলে চড়ানো হয় আর বিনিময়ে তুমি বেঁচে যাও, তা কি তুমি পছন্দ করবে? হযরত খুবায়ব (রা) জোশের সঙ্গে উত্তর দেন, আল্লাহ্ জানেন, আমি তো এও পছন্দ করি না যে, আমার জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ্র নবীর পায়ে একটি কাঁটাও ফুটুক।[২]

আল্লাহ্র এই সম্মানিত দু'জন বান্দা শাহাদতগাহ ও শূলির মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে হাযারো উৎসবপ্রিয় মানুষের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এর থেকে সেই দৃশ্যের পুরো অবস্থা, কাইফিয়ত ও বুযুর্গ সাহাবাদ্বয়ের ইসলামের সত্যতা ও ভালবাসার পবিত্র দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"দলে দলে লোক আমার চারপাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। তারা বিরাট বিরাট দলকে ডেকে এনেছে। এরা সবাই তাদের শত্রুতা জাহির করছে এবং আমার বিরুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করছে আর আমি সেই ধ্বংসস্থলে বন্দী দশায় (হাত-পা বাঁধা)। গোত্রগুলো তাদের মহিলা ও শিশুদেরকেও ডেকে এনেছে। আর আমাকে একটি শক্ত মযবুত উঁচু কাষ্ঠ খণ্ডের কাছে নিয়ে এসেছে। তারা বলে দিয়েছে, কুফরী এখতিয়ার করলে আমার মুক্তি মিলতে পারে অর্থাৎ আমি ছাড়া পেতে পারি। কিন্তু এর চেয়ে মৃত্যু তো আমার কাছে অনেক বেশি সহজ। আমার চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছে। কিন্তু এজন্য আমার কোন অধৈর্য নেই। আমি কাঁদব না, চিল্লাবও না। আমি জানি, আমি আল্লাহ্র পানে যাচ্ছি। আমি মারা যাব সে ভয় আমার নেই। কিন্তু আমি তো জড়িয়ে ধরা আগুনকে ভয় করি যা রক্ত শোষণ করবে। সেই আরশে আযীম-এর মালিক আমার থেকে কোন খেদমত নিতে চান এবং আমাকে ধৈর্য ধরার জন্য বলেন। এখন তারা আমাকে আঘাতে আঘাতে আমার শরীরের সব গোশ্ত টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং আমার আশা-ভরসা প্রায় সব শেষ হয়ে

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, রাজী', রা'ল ও যাকওয়ান যুদ্ধ, ৮ অধ্যায়।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ.।

গিয়েছে। আমি আমার দৈন্য-দশা, গৃহহীনতা ও অসহায় অবস্থার ফরিয়াদ এবং সেই সব ইচ্ছা-অভিরুচি (আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাবার পর, যে ব্যাপারে তারা আশাবাদী) আল্লাহর দরবারে পেশ করছি।

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন আল্লাহ্‌র পথে জীবন দিচ্ছি তখন এ ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নেই কোন্ পাশে আমি নিক্ষিপ্ত হলাম এবং কিভাবে জীবন দিলাম।

"আল্লাহ্‌র সত্তার কাছে পূর্ণ আশা, যদি তিনি চান, আমার কর্তিত গোশতের প্রতিটি টুকরোর মাঝে বরকত দেবেন।"[১]

সবশেষে তিনি এই মুনাজাত করেছিলেন ঃ

اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার রসূল (সা)-এর আহকাম ঐসব লোকের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার রসূলকে আমাদের অবস্থা ও তারা আমাদের সাথে যা করছে সে সম্পর্কে জানিয়ে দাও।"[২]

সা'ঈদ ইবন আমের (রা)-এর, যিনি হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর অন্যতম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন, অবস্থা ছিল, তিনি কখনো কখনো হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। হযরত ওমর ফারূক (রা) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, আমার কোন অসুখ কিংবা রোগ-ব্যাধি নেই অথবা অন্য কোন রকমের শারীরিক অসুবিধাও নেই। খুবায়ব (রা.)-কে যখন শূলে চড়ানো হয় তখন চারপাশের উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যেই মুহূর্তে হযরত খুবায়ব-এর শূলে চড়বার সময়কার কথাগুলো মনে হয় তখন আমি কেঁপে উঠি এবং বেহুশ হয়ে পড়ি।[৩]

আবূ বরা' আমেরও এ ধরনের প্রতারণাই করেছিল। সে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে এসে বিনীত আরয পেশ করে, নাজ্‌দ এলাকায় লোকদের তা'লীম ও হেদায়েত দানের জন্য আমাদের সাথে কিছু মুনাদী তথা দাঈ ও মুবাল্লিগ পাঠিয়ে দিন। তার ভাতিজা নজদের রঈস ছিল। আমের এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, দাঈ ও মুবাল্লিগদের সে হেফাজত করবে। নবী করীম (সা) মুনযির ইবন আমর আনসারী (রা)-র নেতৃত্বে সত্তর জন সাহাবীর একটি জামাআত, যাঁদের সকলেই ছিলেন হাফিয, কারী ও আলিম হিসাবে বিশিষ্ট, তার সাথে পাঠান। তাঁরা বি'রে মা'উনা

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ.; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃ.।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃ.।
৩. প্রাগুক্ত।

নামক স্থানে পৌঁছেন। এলাকাটি ছিল বনী আমেরের। সেখান থেকে হারাম ইব্ন মিলহানকে নবী করীম (সা)-এর লিখিত পত্রসহ তাদের শাসক প্রধান তোফায়লের কাছে পাঠানো হয়। তোফায়ল দূত হিসাবে আগত পত্রবাহক হারাম ইবন মিলহানকে শহীদ করে দেয়। তার ইঙ্গিতে জাব্বার ইবন সুলমা নামক এক ব্যক্তি হযরত হারাম ইবন মিলহানের পৃষ্ঠদেশে বর্শার আঘাত হানে যার ফলার অগ্রভাগ তাঁর বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে। পতনের মুহূর্তে তিনি বলেন,

فزت ورب الكعبة "কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি, আমি সফলকাম।"

ঘাতক জাব্বার ইবন সুলমার ওপর এই উক্তির এমনই প্রভাব পড়ে এবং এর এমনই আছর হয় যে, সে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে ইসলাম কবুল করে। তোফায়ল অবশিষ্ট সাহাবীদেরকেও হত্যা করে। কেবল কা'ব ইবন যায়দ (রা) নামক একজন সাহাবী কোনভাবে এর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এই হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ দেন।[১]

বনূ নাদীরের নির্বাসন

বনী ইসরাঈল (ইয়াহূদীরা) তাদের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মনোনীত জাতি ছিল। কিন্তু শেষ দিকে তারা আল্লাহ থেকে এতটা দূরে সরে আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়।

হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র মত রহম দিল্ তাদের অবস্থাদৃষ্টে তাদেরকে সাপ ও সাপের বাচ্চা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং এও বলেছিলেন, আল্লাহর রাজত্ব এই জাতি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য এক জাতিকে প্রদান করা হবে যারা ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।

এই সুসংবাদ প্রকাশের সময় যখন এসে গেল এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সর্বোত্তম শিক্ষামালার প্রচার শুরু করলেন তখন ইয়াহূদীরা ভীষণ রকমের দোটানার মাঝে পড়ে গেল। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও তারা তাদের জুলুম-নিপীড়নের শিকারে পরিণত করবে যেমনটি করেছিল হযরত ঈসা মসীহ (আ)-কে।[২]

যদিও ইয়াহূদীরা হিজরতের প্রথম বছরেই নিরাপত্তামূলক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু স্বভাবজাত দুষ্টামি ও শয়তানী বুদ্ধি তাদের বেশি দিন স্থির থাকতে দিল না। চুক্তি সম্পাদনের দেড় বছরের পরই তাদের শয়তানী আরম্ভ হয়ে যায়। নবী

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, রাজী'র যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃ.।
২. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১২৯-৩০।

করীম (সা) যখন বদর অভিমুখে গিয়েছিলেন সেই সময়কার কথা। জনৈকা মুসলিম মহিলা বনূ কায়নুকার মহল্লায় দুধ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। কয়েকজন ইয়াহূদী মহিলাটিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে এবং তাকে সবার সামনে বেআব্রু করে। মহিলাটি এই লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চীৎকার করে সাহায্যের আবেদন জানায়। তার চীৎকার শুনে একজন মুসলমান তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং উত্যক্তকারী ইয়াহূদীটাকে হত্যা করেন। অতঃপর এরই জের হিসাবে অপরাপর ইয়াহূদীরা জোটবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে। নবী করীম (সা) বদর থেকে ফিরে এসে ব্যাপারটা জানতে পেরে ইয়াহূদীদের ডেকে পাঠান এবং তাদের থেকেও বিষয়টি জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা না এসে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রটিই পাঠিয়ে দেয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।[১]

তাদের এসব তৎপরতা ছিল বিদ্রোহের শামিল। ফলে তাদের এই বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার শাস্তি হিসেবে নবী করীম (সা) তাদেরকে মদীনা ত্যাগে বাধ্য করেন।[২] কুরায়শরা মদীনার পৌত্তলিক অধিবাসীদের নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবার জন্য চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের সঙ্গে তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। এরপর বদর প্রান্তরে কুরায়শদের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর তারা ইয়াহূদীদেরকে পুনরায় চিঠি পাঠায় এই মর্মে যে, তোমরা ধন-সম্পত্তি ও অনেক দুর্গের মালিক। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে লড়াই কর। অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে দেখে নেব। তোমাদের মহিলাদের পায়জামা পর্যন্ত আমরা খুলে নেব।

পত্র পাবার পর বনূ নাদীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ও নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩]

হিজরী ৪র্থ সনের কথা। নবী করীম (সা) একটি জাতীয় প্রয়োজনে চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশে বনূ নাদীর মহল্লায় গমন করেন। তারা নবী করীম (সা)-কে খুবই সমাদরে একটি দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসায়। এরপর তারা ইবনে জাহাশা নামক এক দুরাত্মাকে প্রাচীরের ওপর তুলে দিয়ে নবী করীম (সা)-এর মাথায় পাথর ফেলে হত্যার চক্রান্ত করে। কিন্তু হুযূর আকরাম (সা) সেখানে গিয়ে বসতেই ওহী মারফত তাদের চক্রান্তের বিষয় অবহিত হন এবং কোন এক বাহানায় তিনি সেখানে থেকে উঠে আসায় বেঁচে যান এবং আল্লাহ্‌র অপার করুণায় প্রাণে রক্ষা পান।[৪]

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪৯ খণ্ড, ৪০৩ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বনূ নাদীর শীর্ষক অধ্যায়।
৩. আবূ দাউদ।
৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৯০ পৃ.।

এরপর তিনি বনূ নাদীরের ইয়াহূদীদেরকে তাদের চক্রান্ত ও শয়তানী অপচেষ্টার শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। তিনি তাদেরকে খায়বারে নির্বাসিত করেন। বনূ নাদীর অতঃপর উটের পিঠে যাবতীয় মাল-সামান ও বাড়ি-ঘরের সকল দরজা জানালা ও তৈজসপত্র চাপিয়ে গান-বাজনা সহকারে খায়বারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে এবং সেখানে গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করে।[১]

খন্দক যুদ্ধ

বনূ নাদীর মদীনা থেকে বেরিয়ে খায়বারে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে তারা এক বিরাট চক্রান্ত আঁটে। তাদের নেতাদের মধ্যে সালাম ইবন আবি'ল-হুকায়ক, হুই ইবন আখতাব, কিনানা ইবনু'র-রবী' প্রমুখ মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং বলে, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গী হও, আমাদের সহযোগিতা কর তাহলে ইসলামের মূলোৎপাটন করা যেতে পারে।

কুরায়শরা এজন্য সব সময় চার পায়ে খাড়া ছিল। তারা রাযী হতে ইয়াহূদী নেতারা এখান থেকে উঠে বনূ গাতাফানের কাছে যায় এবং তাদেরকে লোভ দেখায়, তোমরা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করলে বিনিময়ে আমরা তোমাদেরকে খায়বারে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক সব সময় দিয়ে যাব। বনূ আসাদ ছিল বনূ গাতাফানের মিত্র। গাতাফান তাদেরকে লিখল, তোমরা সসৈন্য আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। বনূ সুলায়ম ছিল কুরায়শদের আত্মীয়। সম্পর্কের খাতিরে তারাও কুরায়শদের সঙ্গে যোগ দেয়। বনূ সা'দ ছিল ইয়াহূদীদের মিত্র। এই সূত্রে ইয়াহূদীরা তাদেরকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। মোটের ওপর আরবের প্রায় সকল গোত্রই বিরাট সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে অগ্রসর হয়। এদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের ঊর্ধ্বে।[২]

মহানবী (সা) এ খবর পেতেই সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসেন। হযরত সালমান ফারসী ইরানের অধিবাসী হওয়ায় খন্দক (পরিখা) খননের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জানতেন। তিনি তাঁর অভিমত দিতে গিয়ে বলেন, খোলা ময়দানে বেরিয়ে এই বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করা ঠিক হবে না। এর চেয়ে বরং একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে সেনাবাহিনী একত্র করা যাক এবং এর চার পাশে খন্দক (পরিখা) খনন করা হোক। সকলেই তাঁর এই অভিমত পছন্দ করে এবং তদনুযায়ী খন্দক খননের যন্ত্রপাতি জোগাড় করা হয়।

মদীনার তিন দিকে ছিল বসতবাড়ি ও খেজুর বাগানের অব্যাহত সারি যা শহর রক্ষা প্রাচীর হিসাবে কাজ দিত। কেবল সিরিয়ার দিকটা ছিল উন্মুক্ত। নবী করীম (সা) তিন হাজার সাহাবীসহ শহর থেকে বেরিয়ে সেই খোলা জায়গায় খন্দক খননের কাজ শুরু করেন। দিনটি ছিল ৫ম হিজরীর ৮ তারিখ।

---

১. মুসান্নিফ আবদুর রাযযাক, ৫ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃ.; সীরাত ইব্ন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৯১-৯২।
২. ফতহুল বারী, ৩৯৩পৃ; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৪-১৫।

নবী করীম (সা) নিজেই চিহ্ন এঁকে দেন। দাগ কেটে দশ গজ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং দশ হাত গভীর খন্দক খনন প্রতি দশজনের দায়িত্বে সোপর্দ করেন। ছয় দিনে তিন হাজার সাহাবী মিলে এই বিপুল শ্রমসাধ্য খন্দক খননের কাজ সম্পন্ন করেন।[১]

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ যখন চলছিল তখনও সরওয়ারে দোজাহান (সা) একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় কাজ করেছিলেন। আর আজও তাঁকে সেই একই রূপে, একই বেশে দেখা যাচ্ছে। শীতের রাত! তিন দিন যাবত পেটে দানাপানি কিছুই পড়ে নি। তিনি ক্ষুধার্ত। আনসার ও মুহাজিররা পিঠে করে মাটির ঝুড়ি টানছেন এবং দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসছেন আর প্রেম ও মুহব্বতের আতিশয্যে সমস্বরে কোরাস গাইছেন ঃ

نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام مابقينا ابدا ـ

"আমরা তো তারাই যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলামের জন্য চিরদিনের তরে অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি।"[২]

সরওয়ারে দো-আলম (সা) সাহাবাদের সঙ্গে মাটি কাটায় অংশ নিচ্ছেন এবং তাঁদের মতই ঝুড়িতে মাটি ভর্তি করে দূরে গিয়ে ফেলে আসছেন। পবিত্র দেহের বিভিন্ন অংশে ও পেটে ধূলি-মাটি লেগে রয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছেন ঃ

والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لا قينا

ان الا ولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا

ابينا শব্দ আসতেই আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকত এবং এ শব্দটি তিনি বারবার আবৃত্তি করতেন। এরই সাথে তিনি আনসারদের জন্য দোআও করে যাচ্ছিলেন এবং নিম্নোক্ত দোআটিও যবান মুবারকে বারবার আওড়াচ্ছিলেন ঃ

اللهم انه لا خير الا خير الاخرة فتبارك فى الا نصار و المهاجرة ـ

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ তথা পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। অতএব, আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে তুমি বরকত দান কর"।[৩]

এভাবে খনন কাজ চলাকালে হঠাৎ একটি বিরাট পাথর খণ্ড সামনে পড়ে। কোনরূপ আঘাতই কার্যকর হচ্ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ নিলেন। তিনি তখন তিন দিনের ক্ষুধার্ত (বিধায় স্বভাবতই দুর্বল)। পেটে পাথর বাঁধা। তিনি

১. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ২৯৩-৯৪ পৃ; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ২১৬-১৭ পৃ.।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, খন্দক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়। ৩. প্রাগুক্ত।

কোদাল হাতে এর ওপর আঘাত হানলেন আর আঘাতের সাথে সাথে পাথর খণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।[১]

সিলা' পর্বত পেছনে রেখে সৈন্যদেরকে কাতারবন্দী করা হয়। মহিলাদেরকে শহরের মধ্যকার নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বনূ কুরায়জার পক্ষ থেকে হামলার আশংকা থাকায় সালামা ইবন আসলামের নেতৃত্বে দু'শ সৈন্যের একটি বাহিনী মোতায়েন করা হয় যাতে সেদিক থেকে কোন আক্রমণ না আসতে পারে।[২]

বনূ কুরায়জার ইয়াহূদীরা এতদিন পৃথক ছিল। কিন্তু বনূ নাদীর তাদেরকে তাদের সাথে সহযোগিতার জন্য প্রয়াস চালায়। হুই ইব্ন আখতাব [হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর পিতা] স্বয়ং বনূ কুরায়জার সর্দার কা'ব ইবন আসাদ-এর কাছে গমন করে। কিন্তু কা'ব তাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। হুই বলল, আমি এক বিশাল সেনাবাহিনী এনেছি। কুরায়শ ও সেই সাথে সমগ্র আরব এক বিরাট সাইক্লোন নিয়ে হাযির হয়েছে। তারা সকলেই মুহাম্মদের রক্ত পিয়াসী। এই সুযোগ হেলায় হারানো ঠিক হবে না। এবার ইসলামকে জড়ে মূলে উৎসাদনের পালা।

কা'ব কিন্তু এত সব সত্ত্বেও এতে রাযী হচ্ছিল না। সে বলল, আমি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সব সময় সত্য পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মানুষের মত কাজ হবে না।

কিন্তু হুইয়ের যাদুও ব্যর্থ হতে পারে না।

নবী করীম (সা) এসব অবস্থা জেনে বিষয়টি আরও সরেযমীনে জানতে এবং তারা যেন কিছু বলতে না পারে সেজন্য হযরত সা'দ ইবন মুআয ও হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে পাঠান এবং বলে দেন, যদি বনূ কুরায়জা প্রকৃতই চুক্তি ভঙ্গ করে থাকে তাহলে সেখান থেকে এসে সাংকেতিক শব্দে বলবে যাতে লোকের মন ভেঙে না যায় এবং সবার মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে না পড়ে। উভয়ে গিয়ে বনূ কুরায়জাকে কৃত চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা বলল, মুহাম্মদ (সা) কে? তাঁকে আমরা চিনি না। আর চুক্তিই বা কিসের? [৩]

মোট কথা, বনূ কুরায়জা এই অগণিত ও অসংখ্য ফৌজের সংখ্যা আরেক গুণ বাড়িয়ে দিল। কুরায়শ গোত্র, ইয়াহূদী ও আরব গোত্রগুলোর দশ হাজার ফৌজ তিন ভাগে ভাগ হয়ে মদীনার তিনদিকে এত প্রবল বিক্রমে আক্রমণোদ্যত হয় যে, মদীনার মাটি দুলে ওঠে।[৪]

১. বুখারী কিতাবুল মাগাযী, খন্দক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানীকৃত, ১ম খণ্ড, ৪২২ পৃ.।
৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২০-২২৪পৃ.।
৪. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানীকৃত, ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃ. দ্র.।

স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا -

"যখন ওরা তেমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের ওপরের দিক ও নীচের দিক থেকে, তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে তখন মু'মিন পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।"

[সূরা আহযাব, ১০-১১ আয়াত]

মুসলিম ফৌজে মুনাফিকদের একটা সংখ্যাও শামিল ছিল যারা দৃশ্যত যদিও মুসলমানদের সাথে ছিল, কিন্তু মৌসুমের রুক্ষতা, রসদের স্বল্পতা, উপর্যুপরি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাত্রের নিদ্রাহীনতা, অগণিত শত্রু সৈন্যের সমাবেশ এমন সব ঘটনা ছিল যেসব ঘটনা তাদের মুখোশ খুলে দেয়। তারা একের পর এক এসে রসূল আকরাম (সা)-এর কাছে এসে অনুমতি চাইতে লাগল, আমাদের বাড়ি-ঘর নিরাপদ নয়। আমাদেরকে শহরে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করা হোক![১]

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ - وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ - إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا -

"তারা বলতে লাগল, 'আমাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত'। আসলে তা অরক্ষিত ছিল না, আসলে তারা (এসব বলে) ভাগতে চাচ্ছিল।" [সূরা আহযাব]

কিন্তু জীবন উৎসর্গকারী ইসলামের মুজাহিদবৃন্দের সেই ইখলাস সোহাগা দিয়ে স্বর্ণ পরীক্ষার মত পরীক্ষার উপযোগী ছিল।[২]

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا -

"মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, ওরা বলে উঠল, এ তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন; আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধিই পেল"।

[সূরা আহযাব, ২২ আয়াত]

অবরোধের কঠোরতা ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দৃঢ়তা

প্রায় এক মাস যাবত এত কঠোরতার সঙ্গে অবরোধ অব্যাহত থাকে যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তিন দিন যাবত অভুক্ত থাকেন। একদিন সাহাবায়ে

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২৭২ পৃ.; সীরাতে ইব্ন হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২২ পৃ.।
২. তফসীরে কুরতুবী, ১৪ খণ্ড, ১৫৭ পৃ.।

কিরাম (রা) আর না পেরে রসূল আকরাম (সা)-কে তাদের পেট খুলে দেখালেন সেখানে পাথর বাঁধা। এরপর রসূল আকরাম (সা) তাঁর পেট খুলে দেখালে দেখা গেল সেখানে দু'টো পাথর বাঁধা।[১] অবরোধ এত কঠোর ও তীব্র ছিল এবং এতই বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, একবার তিনি উপস্থিত সাহাবাদের ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অবরোধকারীদের খবর নিয়ে আসবে? পর পর তিনবার তিনি একই কথা বললেন। কিন্তু হযরত যুবায়র (রা) ছাড়া আর কারো থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এ সময় তিনি হযরত যুবায়র (রা)-কে 'হাওয়ারী' উপাধি দান করেন।[২]

অবরোধকারী সম্মিলিত বাহিনী খন্দক পার হতে পারছিল না। এজন্য তারা দূর থেকে কেবল তীর ও পাথর নিক্ষেপ করত। নবী করীম (সা) খন্দকের বিভিন্ন অংশে ফৌজ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যারা হামলাকারীদের হামলা মুকাবিলা করত। এর একটি অংশ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর ভাগেও ছিল।[৩]

অবরোধের কঠোরতা ও তীব্রতাদৃষ্টে নবী করীম (সা)-এর খেয়াল হলো যেন এমন না হয় যে, আনসাররা হিম্মত হারিয়ে বসে। সেজন্য তিনি গাতাফান গোত্রের সঙ্গে এই শর্তে চুক্তি করতে চাইলেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দেওয়া হবে (পরিবর্তে তারা সম্মিলিত বাহিনী ত্যাগ করবে)। তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আনসার নেতা সা'দ ইবন মু'আয ও সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দু'জনেই বিনীতভাবে জানালেন, যদি এটা আল্লাহ্র হুকুম হয় তাহলে তা এনকার করার কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই। কিন্তু যদি এটা আপনার মত হয় তাহলে বিনীত আরয হলো, যখন আমরা কুফরী হালতে ছিলাম অর্থাৎ আমরা যখন কাফির ছিলাম তখনও কেউ আমাদের কাছে কর কিংবা খাজনা চাইবার সাহস করে নি। আর এখন যখন ইসলাম আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে তখন আমরা খাদ্যশস্যের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করব, তা কী করে হয়? রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দৃঢ়তাদৃষ্টে নিশ্চিন্ত হলেন এবং স্বস্তির শ্বাস নিলেন। অপর দিকে সা'দ (রা) চুক্তির কাগজ হাতে নিয়ে লিখিত সব কিছু মুছে ফেললেন এবং বললেন, তারা যা পারে তা করুক।[৪]

এরপর মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের এরূপ পরিকল্পনা করা হলো যে, কুরায়শদের বিখ্যাত জেনারেলবৃন্দ অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, আমর ইবনু'ল-আস, যেরার ইবনুল খাত্তাব ও হুবায়রার জন্য এক দিন করে নির্ধারণ

১. শামাইলে তিরমিযী باب ماجاء فى عيش النبى صم।
২. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, খন্দক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪২৫ পৃ.।
৪. কাশফুল আস্তার, বাযযারী কৃত, ১ম খণ্ড, ৩৩২; সীরাত ইবন হিশাম ২য় খণ্ড, ২২৩ পৃ.।

করা হলো। প্রত্যেক জেনারেল তার নির্ধারিত দিনে গোটা ফৌজ নিয়ে লড়াইয়ে নামত এবং লড়াই করত। কিন্তু তারা কেউই খন্দক পার হতে পারত না। যেহেতু খন্দকের প্রশস্ততা খুব বেশি ছিল না, এজন্য তারা খন্দকের ওপার থেকে এপারের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে পাথর ও তীর নিক্ষেপ করত।[১] কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের সাফল্য না আসায় তারা একযোগে সাধারণ ও ব্যাপক হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। সমগ্র ফৌজ একত্র হয়। গোত্রপ্রধানরা যার যার বাহিনীর সামনেই ছিল। টহল দিয়ে ফেরার সময় তারা দেখতে পায়, খন্দকের প্রশস্ততা এক স্থানে আকস্মিকভাবে কম। অতএব, তারা সেখানটাই আক্রমণ চালাবার জন্য বেছে নেয়। আরবের বিখ্যার বীর যেরার, হুবায়রা, নওফল ও আমর ইবনে আবদে উদ খন্দকের উল্লিখিত প্রান্ত হতে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে খন্দক পার হয়। এদের মধ্যে আবার সর্বাধিক বীরত্বের খ্যাতির অধিকারী ছিল আম্‌র ইবনে আবদে 'উদ। তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ হিসাবে মনে করা হত। বদর যুদ্ধে সে আহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল এবং কসম খেয়েছিল, যতদিন এর প্রতিশোধ নিতে না পারব ততদিন চুলে তেল দেব না। এ সময় তার বয়স ছিল ৯০ বছর। তারপরও সেই সর্বপ্রথম সামনে অগ্রসর হল এবং আরবদের প্রথা মাফিক চীৎকার দিয়ে আহ্বান করল, আমার মুকাবিলায় কে আসবে এস। হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমি (আসছি)। রসূল আকরাম (সা) এই ভেবে তাঁকে বাধা দিলেন, প্রতিপক্ষ আম্‌র ইবনে আবদে 'উদ। এতে হযরত আলী (রা) বসে পড়লেন। কিন্তু অপর দিকে আমরের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যও কেউ এগিয়ে যাচ্ছিল না। আমর আবারও চীৎকার দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর আহ্বান জানাল। তার আহ্বানের সাড়াও মিলল একই কণ্ঠ থেকে। তৃতীয় বারের আহ্বানে নবী করীম (সা) আলীকে বললেন, মনে রেখ, এ আর কেউ নয়, আমর। এতে হযরত আলী (রা) বিনয়ের সঙ্গে জওয়াব দিলেন, আমি জানি সে আমর। এরপর নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং নিজ হাতে তাঁর হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন। সেই সঙ্গে মাথায় পবিত্র হাতে পাগড়ীও বেঁধে দিলেন।

আমরের কথা ছিল ঃ কোন মানুষ দুনিয়ার বুকে আমার সামনে যদি তিনটি জিনিস পেশ করে এবং তা গ্রহণ করার আবেদন জানায় তবে সেগুলোর ভেতর একটি সে অবশ্যই কবুল করবে। হযরত আলী (রা) তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন আসলেই সে একথা বলেছিল কিনা। এরপর তিনি তার সঙ্গে নিম্নোক্ত বাক্যালাপ করেন ঃ

আলী (রা) ঃ আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।

---

১. সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৩৬ পৃ.।

আমর ঃ এ হতে পারে না।

আলী (রা) ঃ তাহলে যুদ্ধ থেকে ফিরে যাও।

আমর ঃ আমি আরবের মহিলাদের ভর্ৎসনা শুনতে পারব না।

আলী (রা) ঃ তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

আমর একথা শুনে হেসে ফেলল এবং বলল, আমি আশা করিনি, আসমানের নিচে কখনো কেউ আমার সামনে এ ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করবে।

হযরত আলী (রা) ছিলেন পদাতিক। আমরের আত্মমর্যাদাবোধ তাকে এ অনুমতি দেয় নি যে, সে অশ্বারূঢ় অবস্থায় একজন পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল এবং তলোয়ারের প্রথম আঘাতে তার ঘোড়ার পা কেটে দিল। এরপর জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? হযরত আলী (রা) নাম বলতে সে বলল, আমি তোমার সঙ্গে লড়তে ইচ্ছুক নই। প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, তুমি না চাইলেও আমি কিন্তু চাই। একথা শুনতেই আমর ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং খাপ থেকে তলোয়ার বের করে অগ্রসর হলো ও আঘাত হানল। হযরত আলী ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করলেন। কিন্তু তলোয়ার ঢাল কেটে বেরিয়ে এল এবং কপালে গিয়ে লাগল। আঘাত তেমন মারাত্মক না হলেও এর দাগ কিন্তু সারা জীবন তাঁর কপালে ছিল। কামূস গ্রন্থে লিখিত আছে, হযরত আলী (রা)-কে যু'ল-কারনায়ন বলা হতো। এর কারণ ছিল, তাঁর কপালে দু'টো আঘাতের চিহ্ন ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল আমরের দেয়া, আরেকটি ছিল (নরাধম) ইবনে মুলজিমের। শত্রু আঘাত হেনেছিল। এবার হযরত আলী (রা) আঘাত হানলেন। তলোয়ারের সে আঘাতে আমরের কাঁধ কেটে নিচে নেমে এল। সাথে সাথেই হযরত আলী (রা) 'আল্লাহু আকবার' বলে ধ্বনি তুললেন এবং বিজয় লাভ করলেন।[১]

আমরের পর যেরার ও হুবায়রা আক্রমণ শানিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু যুলফিকারের দিকে অগ্রসর হতেই সকলকে পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটতে হলো। হযরত ওমর ফারূক (রা) যেরারের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যেরার পিছু ফিরে ওমরের প্রতি বর্শার আঘাত হানতে চাইল। কিন্তু আঘাত না করে নিজেকে সংযত করল এবং বলল, ওমর! আমার এই অনুগ্রহের কথা মনে রেখ।[২]

নওফল পালাতে গিয়ে খন্দকের মধ্যে পড়ল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। সে তখন বলল, মুসলমানেরা! আমি শরীফ

১. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃ.; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২৪ পৃ.; বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়া, ৩য় খণ্ড, ৪৩৬-৩৯ পৃ.; সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪২৭-২৮ পৃ.।

২. সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৪৪ পৃ.।

লোকের মত মরতে চাই। হযরত আলী (রা) তার আবেদন কবুল করলেন এবং খন্দকে নেমে তাকে তার প্রার্থিত মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়ে দিলেন।[১]

আক্রমণের এ দিনটি ছিল খুব কঠিন। গোটা দিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। কাফিররা চতুর্দিক থেকে মুষলধারে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করছিল। এক মুহূর্তের জন্যও এর বিরতি ঘটেনি। এ দিনের কথাই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর পর চার ওয়াক্ত সালাত এ দিন কাযা হয়ে যায়। অব্যাহত তীর ও প্রস্তর বর্ষণের দরুন স্থান ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।[২]

হযরত সফিয়্যা (রা)-র বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

মুসলিম মহিলারা যে কেল্লায় ছিলেন তা ছিল বনূ কুরায়জা পল্লী সংলগ্ন। ইয়াহূদীরা যখন দেখতে পেল, মুসলমানরা সকলেই তাদের নবীর সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত, তারা দুর্গের ওপর আক্রমণ করে বসল। এ সময় এক ইয়াহূদী কেল্লার সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং কেল্লার ওপর আক্রমণের সুযোগ তালাশ করছিল। হযরত সফিয়্যা, যিনি ছিলেন রসূল আকরাম (সা)-এর ফুফু, তাকে দেখে ফেলেন। মহিলাদের হেফাজতের জন্য কবি হাসসান (রা)-কে মোতায়েন করা হয়েছিল। হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁকে গিয়ে বললেন, আপনি নেমে গিয়ে ঐ ইয়াহূদীটাকে হত্যা করে আসুন, নইলে সে আমাদের ব্যাপারটা শত্রুদের জানিয়ে দেবে। হযরত হাসসান (রা)-এর এমন এক অনিবার্য অসুবিধা দেখা দিয়েছিল যার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহে শরীক হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর পক্ষে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও অসম্ভব ছিল। ফলে তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি যদি এ কাজই করতে পারতাম তাহলে কি এখানে থাকতাম! অতঃপর হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে হাতে নিলেন এবং নেমে গিয়ে ইয়াহূদীর মাথায় এমন সজোরে আঘাত হানলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল। হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁর কাজ শেষে ফিরে এলেন এবং হযরত হাসসান (রা)-কে বললেন, এর আপনি তার কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্রগুলো গিয়ে নিয়ে আসুন। হযরত হাসসান (রা) বললেন, যেতে দিন এসব। আমার এ সবে কোন প্রয়োজন নেই। হযরত সফিয়্যা (রা) বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার গিয়ে তার মাথাটা কেটে দুর্গের নিচে ফেলে দিয়ে আসুন যাতে ইয়াহূদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু এই খেদমতটুকুও শেষ পর্যন্ত হযরত সফিয়্যা (রা)-কেই আঞ্জাম দিতে হয়। ফলে ইয়াহূদীরা ঘাবড়ে যায় এবং তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, দুর্গেও বেশ ফৌজ মোতায়েন রয়েছে এবং তা একেবারে অরক্ষিত নয়। এই ধারণায় অতঃপর তারা আর দুর্গের ওপর আক্রমণ চালাতে সাহসী হয় নি।[৩]

---

১. দালাইলুন-নুবুওয়া, ৩য় খণ্ড, ৪৩৮ পৃ.; সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃ.।
২. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুস-সালাত।
৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃ.।

গায়বী সাহায্য ও অবরোধের অবসান

অবরোধ যতই দীর্ঘ হচ্ছিল অবরোধকারীদের সাহস ও মনোবলে ততই ভাটা দেখা দিচ্ছিল। ১০ হাজার সৈন্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় রসদ সরবরাহ খুব সহজসাধ্য ছিল না। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই এ সময় শীত মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও এত প্রবল বেগে বাতাস ও শৈত্য প্রবাহ বইতে শুরু করল যে, মনে হলো, বুঝি তুফান শুরু হলো। তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে গেল, ডেগচীগুলো উল্টে পড়ল চুলোর ওপর। মোটের ওপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে একাকার। ফলে আকস্মিক এ তুফান ও ঝঞ্ঝাবায়ু কয়েক গুণ সৈন্যের চেয়েও বেশি সুফল বয়ে আনল। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কুরআন মজীদ প্রবাহিত এ ঝঞ্ঝাবায়ু ও শৈত্য প্রবাহকে আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ـ

"মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন তোমাদের ওপর এক বিশাল সেনাবাহিনী এসে আপতিত হলো তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল বায়ু প্রেরণ করি এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করি যা তোমরা দেখ নি।" (সূরাতুল আহ্‌যাব)

নু'আয়ম ইবন মাসউদ আছ-ছাকাফী ছিলেন গাতাফান গোত্রের সর্দার। কুরায়শ ও ইয়াহূদী উভয়ই তাকে বড় বলে মানত। তিনি এ সময় ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কাফিররা তখন পর্যন্ত জানত না। তিনি কুরায়শ ও ইয়াহূদীদের কাছে পৃথক পৃথকভাবে গিয়ে এ ধরনের কথা বলেন যার ফলে উভয়ের মধ্যে বিভেদ, সন্দেহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস দেখা দেয় এবং তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে।।[১]

মৌসুমের তীব্রতা, অবরোধের বিস্তৃতি, শৈত্য প্রবাহের প্রচণ্ডতা, রসদের স্বল্পতা, ইয়াহূদীদের বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কারণে কুরায়শদের প্রচণ্ড আগ্রহে ভাটা দেখা দেয়। আবূ সুফিয়ান সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, রসদের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তদুপরি আবহাওয়ার এই অবস্থা। ইয়াহূদীরা আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে। এখন অবরোধ বেকার ও অর্থহীন। এই বলে আবূ সুফিয়ান বিদায়ী নাকারা বাজাবার নির্দেশ দিলেন।[২] গাতাফানও তাদের সাথে রওয়ানা দেয়। বনূ কুরায়জা অবরোধ পরিত্যাগ করে নিজেদের দুর্গের দিকে চলে আসে এবং মদীনার আকাশ ২০-২২ দিন পর্যন্ত ধূলিময় থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২৩২ পৃ.।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ـ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ـ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে নি। আর মু'মিনদের জন্য যুদ্ধে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (সূরা আহযাব)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাণহানি খুবই কম হয়। কিন্তু আনসারদের সবচে' বড় ও শক্তিশালী বাহু ভেঙে যায় অর্থাৎ বনূ আওসের সর্দার হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) এই যুদ্ধে আহত হন। তিনি আর বাঁচেন নি। তাঁর আহত হওয়াই তাঁর শাহাদত লাভের কারণ ঘটে। তাঁর আহত হওয়ার ঘটনা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনই শিক্ষাপ্রদ।

মা তাঁর কলিজার টুকরাকে জিহাদ ও শাহাদত লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন

উম্মু'ল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) যেই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই একই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর মা এবং তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি দুর্গের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি হযরত সা'দ অস্ত্র হাতে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দ্রুত বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ সময় তিনি মুখে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

لبث قليلا يدرك الهيجا جمل ـ لا بأس بالموت اذ الموت نزل ـ

"একটু থামো যাতে যুদ্ধে আরও একজন গিয়ে পৌঁছুতে পারে। যখন মৃত্যুর সময় এসেই গেছে তখন আর মৃত্যুকে ভয় করে কী লাভ!"

হযরত সা'দ (রা)-এর মা এই কবিতা শুনতে পেয়ে তাঁর পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, বাপ! দ্রুত যাও। তুমি বড় দেরি করে ফেলেছ। হযরত আয়েশা (রা) সা'দ-এর মাকে বললেন, হায়! সা'দ (রা)-এর লৌহবর্মটি যদি একটু লম্বা হত। এমন সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ইবনুল আরাকা বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতের দিকে তীর নিক্ষেপ করে। তীর তাঁর হাতে গিয়ে লাগে এবং এতে করে তাঁর হাতের প্রধান শিরাটি কেটে যায়।[১] খন্দক যুদ্ধ শেষে তাঁর জন্য রসূল আকরাম (সা)

১. সহীহ বুখারী باب رجع النبى ص من الاحزاب সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃ:, দালাইলুন-নুবুওয়া, ৩য় খণ্ড, ৪৪০-৪১।

মসজিদে নববীর সাহানে একটি তাঁবু স্থাপন করেন এবং তাঁর সেবা-শুশ্রূষা শুরু করেন। এই যুদ্ধে রুফায়দা নাম্নী একজন মহিলা শরীক ছিলেন। তাঁর কাছে ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ঔষধপত্রসহ প্রয়োজনীয় সকল জিনিস ছিল। আহতদের ক্ষতস্থানে তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধতেন। এই তাঁবু ছিল তাঁর এবং তিনিই তাঁর (সা'দ-এর) চিকিৎসার যিম্মাদার ছিলেন। নবী করীম (সা) স্বয়ং তাঁর পবিত্র হাতে কয়েকবার সা'দ (রা)-এর ক্ষতস্থানে তীরের ফলা নিয়ে দাগ দিলেন, কিন্তু তা ফুলে গেল। তিনি আবার দাগ দিলেন। কিন্তু এরপরও কোন লাভ হলো না। কয়েকদিন পর অর্থাৎ বনূ কুরায়জার গাদ্দারীর শাস্তি প্রাপ্তির পর আহত স্থানটি ফেটে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং এতেই তিনি ওফাত পান।[১]

গাযওয়া যার্তুর-রিকা'

খন্দক যুদ্ধের পর নবী করীম (সা) গাতাফান গোত্রের বিরুদ্ধে মুকাবিলার উদ্দেশে চার শ' সাহাবীসহ নজদের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই অভিযানে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পা এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল যে, পায়ে রশি বেঁধে চলতে হয়েছিল। ফলে এই অভিযানের নাম যাতুর রিকা' হিসাবে অভিহিত হয়।[২] এই অভিযানের পর একটি ঘটনা সংঘটিত হয় আর তা ছিল এই ঃ ইবাদ ইবনে বাশার ও আম্মার ইবনে ইয়াসির নামক দু'জন সাহাবী এক জায়গায় পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। পাহারার এক পর্যায়ে হযরত ইবাদ (রা) সালাত আদায় করছিলেন এবং হযরত আম্মার (রা) ঘুমুচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবাদ (রা)-কে লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষের কেউ তীর নিক্ষেপ করে। তিনি শরীর থেকে টেনে তীর বের করে ফেলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি আবার যথানিয়মে সালাত আদায়ে মশগুল হন। শত্রু পুনরায় তীর নিক্ষেপ করে এবং এরপর আরও একটি, সর্বমোট তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। এসব তীরের সবকয়টি সালাতরত সাহাবীর শরীরে গিয়ে বিঁধে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাহাবী যথারীতি সালাতেই মশগুল থাকেন। সালাম ফেরানোর পর তিনি তাঁর সাথীকে জাগান এবং সকল ঘটনা খুলে বলেন। আনুপূর্বিক সকল কিছু শোনার পর তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে জাগালেন না কেন? তিনি বলেন, আমি একটি সূরা পড়ছিলাম। আমার মন চাইল না এ সূরা অপূর্ণ রেখে সালাত শেষ করি।[৩]

বনূ কুরায়জার যুদ্ধ

নবী করীম (সা) মদীনায় আগমনের সূচনাতেই ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তাদেরকে জীবন, সম্পদ ও ধর্ম পালনসহ সর্ববিষয়ে

১. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত অধ্যায়, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ৪১২ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, গযওয়া যাতুর রিকা'।
৩. মুসনাদ আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩৪৪; সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুত-তাহারাত।

সকল প্রকার স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের নিশ্চয়তা দান করেছিলেন। কিন্তু কুরায়শরা যখন তাদেরকে লোভ দেখাল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উত্তেজিত করে পত্র লিখল, তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। নবী করীম (সা) তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি নবায়ন করতে চাইলেন। বনূ নাদীর অস্বীকার করল। ফলে তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু বনূ কুরায়জা নতুনভাবে আবার চুক্তিবদ্ধ হয়। অতএব, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। মুসলিম শরীফে এ সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ[১]

عن ابن عمر ان يهود بنى النضير وقريظة حاربوا رسول الله صـ فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى النضير واقر ومن عليهم -

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, বনূ নাদীর ও বনূ কুরায়জার ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাদীরকে নির্বাসিত করলেন আর বনূ কুরায়জাকে থাকতে দিলেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন।"[২]

বনূ নাদীরকে যখন নির্বাসিত করা হয় তখন তাদের নেতৃবৃন্দ যথা হুই ইবনে আখতাব, আবূ রাফে, সালাম ইবনে আবি'ল হুকায়ক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে একটি ছোট-খাটো রাজ্যই কায়েম করে বসে। জঙ্গে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ তাদেরই চেষ্টা-তদবীর ও কূট কৌশলের ফসল। আরব গোত্রগুলোর মাঝে দৌড়-ঝাপ করে তারা গোটা দেশেই যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দেয় এবং কুরায়শদের সাথে মিলে মদীনার ওপর আক্রমণোদ্যত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত বনূ কুরায়জা মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ও অনড় থাকে। কিন্তু হুই ইবনে আখতাব তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং উস্কানি দিয়ে চুক্তি ভঙ্গে সম্মত করায়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি আল্লাহ না করুন, কুরায়শরা যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে চলেও যায় তাহলে আমি খায়বার ছেড়ে দিয়ে তোমাদের এখানে এসে থাকব। অনন্তর বনূ কুরায়জা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কুরায়শদের সঙ্গে খন্দক যুদ্ধে প্রকাশ্যে যোগ দেয় এবং পরাজিত হয়ে পিছু হটে। এ সময় তারা ইসলামের সবচে' বড় দুশমন হুই ইবনে আখতাবকে সাথে করে নিয়ে আসে।[৩] এখন তাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। নবী করীম (সা)

১. সীরাতুন-নবী, ১ম খণ্ড, ৪৩৩ পৃ.।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, جلاء اليهود من الحجاز।
৩. সীরাতুন-নবী, ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃ. তাবারী ও সীরাত ইবনে হিশামের বরাতে।

ন্দক যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতেই সকলের প্রতি নির্দেশ জারী করেন, কেউ যেন অস্ত্র রিত্যাগ না করে, সকলেই বনূ কুরায়জা অভিমুখে যাত্রা করে।[১] বনূ কুরায়জা যদি ন্ধি, সমঝোতা ও শান্তির পথে ফিরে আসত তাহলে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ফয়সালা তে পারত, এরপর তারা নিরাপদ হয়ে যেত। কিন্তু তারা তা না করে মুকাবিলার থ ধরে। সেনা ব্যূহ থেকে বেরিয়ে হযরত আলী (রা.) যখন তাদের দুর্গের পাশে য়ে দাঁড়ালেন তখন তারা প্রকাশ্যে নবী করীম (সা)-এর উদ্দেশ্যে গালি দেয় ও শোভন ভাষা ব্যবহার করে। ফলে তাদেরকে অবরোধ করা হয় এবং এক মাস াবিত প্রায় এই অবরোধ স্থায়ী হয়। শেষ পর্যন্ত তারা অনন্যোপায় হয়ে নতি স্বীকারে াধ্য হয় এবং এই দরখাস্ত পেশ করে যে, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তাদের ম্পর্কে যে ফায়সালা দেবেন তারা তা মেনে নেবে।

হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও তাঁর গোত্র (আওস) বনূ কুরায়জার মিত্র ও ারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আর আরবে এই সম্পর্ক আপন বংশীয় সম্পর্কের চয়েও বড় ছিল। নবী করীম (সা) তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন।[২]

কুরআন মজীদে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ হুকুম না আসত, নবী করীম (সা) তওরাতের বিধি-বিধান অনুসরণ করতেন। অতএব, অধিকাংশ মসলা, যেমন কিবলা নির্ধারণ, সালাত, রজম (বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান), কিসাস ও অনুরূপ ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত কোন বিশেষ ওয়াহ্য়ি আসে নি, নবী করীম (সা) তওরাতের প্রদত্ত বিধানই অনুসরণ করেছেন। হযরত সা'দ (রা) যে ফয়সালা দিলেন অর্থাৎ যুদ্ধক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে, ধন-সম্পদ গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে[৩] তা তাওরাতেরই বিধান মুতাবিক ছিল। তাওরাতের সামরিক বিধি মুতাবিক (দ্বিতীয় বিবরণ ২০ অধ্যায়, ১০-১৪ আয়াত) বিধানটি এইরূপ ঃ

"যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয় তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায় তাহারা তোমাকে কর দিবে এবং তোমার দাস হইবে। কিন্তু সে যদি সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, باب رجع النبي صـ من الاحزاب।

২. হযরত সা'দ (রা)-এর বিচারক হিসাবে নিযুক্তি ও তাঁর প্রদত্ত রায় সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (দ্র. কিতাবুল মাগাযী)

৩. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ باب جواز قتال فى نقض العهد;

খড়্গ ধারে আহত করিবে; কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা, পশু প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য আপনার জন্য লুটস্বরূপ গ্রহণ করিবে আর তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবে।"[১]

হাদীছ পাকে বর্ণিত হয়েছে, সা'দ (রা) ওপরে বর্ণিত রায় ঘোষণা করলে নবী করীম (সা) বলেন, তুমি আসমানী ফয়সালা করেছ।[২] এটি ছিল তওরাতের নির্দেশের দিকেই ইশারা। আর ইয়াহূদীদেরকে যখন এই নির্দেশ শোনানো হলো তখন তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেই উক্তি বেরিয়ে এসেছিল, তা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা নিজেরাও এই ফয়সালাকে আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক মনে করত।

হুই ইবন আখতাব, যে ছিল এই গোটা ফেতনার মূল নায়ক-কে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয় তখন সে নবী করীম (সা)-এর দিকে চোখ তুলে দেখেছিল এবং বলেছিল ঃ اما و الله ما لمت نفسى فى عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ـ

"হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছি, এজন্য আমার মনে কোন আফসোস নেই। কথা কেবল এতটুকু, যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ও তাকে পরিত্যাগ করেন।"

এরপর সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বলে,

ايهاالناس انه لا بأس بامر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى اسرائيل ـ

"আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে কোন ক্ষতি নেই। এটা ছিল আল্লাহ্র হুকুম যা লিখিত হয়েছিল, পূর্ব নির্ধারিত একটি শাস্তি যা আল্লাহ পাক বনূ ইসরাঈলের ভাগ্যে লিখে দিয়েছিলেন।"[৩]

হুই ইবনে আখতাবের এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যখন সে নির্বাসনে খায়বার অভিমুখে যাচ্ছিল তখন সে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, নবী করীম (সা)-এর বিরোধিতায় সে কাউকে সাহায্য করবে না। এই চুক্তির বেলায় সে আল্লাহকে যামিন বানিয়েছিল। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় সে এই চুক্তির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিল সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা দেখে এসেছি।

সারিয়্যা নজ্দ ও ছুমামার ইসলাম গ্রহণ

নবী করীম (সা) কিছু সংখ্যক অশ্বারোহীকে নজ্দ অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যাবর্তন কালে (বনী হানীফার সর্দার) ছুমামা ইবনে উছালকে

১. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানীকৃত, ১ম খণ্ড, ৪৩৫ পৃ. তওরাতের বরাতে। ২. বুখারী।
৩. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৪১ পৃ.।

বন্দী করে নিয়ে আসে। তাঁরা তাকে নিয়ে এসে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। নবী করীম (সা) সেখান দিয়ে অতিক্রম কালে ছুমামাকে জিজ্ঞেস করেন, ছুমামা! তোমার খবর কি? ছুমামা বলেন, মুহাম্মদ (সা)! আমার খবর ভাল। আপনি যদি আমাকে হত্যার হুকুম দেন তাহলে এই হুকুম একজন খুনীর অনুকূলে যাবে। আর আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন এবং সদয় ব্যবহার করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর বদান্যতা ও করুণা প্রকাশ করা হবে। আর যদি ধন-সম্পদের প্রয়োজন থাকে তবে বলুন (আপনি তাও পাবেন)।

দ্বিতীয় দিনেও নবী করীম (সা) ছুমামাকে পুনরায় সেই একই কথা জিজ্ঞেস করেন। ছুমামা বললেন, আমি বলেছি, আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহলে তা একজন কৃতজ্ঞ বান্দার ওপর করবেন।

তৃতীয় দিনেও নবী করীম (সা) ছুমামাকে পুনরায় সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। ছুমামা প্রত্যুত্তরে বলেন, আমি আমার জওয়াব দিয়েছি। নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন ছুমামাকে ছেড়ে দিতে। ছুমামা মুক্তি পেতেই কাছেই একটি খেজুর বাগানে গেলেন। বাগানটি মসজিদে নববীর কাছেই ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি গোসল করলেন। এরপর মসজিদে নববীতে ফিরে এসে কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ছুমামা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কসম আল্লাহ্র, সারা দুনিয়ায় আপনার থেকে বেশি আমার আর কারও প্রতি ঘৃণা ছিল না। কিন্তু এখন তো সারা জগতে আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয়।

"আপনার শহর আমার কাছে সবচে' বেশি ঘৃণার ছিল। কিন্তু কসম আল্লাহ্র! আজ সেই শহর আমার কাছে সব চাইতে পছন্দনীয় মনে হচ্ছে। আল্লাহ্র কসম! আপনার দীন, আপনার ধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম আমার কাছে এত বেশি বিদ্বেষময় ছিল না। কিন্তু আজ আপনার দীনই আমার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে গেছে!"

ছুমামা আরও বলেছিলেন, আমি আমার বাড়ি ছেড়ে মক্কা পানে ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে বন্দী করা হয়। এখন ওমরাহ আদায়ের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? নবী করীম (সা) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য সুসংবাদ দেন এবং ওমরাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

ছুমামা মক্কা পৌঁছুলে সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে বলল, তুমি কি সাবী (বেদীন) হয়ে গেছ? ছুমামা বলেন, না, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওপর ঈমান এনেছি এবং ইসলাম কবুল করেছি। এখন থেকে মনে রেখো, ইয়ামামা থেকে তোমাদের কাছে গমের আর একটি দানাও আসবে না যতক্ষণ না নবী করীম (সা) এর অনুমতি দেন।[১]

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার; সহীহ বুখারীতেও সংক্ষেপে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ছুমামা দেশে ফিরতেই মক্কার দিকে খাদ্যশস্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন। খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ হতেই মক্কার লোকেরা ভয়ে চীৎকার দিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারস্থ হলে তিনি ছুমামাকে লিখে পাঠান, খাদ্যশস্য গমনাগমন ও ক্রয়-বিক্রয় পূর্বের মতই চলতে দাও।[১] এ সময় মক্কার লোকেরা ছিল নবী করীম (সা)-এর জানী দুশমন। কিন্তু এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সা) কিভাবে একজনের জীবন রক্ষা করেন যে নিজেও নিজেকে হত্যার যোগ্য মনে করত। এটাই কেবল প্রমাণিত হয় নি যে, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র অবস্থা ও আখলাক-আচরণের কেমন গভীর প্রভাব লোকের ওপর পড়ত যে, ছুমামার মত মানুষ, যে ইসলাম ও মদীনার প্রতি, সর্বোপরি নবী করীম (সা)-এর প্রতি কত কঠিন শত্রুতা পোষণ করত, মাত্র তিন দিন পর সন্তুষ্ট চিত্তে নিজে থেকেই মুসলমান হয়ে গেল।

বরং নবী করীম (সা.)-এর সততা ও ব্যক্তিসত্তার পবিত্রতা ও রহমদিল্ হবার এ থেকেও প্রমাণ মেলে যে, মক্কার যেসব অবিশ্বাসী কাফির নবী করীম (সা)-কে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল এবং বদর, ওহুদ ও খন্দকে তখন পর্যন্ত নবী করীম (সা) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছিল, তাদের জন্য রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা) এটা পছন্দ করেন নি যে, তাদের কাছে খাদ্যশস্য প্রেরণে বাধা সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের জীবনকে সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ করে তুলে তাদেরকে বাধ্য ও অনুগত বানানো হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে নবী করীম (সা) তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের কথা মুসলমানদের শুনিয়ে বললেন, আমি দেখলাম, আমি ও মুসলমানদের মক্কায় পৌঁছে গেছি এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছি। নবী করীম (সা)-এর মুখে এই স্বপ্নের কথা শুনে অসহায় ও দেশ থেকে বিতাড়িত মুসলমানেরা এই আগ্রহ তাঁদেরকে অস্থির ও বেচঈন করে তোলে যে, তাঁদের দীর্ঘ দিনের লালিত ও পোষিত বায়তুল্লাহ তওয়াফের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং তাঁরা সে বছরই নবী করীম (সা)-কে মক্কা মুআজ্জমা সফরের জন্য উৎসাহী করে তুলতে সক্ষম হয়।[২]

যেহেতু সাধারণভাবে মুহাজিররা ও অধিকাংশ আনসার এই সৌভাগ্য লাভের অপেক্ষায় ছিলেন বিধায় ১৪০০ জন সাহাবী এই সফরে হুযূর আকরাম (সা)-এর সফর সঙ্গী হন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে কুরবানীর প্রথম দিককার প্রথাগুলো আদায় করা হয় অর্থাৎ কুরবানীর উট সাথেই ছিল। এসব উটের ঘাড়ে কুরবানীর আলামত হিসেবে লোহার জুতা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩]

---

১. বায়হাকীর দালাইলুন-নুবুওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮০ পৃ.।
২. সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৮৮ পৃ.।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গযওয়ায়ে হুদায়বিয়া শীর্ষক অধ্যায়।

সতর্কতার জন্য খোযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, যার ইসলাম গ্রহণের কথা কুরায়শরা জানত না, প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে করে সে কুরায়শদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে জেনে আসতে পারে। কাফেলা যখন উসফান নামক স্থানের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুল তখন সে এসে খবর দিল, কুরায়শরা সকল শাখা-প্রশাখা ও গোত্র (আহাবীশ) একত্র করে বলে দিয়েছে, মুহাম্মদ (সা) কখনোই মক্কায় আসতে পারবে না, তাঁকে আসতে দেওয়া হবে না।[১]

মোটকথা, কুরায়শরা বিরাট জোরেশোরে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ গোত্রগুলোর কাছে পয়গাম পাঠানো হয়, তারা যেন বিরাট বাহিনী যোগে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। মক্কার বাইরে বালদাহ্ নামক স্থানে ফৌজ সমবেত হয়। খালিদ ইবন ওয়ালীদ, যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি, দু'শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে অগ্রসর হন এবং গামীম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। গামীম রাবিগ ও জুহফার মাঝখানে অবস্থিত। উল্লেখ্য, এ বাহিনীতে আবূ জেহেল পুত্র ইকরিমাও ছিল।[২]

নবী করীম (সা) বললেন, কুরায়শরা খালিদকে অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক করে পাঠিয়েছে এবং সে গামীম পর্যন্ত এসে গেছে। অতএব, তোমরা পাশ কেটে তাকে এড়িয়ে ডান দিকে চল। মুসলিম বাহিনী যখন গামীমের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল তখন খালিদ অশ্বখুরের আঘাতে উত্থিত ধুলোবালি উড়তে দেখতে পান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে কুরায়শদের খবর দেন, মুসলিম বাহিনী গামীম পর্যন্ত এসে গেছে।

নবী করীম (সা) সামনে অগ্রসর হন এবং হুদায়বিয়ায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে পানির স্বল্পতা ছিল। একটি কুয়া ছিল। পয়লা চোটেই এতে যেটুকু পানি ছিল তা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর মু'জিযার বরকতে এতে এতটা পানি দেখা দেয় যে, বাহিনীর সকল সদস্যই কেবল নয়, উট ও ঘোড়াও পানি পান করে তৃপ্ত হয়ে যায়।[৩]

খোযা'আ গোত্র তখনও ইসলাম কবুল করে নি বটে, কিন্তু ইসলামের মিত্র ছিল। মুসলমানদের গোপন বিষয়াদির ব্যাপারেও ছিল তারা রক্ষক। কুরায়শ ও সাধারণ কাফির মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব পরিকল্পনা আঁটত তারা সব সময় সেগুলো নবী করীম (সা) কে জানিয়ে দিত। এই গোত্রের সর্দার ছিলেন বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা' (মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম কবুল

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী গযওয়ায়ে হুদায়বিয়া শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৪৯ পৃ.।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গযওয়ায়ে হুদায়বিয়া অধ্যায়।

করেন)। তিনি নবী করীম (সা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ দরবারে নববীতে হাযির হন এবং বলেন, কুরায়শদের বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসছে। তারা আপনাকে কা'বায় যেতে দেবে না। নবী করীম (সা) তাকে বললেন, "আপনি গিয়ে কুরায়শদেরকে বলুন যে, আমরা ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশে এসেছি, লড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধ কুরায়শদের অবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে এবং তারাই এর ফলে সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমঝোতামূলক সন্ধি করাই তাদের জন্য উত্তম হবে এবং আমাকে তারা আরববাসীদের হাতে ছেড়ে দিক। যদি তারা এতে রাযী না হয় তাহলে সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়ব যতক্ষণ না আমার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র যা ফয়সালা করার তা করেন।"

বুদায়ল কুরায়শদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে একটি বার্তা বহন করে এনেছি। অনুমতি দিলে বলতে পারি।" একথা বলতেই কতক দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে উঠল, মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শোনার কোন দরকার নেই। কিন্তু কয়েকজন সমঝদার লোক অনুমতি দিল। বুদায়ল তখন মহানবী (সা)-র উত্থাপিত শর্তসমূহ পেশ করলেন। ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী উঠে বললেন, কী কুরায়শরা! আমি কি তোমাদের পিতা এবং তোমরা কি আমার সন্তান নও? তারা বলল, হ্যাঁ। ওরওয়া বললেন, আমার সম্পর্কে তোমাদের কোন খারাপ ধারণা তো নেই? সকলেই বলল, না, নেই। ওরওয়া বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা আমাকে অনুমতি দাও। আমি নিজে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি এবং একটা ফয়সালা করি। মুহাম্মদ (সা) একটা যুক্তিসঙ্গত শর্ত পেশ করেছে। মোটের ওপর ওরওয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এলেন, কুরায়শদের বার্তা শোনালেন এবং বললেন, মুহাম্মদ (সা)! ধরে নাও, তুমি কুরায়শদের সমূলে বিনাশ করলে, উৎসাদন করলে! তাহলে কি এ ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত মিলবে যে, কেউ তার নিজের কওমকে এভাবে ধ্বংস ও বরবাদ করেছে? এছাড়া যদি যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় তখন তোমার সাথে এই যে সব লোক জমায়েত দেখতে পাচ্ছ, সব ধুলোর মত উড়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা) তার এসব অসংযত কথায় দারুণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে গালি দিয়ে বলেন, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? ওরওয়া নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? তিনি বললেন, ইনি আবূ বকর (রা)। ওরওয়া বললেন, আমি তাঁর এই রূঢ় ভাষার জওয়াব দিতাম। কিন্তু কি করব, তাঁর একটি অনুগ্রহ আমার ওপর আছে আজও পর্যন্ত যার বিনিময় আমি দিতে পারি নি।[১]

১. পুরো বর্ণনা সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান।

ওরওয়া নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে কোনরূপ ভনিতা ছাড়াই সহজ সরলভাবে কথা বলছিলেন এবং আরবদের নিয়ম মাফিক কথা বলতে বলতে যার সঙ্গে কথা বলা হয় তার দাড়ি ধরে, তেমনি তিনি হুযূর আকরাম (সা)-এর দাড়ি মুবারকে হাত দিচ্ছিলেন। মুগীরা ইবন শু'বা (রা) অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ওরওয়ার এই দুঃসাহস মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি ওরওয়াকে বললেন, নিজেকে সরিয়ে নাও। এরপর পুনরায় হাত অগ্রসর হলে কিন্তু তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। ওরওয়া মুগীরাকে চিনলেন এবং বললেন, 'দাগাবাজ! তোমার দাগাবাজির ব্যাপারে আমি কি তোমার কাজ করেছি না'? (হয়েছিল কি, মুগীরা ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে কয়েকজন মানুষ হত্যা করেছিলেন যেসবের রক্তপণ ওরওয়া নিজের পকেট থেকে আদায় করেছিলেন।[১] ওরওয়া সেই ব্যাপারেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন)।

ওরওয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের বিস্ময়কর ভক্তি-শ্রদ্ধার যেই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলেন তা তার দিলের ওপর গভীর ও আশ্চর্যজনক প্রভাব ফেলে। তিনি কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেন, আমি রোম সম্রাট কাইজার, পারস্য সম্রাট কিসরা ও ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু মুহাম্মদকে তাঁর সাথীরা যেভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে তা আর কোথাও আমি দেখি নি। মুহাম্মদ (সা) কথা বলতে শুরু করলে চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়। সবাই গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনতে থাকে। কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে চায় না। ওযূ করতে গেলে যে পানি গড়িয়ে পড়ে তার ওপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। থু থু ফেললে ভক্তের দল তা হাতে নিয়ে হাতে ও চেহারায় মেখে নেয়।[২]

যেহেতু ব্যাপারটার কোন সুরাহা না হওয়ায় তা অসম্পূর্ণ থেকে যায় বিধায় নবী করীম (সা) সাহাবী খিরাশ-(রা) ইব্ন উমায়্যাকে কুরায়শদের কাছে পাঠান। খিরাশ (রা) স্বয়ং রসূল আকরাম (সা)-এর উটের পিঠে চড়ে গিয়েছিলেন। কুরায়শরা সেই উটটিকেই মেরে ফেলে এবং তাঁকেও মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু গোত্রীয় জোটের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান এবং কোনক্রমে নিজের জান বাঁচিয়ে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসতে সক্ষম হন।[৩]

এরপর কুরায়শরা মুসলমানদের ওপর হামলা করতে সৈন্য পাঠায়। কিন্তু এরা সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মোটের ওপর কুরায়শরা শয়তানীর কোন

১. বুখারী।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত।
৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃ.; মুসনাদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৪ পৃ.।

চেষ্টাই বাকী রাখে নি। কিন্তু রহমতে আলম (সা) ক্ষমার ক্ষেত্রে ছিলেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, তুলনাহীন। তিনি তাদের সকলকেই মুক্ত করে দেন, ক্ষমা করে দেন।[১] কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ -

"তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কায় ঐসব লোকের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, এরপর যে তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করেছিলেন।" [সূরা আল-ফাত্হ]

বায়'আতু'র-রিদওয়ান

পরিশেষে তিনি সন্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য হযরত ওমর (রা)-কে নির্বাচিত করলেন। কিন্তু তিনি (হযরত ওমর) এই বলে ওযর পেশ করলেন, কুরায়শরা আমার কঠোরতম দুশমন আর মক্কায় আমার গোত্রের এমন একজনও নেই যে আমাকে (বিপদে) বাঁচাতে পারে। এরপর তিনি হযরত উছমান (রা)-কে পাঠান। তিনি (হযরত উছমান) তাঁর এক আত্মীয়ের (আবান ইবন সাঈদ-এর) সাহায্য করতে মক্কায় গমন করেন এবং কুরায়শদেরকে নবী করীম (সা)-এর বার্তা পৌঁছে দেন। কুরায়শরা তাঁকে নজরবন্দী করে। কিন্তু সাধারণ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উছমান (রা)-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।[২]

এ দিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ও নবী করীম (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছুতেই তিনি বলেন, উছমান (রা)-এর রক্তের বদলা গ্রহণ করা আমাদের জন্য ফরয, এই বলে তিনি একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসে সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে আত্মোৎসর্গের বায়'আত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা), নারী-পুরুষ সকলেই যার মধ্যে শামিল ছিলেন, অত্যন্ত সোৎসাহে নবী করীম (সা)-এর হস্ত মুবারকের ওপর নিজেদের জীবন উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল এক অনন্যসাধারণ ও শানদার ঘটনা। এই বায়'আতকেই বায়'আতুর-রিদওয়ান বলা হয়। সূরা ফাত্হ-এ এই ঘটনা ও যে বৃক্ষের নিচে এই বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় সেই বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا -

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুশ-শুরূত।
২. মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৪ পৃ. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩১৪-৩১৫ পৃ.।

"আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট যখন তারা তোমার হাতের ওপর গাছের নিচে বায়'আত করছিল। অনন্তর আল্লাহ জেনে গেছেন যা কিছু তাদের দিলে ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ওপর সাকীনা (প্রশান্তি, তৃপ্তি) নাযিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দান করলেন।"

কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গেল, হযরত উছমান (রা)-এর শাহাদতের খবর সঠিক ছিল না।[১]

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো

অবশেষে কুরায়শরা সুহায়ল ইবন আমরকে দূত বানিয়ে মহানবী (সা)-র দরবারে পাঠাল। সুহায়ল ছিল কুরায়শদের মধ্যে অত্যন্ত বাগ্মী ও ক্ষুরধার বক্তা। ফলে কুরায়শরা তাকে "খতীবে কুরায়শ" (কুরায়শদের বাগ্মী) উপাধি দিয়েছিল।[২] কুরায়শরা তাকে বলে দিয়েছিল, সন্ধি কেবল এই শর্তে হতে পারে, মুহাম্মদ (সা)-কে এবার ফিরে যেতে হবে।

সুহায়ল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হলো এবং দীর্ঘ সময় ধরে সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে কতিপয় শর্তের ওপর উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছে এবং নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে সন্ধির শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী চুক্তির শুরুতেই শিরোনামে بسم الله الرحمن الرحيم লিখেন। প্রাচীন কাল থেকে আরবের নিয়ম ছিল, তারা পত্রের শিরোনামে باسمك اللهم লিখত। بسم الله الرحمن الرحيم এর ব্যাপারে তারা অপরিচিত ছিল। ফলে সুহায়ল ইবন আমর বলল, بسم الله الرحمن الرحيم-এর পরিবর্তে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নিয়ম মাফিক باسمك اللهم লিখিত হোক। নবী করীম (সা) তার কথা মেনে নিলেন। পরবর্তী বাক্য ছিল هذا ما قضى عليه محمد رسول الله এ সেই চুক্তি যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করেছেন। সুহায়ল পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করে বলল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসূল হিসাবেই মেনে নিতাম তাহলে আর এসব লড়াই-ঝগড়া কেন? আপনি কেবল আপনার নাম ও আপনার পিতার নাম লিখুন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা যতই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র রসূল। এই বলে তিনি হযরত আলী (রা)-কে হুকুম করলেন, আচ্ছা, তুমি কেবল আমার নামই লেখ। হযরত আলী (রা)-র থেকে অধিক অনুগত ও আল্লাহ্র রসূলের নির্দেশ মান্যকারী আর কে হতে পারতেন? কিন্তু

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ. ৩১৬ পৃ. বুখারী ও মুসলিম শরীফেও সংক্ষেপে বায়'আতের আলোচনা রয়েছে।
২. যুরকানী, ২য় খণ্ড, ২২৩ পৃ.।

ভালবাসার ময়দানে এমন ক্ষেত্রও এসে হাযির হয় যেখানে নির্দেশ পালনকে অস্বীকারও করতে হয়। এমনই এক অবস্থায় তিনি বলেন, আমি আপনার নাম থেকে رسول الله শব্দটি মুছে ফেলতে পারব না। তখন নবী করীম (সা) বললেন, আচ্ছা, আমার নাম কোথায় দেখিয়ে দাও। হযরত আলী (রা) সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিলে তিনি رسول الله শব্দটি মুছে দিলেন।

সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে।

২। আগামী বছর আসবে এবং কেবল তিনদিন অবস্থান করে চলে যাবে।

৩। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসবে না। কেবল আত্মরক্ষার্থে তলোয়ার সাথে আনবে আর তাও থাকবে কোষবদ্ধ অবস্থায় এবং কোষ থাকবে থলিতে আবদ্ধ।

৪। আগে থেকেই যেসব মুসলমান মক্কায় আছে তাদের মধ্যে কাউকেই আপনি সাথে নেবেন না এবং মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় আপনি তাকে বাধা দেবেন না।

৫। কাফির কিংবা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ যদি মদীনায় যায় তাহলে তাকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে মুসলমানদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে না।

৬। আরবের যে কোন গোত্র উভয় পক্ষের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছুক সন্ধিবদ্ধ হতে পারবে।[১]

মুসলমানদের কঠিন পরীক্ষা

এসব শর্ত বাহ্যত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল। এরপরও এসব শর্তের ভিত্তিতে যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল আকস্মিকভাবে ঠিক সেই মুহূর্তে কুরায়শ প্রতিনিধি সুহায়ল ইবন 'আমর পুত্র আবূ জান্দাল, যিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মক্কায় কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন এবং নানা প্রকার নির্যাতন ভোগ করছিলেন, কোনক্রমে পালিয়ে মুসলিম শিবিরে এসে উপস্থিত হন। তখন তাঁর পায়ে বেড়ি ছিল। তিনি সবার সামনে এসে গড়িয়ে পড়লেন। সুহায়ল বলে উঠল, "মুহাম্মদ! সন্ধি শর্ত পালনে তোমরা কতটা আন্তরিক তা প্রমাণের প্রথম সুযোগ এই। সন্ধির শর্ত মুতাবিক একে (আবূ জান্দালকে) আমায় সোপর্দ করুন! তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।" নবী করীম (সা) তখন তাকে বললেন, এখনও তো সন্ধিপত্র লিখিত হয় নি। সুহায়ল বলল, তাহলে আর আমরা এই সন্ধিও চাই না। একথা শুনতেই

১. বুখারী, কিতাবুশ-শুরূত, شروط فى الجهاد শীর্ষক অধ্যায়; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি শীর্ষক অধ্যায়।

নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে। সে এখানেই থাকবে। অবশ্য আবূ জান্দালকে রাখার ব্যাপারে তিনি অনুরোধ-উপরোধ ও পীড়াপীড়ি করাসহ কোন কিছুই বাদ রাখেন নি। কিন্তু সুহায়ল একটিতেও সম্মত না হওয়ায় নবী করীম (সা) বাধ্য হয়ে বৃহত্তর শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে তার কথা মেনে নেন। আবূ জান্দাল (রা)-কে কাফিররা এত মেরেছিল যে, তাঁর সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁর শরীরের ক্ষতস্থানগুলো দেখালেন এবং বললেন, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! এরপর আবারও আপনারা আমাকে এই অবস্থায় দেখতে চান? আমি ইসলাম কবুল করেছি। এরপরও তোমরা আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিচ্ছ? আবূ জান্দালের এই সকাতর আর্তনাদ শুনে মুসলমানরা বেচঈন হয়ে পড়েন। হযরত ওমর (রা) আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আবারও বললেন, আমরা কি সত্যের ওপর নই? রসূল (সা) বললেন, অবশ্যই আমরা সত্যের ওপর। হযরত ওমর (রা) পুনরায় বললেন, তাহলে আমরা সত্য দীনের ওপর থেকেও কেন এই অপমানজনক চুক্তি বরদাশত করব, মেনে নেব? তিনি একথা শুনতেই ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহ্র পয়গম্বর। আর আমি আল্লাহ্র হুকুমের নাফরমানী করতে পারি না। আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন। হযরত ওমর (রা) এবার বললেন, আপনি কি আমাদেরকে বলেন নি, আমরা কা'বা ঘরের তওয়াফ করব। এতে নবী করীম (সা) বললেন, কিন্তু আমি তো একথা বলিনি আমরা এ বছরই তওয়াফ করব। হযরত ওমর (রা) এরপর উঠে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকেও ঐ একই কথা বললেন। হযরত আবূ বকর (রা) ও সেই একই জওয়াব দিলেন এবং এও বললেন, ওমর! তিনি আল্লাহ্র রসূল। তিনি যা কিছুই করেন আল্লাহ্র হুকুমেই করেন।[১]

পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা) সারা জীবনই তাঁর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে সংঘটিত হয়েছিল। এর কাফফারা হিসাবে তিনি নফল সালাত আদায় করতেন, সিয়াম পালন করতেন, দান-খয়রাত করতেন, দাস মুক্ত করতেন। বুখারী শরীফে যদিও ইমাম বুখারী তাঁর সমূহ আমলের কথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে ইসহাক এগুলো বিস্তারিতভাবে তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[২]

উল্লিখিত অবস্থা মেনে নেওয়া সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর তাঁদের প্রিয় নবী (সা)-র আনুগত্যের ব্যাপারে এক বিরাট কঠিন পরীক্ষা ছিল। একদিকে ইসলামের

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুশ-শুরূত; ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩১৭।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হুদায়বিয়ার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

অবমাননা, অন্যদিকে লৌহ শৃঙ্খল পরিহিত আবূ জান্দাল ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী চৌদ্দ শ' সাহাবীর কাছে সকাতর আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। সকলের দিল্ আবেগে উদ্বেলিত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামান্য ইঙ্গিত পেলেই চূড়ান্ত ফয়সালার নিমিত্ত চৌদ্দ শত নাঙা তলোয়ার ঝলসে ওঠার জন্য প্রস্তুত। অপরদিকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেছে। এক্ষণে সন্ধি শর্তসমূহ পালনের যিম্মাদারী। আল্লাহ্র রসূল (সা) আবূ জান্দালের দিকে তাকালেন, তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, يا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا انا قد عقدنا صلحا وانا لا نغدر هم ـ

"হে আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য ও তোমার সাথী মজলুমদের জন্য কোন রাস্তা নিশ্চয় বের করবেন। এখন সন্ধি চুক্তি হয়ে গেছে। আর আমরা তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভাঙতে পারি না।"[১]

নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন, এরা উপস্থিত সবাই এখানেই কুরবানী করবে। কিন্তু সাহাবীদের মন এতটাই ভেঙে গিয়েছিল যে, কুরবানীর জন্য একজনও দাঁড়ায় নি। এমন কি সহীহ বুখারীর বর্ণনা মুতাবিক তিনবার বলার পরও একজনও কুরবানীর জন্য এগিয়ে যায় নি।[২] শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের মাঝ থেকে উঠে গেলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-র কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, আপনি আর কাউকেই কিছু বলবেন না, বরং বাইরে গিয়ে নিজেই কুরবানী করুন এবং এহ্রাম খুলে ফেলুন মাথা মুড়িয়ে। সে মাফিক তিনি বাইরে এসে নিজেই কুরবানী করলেন এবং এহরাম খোলার জন্য মস্তক মুণ্ডন করলেন। এরপর লোকের যখন নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেল, গৃহীত সিদ্ধান্তের আর নড়চড় হবে না, হবার নয়, তখন সকলে যে যার কুরবানী দিতে ও এহরাম খুলতে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল।[৩]

দৃশ্যত ব্যর্থতা কিন্তু বাস্তবে সফলতা

সন্ধির পর তিনি তিন দিন পর্যন্ত হুদায়বিয়ায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনায় রওয়ানা হন। পথিমধ্যে সূরা ফাতহ্ নাযিল হয়। বলা হয় انا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি তোমাকে সুস্পষ্ট ও অবধারিত বিজয় দান করেছি।" (সূরা ফাত্হ্) সমস্ত মুসলমান যে জিনিসকে পরাজয় ভাবছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাকেই বিজয় বলে অভিহিত করলেন। অতএব, হুযূর আকরাম (সা) হযরত ওমর (রা)-কে বললেন, দেখ, আমার ওপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর

১. মুসনাদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৫; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩১৮। ০
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হুদায়বিয়ার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুশ-শুরূত الشروط في الجهاد শীর্ষক অধ্যায়।

(রা) আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ-কি বিজয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এরপর হযরত ওমর (রা) সান্ত্বনা পেলেন এবং তৃপ্ত হলেন।[১] পরবর্তীকালের ঘটনা তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিররা পরস্পরে মেলামেশা করত না। এখন সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় উভয়ের মাঝে যাতায়াত শুরু হলো এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরুন কাফিররাও মদীনায় আসত, অনেক সময় মাসের পর মাস অবস্থান করত এবং মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা-বসা ও মেলামেশা করত। কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতো। এরই সাথে প্রত্যেক মুসলমান ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, উত্তম কর্ম, সৎকাজ, পাক-পবিত্রতা, উত্তম আখলাক ও আচার-আচরণের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। যে মুসলমান মক্কায় যেতেন তাঁদের বাহ্যিক বেশভূষায় ও আচার-আচরণে এমনতরো দৃশ্যই তুলে ধরতেন। এসবের ফলে কাফিররা নিজের থেকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতো।[২] ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর থেকে নিয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান হয় যা এর আগে আর কখনো হয়নি।[৩] সিরিয়া বিজেতা হযরত খালিদ (রা) ও মিসর বিজেতা হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা) এ সময় ইসলাম কবুল করেন।[৪]

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেসব মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাবে তাদের মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এই শর্তের মধ্যে কেবল পুরুষরাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহিলারা এর অন্তর্গত ছিল না। মহিলাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৫]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوْا اِذَاجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ...
وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের কাছে যখন মহিলা হিজরত করে আসে তখন তাদের পরীক্ষা করে নাও। আল্লাহ্ পাক তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার মুসলিম, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা ঐসব মহিলাদের জন্য যা ব্যয় করেছে তোমরা তাদেরকে তা ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে পার এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হুদায়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়; বুখারী, কিতাবুত- তাফসীর।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩০৯।
৩. দালাইলুন-নুবূওয়াত, ৪৯ খণ্ড, ১৬০ পৃ.।
৪. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৫৯ পৃ.।
৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, باب الشرط فى الجهاد

দেন-মোহর দেবে। আর তোমরা অবিশ্বাসী কাফির মহিলাদের নিজেদের বিবাহাধীন রাখবে না।"

যেসব মুসলমান বাধ্য হয়ে মক্কায় থেকে গিয়েছিল, কাফিররা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকায় তারা পালিয়ে মদীনায় চলে আসত। সর্বপ্রথম সাহাবী ওৎবা ইবন উসায়দ (আবূ বসীর) পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। নবী করীম (সা) ওৎবাকে ডেকে বলেন, তুমি ফিরে যাও। ওৎবা বললেন, আপনি কি আমাকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চান যারা আমাকে কুফর গ্রহণে বাধ্য করবে। নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তোমার জন্য কোন রাস্তা খুলে দেবেন। ওৎবা বাধ্য হয়ে নিতান্তই অসহায় অবস্থায় কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁর এক সঙ্গীকে হত্যা করেন। অপর সঙ্গী কোনক্রমে জীবন বাঁচিয়ে মদীনায় এসে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে অভিযোগ করল। তার পেছনে পেছনে আবূ বসীর সেখানে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, আপনি সন্ধির শর্ত মুতাবিক আমাকে তো তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আর আমার ব্যাপারে আপনার কোন যিম্মাদারি নেই। এই বলে তিনি মদীনা ছেড়ে সমুদ্র তীরবর্তী যু মার্রার কাছাকাছি ঈস নামক স্থানে বসবাস করা শুরু করলেন। মক্কার অসহায় ও নির্যাতিত মুসলমানরা অতঃপর যখন জানতে পারল যে, তাদের মুক্তির একটি ঠিকানা মিলে গেছে তখন তারা লুকিয়ে ও চুপিসারে পালিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বেশ একটা সংঘবদ্ধ দল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এতটা শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় যে, কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা যারা এর পাশ দিয়ে সিরিয়া যেত, এই দলটি সে সব থামিয়ে কাফেলার মাল-সামান লুটে নিত আর এসব মাল-সামানই ছিল তাদের জীবিকার একমাত্র উপকরণ।

অতএব, কুরায়শরা বাধ্য হয়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে লিখে পাঠায়, আমরা সন্ধির সংশ্লিষ্ট ধারাটি তুলে নিচ্ছি। এখন থেকে মক্কার মুসলমানরা চাইলে মদীনায় যেতে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। তাদেরকে আর মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে না। অতঃপর নবী করীম (সা) ঈসে আশ্রিত মুসলমানদেরকে সেখান থেকে চলে আসার জন্য লিখলেন। আবূ বসীর এ সময় ইনতিকাল করায় অবশিষ্ট সকলে হযরত আবূ জান্দালের নেতৃত্বে মদীনায় ফিরে আসে এবং স্থায়ীভাবে সেখানে আবাস গ্রহণ করে। কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার রাস্তা আবার পূর্বের ন্যায় উন্মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে যায়।[১]

মহিলাদের মধ্যে মক্কার অন্যতম সর্দার উকবা ইবন আবী মুআয়ত-এর কন্যা উম্মু কুলছুম ইসলাম কবুল করেন ও হিজরত করে মদীনায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর মদীনা আগমনের সাথে সাথে তাঁর পেছনেই 'আম্মারা ও ওয়ালীদ নামক তাঁর

১. বুখারী, কিতাবুশ শুরূত।

দুই ভ্রাতাও এসে হাজির হয় এবং হুযূর আকরাম (সা) খেদমতে তাঁকে ফেরত দেবার দরখাস্ত পেশ করে। কিন্তু তিনি তাদের এই দরখাস্ত মঞ্জুর করেন নি।[১] তখন পর্যন্ত যেসব সাহাবার স্ত্রীরা মক্কায় থেকে গিয়েছিল এবং তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করে নি, সাহাবায়ে কিরাম সে সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন।[২]

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ তা'আলা বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এ বিজয় দেহের ছিল না, ছিল আত্মার, হৃদয়ের। ইসলামের প্রচারের জন্য প্রয়োজন ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার আর তা এই সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। এই সন্ধিকে স্বয়ং দুশমনই বিজয় মনে করত। কুরায়শ ও মুসলমানদের মধ্যে এ পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ হয়েছিল সামরিক দিক দিয়ে কুরায়শদের কাতারে সর্বত্রই খালিদ ইবন ওয়ালীদকে দেখা যেত এবং বিশিষ্টদের তালিকায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। জাহিলী যুগে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। ওহুদ যুদ্ধে কুরায়শদের হেরে যাওয়া যুদ্ধকে তিনিই সামলে একে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও অশ্বারোহী বাহিনীর তিনিই অধিনায়ক ছিলেন। অবশেষে কুরায়শদের এই বীর কেশরীও ইসলামের আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করতে সমর্থ হন নি।[৩]

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত খালিদ মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনা পানে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমর ইবনুল আস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় চলেছ হে খালিদ? ইসলাম গ্রহণ করতে চলেছি। আর কত দিন মিথ্যা মরীচিকার পেছনে.....? একথা শুনে আমর ইবনুল আস বলেন, আমারও সেই একই উদ্দেশ্য। এরপর দু'জনে একত্রে দরবারে নববীতে হাজির হন এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হন।[৪] অতঃপর এতদিন পর্যন্ত যে মেধা ও প্রতিভা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যয়িত হচ্ছিল এখন থেকে তা ইসলামের সেবায় উৎসর্গিকৃত হতে থাকল।

মক্কা বিজয়ের কালে হযরত খালিদ (রা) যখন একটি মুসলিম সেনা দলের অধিনায়ক হয়ে মহানবী (সা)-র সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন সে সময় নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করেন, কে যায়? লোকেরা জানায়, খালিদ। বললেন, আল্লাহ্‌র তলোয়ার।[৫]

মূতার যুদ্ধে যায়দ ইবন হারিছা, হযরত জাফর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন রওয়াহার শাহাদাতের পর হযরত খালিদ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক যখন পতাকা তুলে নেন কেবল তখনই মুসলমানরা বিপদমুক্ত হয়েছিল।

---

১. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, গযওয়া হুদায়বিয়া শীর্ষক অধ্যায়।
২. বুখারী, কিতাবুশ-শুরূত।
৩. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৭৩ পৃ.।
৪. আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, ৪১৮ পৃ.।
৫. সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল মুনাফিক।

খেলাফতে রাশেদার যুগে একজনের (খালিদের) হাতে হেরাক্লিয়াসের সিরিয়া এবং অপরজনের (আমর ইবনুল আসের) হাতে মিসর বিজিত হয়।[১]

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান ও গোত্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রদান

৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসের পয়লা তারিখ। নবী করীম (সা) আপন দূত মারফত বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটদের নামে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতসম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। যেই দূত যে দেশে কিংবা যেই জাতিগোষ্ঠীর কাছে পাঠানো হতো তিনি সে দেশের ও সে জাতির ভাষা জানতেন যাতে করে তিনি ভালভাবে ইসলামের প্রচার করতে পারেন।[২]

তখন পর্যন্ত নবী করীম (সা) কোন সীল-মোহর বানান নি। রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণের সময় এর আবশ্যকতা দেখা দেয়। অতএব, পত্রের ওপর সীল-মোহর মারার জন্য তা বানানো হয়। তিনি যেটা বানিয়েছিলেন সেটি ছিল রৌপ্যনির্মিত। তাতে তিন লাইনে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি লিখিত ছিল ঃ[৩]

محمد رسول الله

এসব পত্র দেখলে অবহিত হওয়া যায়, খ্রিস্টান বাদশাহদের নামে যেসব পত্র প্রেরিত হয়েছিল সে সব পত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাতে নিম্নোক্ত আয়াতটি লেখা হয়েছিল ঃ

يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"হে আহলে কিতাব! এসো আমরা এমন এক কথার ওপর একমত হই যা আমাদের ও তোমাদের ধর্মে একটি আর তা হলে আমরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কারও ইবাদত (উপাসনা) করব না এবং তাঁর সাথে অন্য কোন বস্তুকে শরীক করব না আর আমরা একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না আল্লাহ ছাড়া। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে বল, সাক্ষ্য দাও, আমরা মুসলমান"।

[সূরা আল-ইমরান, ৭ রুকূ]

এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সব দূতের অবস্থা লিপিবদ্ধ করছি ঃ

---

১. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৭৪ পৃ.।
২. তাবাকাত ইবন সা'দ, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃ.।
৩. বুখারী, কিতাবুল লিবাস।

আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশীর নামে প্রেরিত পত্র

আবিসিনিয়ার বাদশাহর নাম ছিল আসহাম ইবনুল জাবর এবং তাঁর উপাধি ছিল নাজাশী। আমর ইবনু উমায়্যা আদ-দামরী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্র মুবারক বাদশাহ নাজাশীর দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাদশাহ ছিলেন খ্রিস্টান।[১] তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে প্রেরিত পত্রের অনুবাদ এখানে পেশ করা হলো।

بسم الله الرحمن الرحيم

"এই পত্র আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী আসহামের বরাবর প্রেরিত হচ্ছে। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রথমেই আমি প্রশংসা বর্ণনা করছি যিনি মালিক, কুদ্দুস (পবিত্র), সালাম (শান্তি) মু'মিন (নিরাপত্তা বিধায়ক) ও মুহায়মিন (রক্ষক) এবং ঘোষণা দিচ্ছি যে, ঈসা ইব্ন মারয়াম আল্লাহ্র মাখলূক (সৃষ্ট বস্তু) এবং তাঁর হুকুম যা তিনি সতী-সাধ্বী ও পবিত্র মারয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে ঈসাকে গর্ভে ধারণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে তাঁর রূহ ও ফুৎকারের সাহায্যে তেমনিভাবে জন্ম দিয়েছিলেন যেভাবে হযরত আদম (আ) কে আপন কুদরতী হাত ও ফুৎকারের সাহায্যে সৃষ্টি করেছিলেন। এখন আমার আহ্বান এই যে, তুমি আল্লাহ্র ওপর যিনি একক ও শরীকবিহীন, ঈমান আন এবং সব সময় তাঁর আনুগত্য কর। আমার অনুসরণ কর এবং আমার শিক্ষা আন্তরিকভাবেই স্বীকার করে নাও। কেননা আমি আল্লাহ্র রসূল।

"আমি ঐ দেশে আমার চাচাতো ভাই জাফরকে একদল মুসলমানসহ পাঠিয়েছি। তাকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপদে থাকতে দিও। নাজাশী! তুমি অহংকার পরিত্যাগ কর। কেননা আমি তোমাকে ও তোমার দরবারীদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। দেখ, আমি তোমাকে আল্লাহ্র হুকুম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন উচিত হবে আমার উপদেশ মেনে নেওয়া। সত্য পথের-পথিকদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!"[২]

নাজাশী এই মুবারক ফরমান পেয়ে মুসলমান হয়ে যান এবং উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রেরণ করেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র খেদমতে নাজাশী আসহাম ইবনুল জাব্র-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র।

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৮৯ পৃ.।
২. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৩১-৩২ পৃ., যাদুর মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৮৯ পৃ.।

"হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক সেই আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ্ নেই এবং যিনি আমাকে ইসলাম দ্বারা পথ প্রদর্শন করেছেন। পর আরয এই যে, হুযূর (সা)-এর ফরমান আমার কাছে পৌঁছেছে। ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন, আসমান ও যমীনের আল্লাহ্‌র কসম, তিনি এর থেকে বিন্দুমাত্রও বেশি নন। তাঁর অবস্থানগত মর্যাদা তো তাই যা আপনি লিখেছেন। আমরা আপনার প্রদত্ত শিক্ষা (তা'লীম) শিখে নিয়েছি এবং আপনার চাচাতো ভাই ও অপরাপর মুসলমান আমার কাছে আরামেই আছে। আর আমি স্বীকার করছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল, সত্যবাদী ও সঠিক পথের অনুসারীদের সত্যবাদিতা ও সততা প্রকাশকারী। আমি আপনার কাছে বায়আত করছি। আমি আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে রায়'আত এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করেছি। আর আমি আমার সন্তান আরহাকে হুযূর (সা)-এর খেদমতে পাঠাচ্ছি। আমি কেবল আমার নফসের মালিক। হুযূর (সা) যদি চান আমি পবিত্র খেদমতে হাজির হই তাহলে আমি অবশ্যই হাজির হব। কেননা আমি নিশ্চিতই বিশ্বাস করি আপনি যা বলেন তা সত্য। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার ওপর সালাম বর্ষিত হোক।"[১]

বাহ্‌বায়নের বাদশাহ্‌র নামে পত্র

মুনযির ইবন সাবী ছিলেন বাহ্‌রায়নের বাদশাহ। তিনি ছিলেন পারস্য সম্রাটের করদ রাজা। আ'লা ইবনুল হাদরামী (রা) তাঁর কাছে রসূল (সা)-এর লিপি মুবারক নিয়ে গিয়েছিলেন। বাদশাহ ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যান এবং তাঁর প্রজাবর্গের অধিকাংশও মুসলমান হয়। পত্রের উত্তরে বাদশাহ লিখেছেন, কতক লোক তো ইসলাম খুব পছন্দ করেছে। কেউ কেউ আবার অপছন্দও করেছে, কেউ বিরোধিতাও করেছে। আমার এলাকায় ইয়াহূদী ও অগ্নি উপাসক মজূসী অনেক। এদের ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তা করা হবে।

উত্তরে নবী করীম (সা) লিখেছেন ঃ

ومن ينصح فلنفسه ومن رقام على يهودية اومجوسية فعليه الجزية ـ

"যে উপদেশ প্রদান করে সে তা নিজের জন্যই করে। যারা ইয়াহূদী ও অগ্নি উপাসকদের ধর্মের ওপর কায়েম থাকবে তারা জিযয়া প্রদান করবে।"[২]

---

১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৯০ পৃ.। নাজাশী ও পারস্য সম্রাটের কাছে পত্র প্রেরণের আলোচনা সহীহ মুসলিমে বর্তমান। কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার।

২. যাদুল-মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৯৩ পৃ; 'উয়ূনুল আছার, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃ.।

আম্মানের শাসনকর্তার নামে

জুলান্দীর দুই পুত্র জায়ফার ও 'আব্‌দ ছিলেন আম্মানের শাসক। এদের কাছে আমর (রা) ইবনুল আসকে পত্র দিয়ে পাঠানো হয়। হযরত আমর (রা) বলেন, আমি যখন আম্মান গিয়ে পৌঁছুলাম তখন প্রথমে আমি 'আব্‌দ-এর সাথে দেখা করলাম। উভয় ভ্রাতার মধ্যে তিনিই ছিলেন তুলনামূলকভাবে কোমল স্বভাবের ও মিষ্ট চরিত্রের। আমি তাঁকে বললাম, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রেরিত দূত। তুমি ও তোমার ভাইয়ের কাছে এসেছি।

'আব্‌দ বললেন, আমার ভাই বয়সে আমার বড় এবং তিনিই এদেশের বাদশাহ। আমি তোমাকে তাঁর খেদমতে পৌঁছে দেব। কিন্তু আগে তুমি আমাকে বল, তোমরা কোন্ জিনিসের দাওয়াত দিয়ে থাক?

আম্‌র ইবনুল আস বললেন, আমরা এক ও একক আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকি যাঁর কোন শরীক নেই। অধিকন্তু এই সাক্ষ্য প্রদানের দিকেও আহ্বান জানিয়ে থাকি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।

'আব্‌দ বললেন, আমর! তুমি তোমার কওমের সর্দার পুত্র। এখন বল, তোমার পিতা (এই আহ্বান শোনার পর) কী করেছিল? কেননা আমরা তাকে আমাদের নমুনা বা মডেল বানাতে পারি।

জওয়াবে আমর ইবনুল আস বললেন, তিনি মারা গেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর তিনি ঈমান আনেন নি। হায়! যদি তিনি ঈমান আনতেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করতেন! আমিও আমার পিতার মতের ওপরই ছিলাম। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হেদায়েত দান করলেন।

'আবদ ঃ তুমি কবে থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হলে?

আমর ইবনুল আস ঃ এই অল্প কিছুদিন হলো।

'আব্‌দ ঃ কোথায়?

আমর ঃ সম্রাট নাজাশীর দরবারে এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছেন।

আব্‌দ ঃ সেখানকার প্রজা সাধারণ সম্রাটের সাথে কেমন আচরণ করল?

আমর ঃ সম্রাট হিসাবে তাঁকেই বহাল রেখেছে এবং তারাও ইসলাম কবুল করেছে।

'আব্‌দ ঃ বিশপ-পাদ্রীরাও (বিস্ময়ের সুরে)?

আমর ঃ হ্যাঁ, তারাও।

'আবদ ঃ দেখ আমর! তুমি কি জান কী বলছ তুমি? মানুষের জন্য মিথ্যার চেয়ে বড় লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর কিছু নেই।

আমর ঃ আমি মিথ্যা বলি নি, আর ইসলাম ধর্মে মিথ্যা বলা অনুমোদিতও নয়।

'আবদ ঃ হেরাক্লিয়াস কী করলেন? তিনি কি সম্রাট নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানেন?

আমর ঃ হ্যাঁ, জানেন।

'আব্দ ঃ তুমি কীভাবে এমনটি বলতে পার?

আমর ঃ নাজাশী হেরাক্লিয়াসকে কর দিতেন। কিন্তু যেদিন থেকে ইসলাম কবুল করলেন বলে দিয়েছেন, এখন থেকে আর একটি পয়সা চাইলেও তিনি তা দেবেন না।

হেরাক্লিয়াস একথা জানতে পারেন। সম্রাটের ভাই ইয়ান্নাক একথা জেনে বলেছিল, সম্রাটের একজন নগণ্য গোলাম নাজাশী এখন কর দিতে অস্বীকার করছে এবং সম্রাট যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মও পরিত্যাগ করেছে। এতে হেরাক্লিয়াস বলেন, তাতে কী হয়েছে? সে নিজের জন্য একটি ধর্ম পছন্দ করেছে এবং তা কবুল করেছে। এতে আমার কী করার আছে? আল্লাহ্‌র কসম! সাম্রাজ্য হারাবার ভয় না থাকলে আমিও তাই করতাম যা নাজাশী করেছে।

'আবদ ঃ দেখ আমর! তুমি কী বলছ?

আমর ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি সত্যি কথাই বলছি।

'আব্দ ঃ আচ্ছা, এবার তুমি বল, তিনি কী করতে বলেন আর কী করতে নিষেধ করেন?

'আমর ঃ আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল্লার আনুগত্য করতে বলেন এবং গোনাহ থেকে ফিরে থাকতে বলেন। তিনি ব্যভিচার ও মদ পান করতে নিষেধ করেন। পাথর মূর্তি ও ক্রুশ কাষ্ঠের পূজা করতে নিষেধ করেন।

'আব্দ ঃ কত সুন্দর বিধান যার দিকে তিনি আহ্বান জানান। হায়! আমার ভাই যদি আমার মত গ্রহণ করেন তাহলে আমরা দু'জনেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে ঈমান আনতাম। আমি মনে করি আমার ভাই যদি অস্বীকার করেন এই পয়গাম এবং পার্থিব জগতের দিকে ঝোঁকেন তবে তা হবে আমাদের দেশের জন্য আগাগোড়া ক্ষতির কারণ।

আমর ঃ তিনি যদি ইসলাম কবুল করেন তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকেই এ দেশের বাদশাহ হিসাবে মেনে নেবেন। তিনি কেবল

এতটুকু করবেন যে, এখান থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করে এখানকার গরীব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।

আব্‌দ ঃ এতো খুব ভাল কথা! কিন্তু সাদাকা দ্বারা তুমি কী বোঝাচ্ছ?

আমর ইবনুল আস এরপর তাঁকে যাকাতের মসলা বললেন। যখন তাঁকে বললেন, উটের যাকাত আছে, তখন আব্‌দ বললেন, তিনি আমাদের পশুপালের থেকেও যাকাত দেবার জন্য বলবেন! তারা তো গাছের ঘাস-পাতা দিয়ে পেট ভরে আর নিজেরাই পানি পান করে।

আমর ঃ হ্যাঁ, উট থেকেও যাকাত নেওয়া হয়।

'আব্‌দ ঃ আমি জানি না আমার কওমের লোকেরা যারা সংখ্যায় বিপুল এবং দূর-দূরান্ত এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, তারা এই নির্দেশ মেনে নেবে।

মোটের ওপর আমর (রা) ইবনুল আস কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন। 'আব্‌দ প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু আপন ভাইয়ের কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করতেন। একদিন বাদশাহ আমর (রা) ইবনুল আসকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। প্রহরীরা (চোবদার) উভয় দিক থেকে তাঁর দু' বাহু ধরে তাঁকে বাদশাহ্‌র সামনে নিয়ে গেল। বাদশাহ তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য বললেন। প্রহরীরা ছেড়ে দিল। তিনি বসতে চাইলে প্রহরীরা তাঁকে বাধা দিল। তিনি বাদশাহর দিকে তাকালেন। বাদশাহ বললেন, এখন বল, তোমার কাজ কী? আমর (রা) ইবনুল আস বাদশাহকে পত্র হস্তান্তর করলেন। পত্র মোহরাংকিত ছিল।

জায়ফার মোহর ছিঁড়ে লেফাফার ভেতর থেকে পত্র বের করলেন। পড়লেন, এরপর ভাইকে দিলেন। তিনিও পড়লেন। আমর ইবন আস লক্ষ্য করলেন, ভাই বেশি নরম দিলের মানুষ।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়শদের হাল-অবস্থা কি?

আমর ইবনুল আস বললেন, সকলেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর (নবী করীম-এর) আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

বাদশাহ ঃ তাঁর সাথে যারা আছে তারা লোক হিসাবে কেমন?

আমর ঃ যারা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম কবুল করেছে তারা সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নবী করীম (সা)-কে গ্রহণ করেছে এবং পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নবী করীম (সা)-কে পরীক্ষা করে নিয়েছে।

বাদশাহ ঃ আচ্ছা, তুমি কাল আবার আমার সাথে দেখা করবে।

আমর (রা) ইবনুল আস পরদিন বাদশাহ্‌র ভাইয়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা করলেন। বাদশাহ্‌র ভাই (আব্‌দ) বললেন, যদি আমাদের হুকূমতের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে বাদশাহ মুসলমান হয়ে যাবেন।

আম্‌র ইবনুল আস আবার বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। বাদশাহ বললেন, আমি বিষয়টি নিয়ে খুব গভীরভাবে ভেবেছি। দেখ, আমি যদি এমন একজনের আনুগত্য গ্রহণ করি যার ফৌজ এখনও আমাদের দেশ পর্যন্ত এসে পৌঁছে নি তাহলে গোটা আরবে আমাকে দুর্বল মনে করা হবে। অথচ অবস্থা এই যে, যদি তাঁর ফৌজ এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তাহলে আমি এমন কঠিন যুদ্ধ করব যা তোমরা কখনও দেখনি।

আমর ইবনুল আস বললেন, বেশ ভাল। আমি কাল ফিরে যাব।

বাদশাহ বললেন, না, কাল পর্যন্ত থেকে যাও।

পরদিন বাদশাহ লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং দু'ভাই ইসলাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান হয়ে যান। প্রজাবর্গেরও অধিকাংশ ইসলাম কবুল করে।[১]

দামিশ্‌ক ও ইয়ামামার শাসনকর্তার নামে পত্র

মুনযির ইবন হারিছ ইবন আবূ শিম্‌র ছিল দামিশকের শাসনকর্তা ও সিরিয়ার গর্ভনর। শুজা' ইবন ওয়াহ্‌ব আল-আসাদী তাঁর কাছে দূত হিসাবে প্রেরিত হন। পত্র পাঠ অন্তে প্রথমে খুব ক্ষেপে যাওয়ার পর বলে, আমি নিজেই মদীনার ওপর হামলা করব। শেষে দূতকে সসম্মানেই বিদায় করে। কিন্তু মুসলমান হয় নি।[২]

ইয়ামামার শাসক হাওযাহ ইব্‌ন আলী ছিল খ্রিস্টান। সলীত ইবন আমর (রা) রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র পত্র নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন। হাওযাহ বলেছিল, ইসলাম কবুল করলে যদি অর্ধেক হুকূমত আমাকে দেওয়া হয় তাহলে রাজী আছি। এই উত্তর প্রদানের কিছু দিনের মধ্যেই সে মারা যায়।[৩]

আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের নামে পত্র

জুরায়জ ইবন মথি যার উপাধি ছিল মুকাওকিস, ছিলেন মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক। তিনি ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। হাতিব ইবন আবী বালতা'আ দূত হিসাবে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) পত্রের শেষে লিখে দিয়েছিলেন ঃ যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার কর তাহলে মিসরীয়দের (কপ্টিক খ্রিস্টানদের) মুসলমান না হবার গোনাহ তোমার ঘাড়েই এসে বর্তাবে।

দূত (হাতিব ইবন আবী বালতা'আ) পত্র পৌঁছানো ছাড়াও বাদশাহকে নিম্নোক্ত ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন ঃ

"রাজন! আপনার আগেও এ দেশে এমন একজন গুজরে গেছেন যিনি انا ربكم الاعلى (আমি তোমাদের সবচে' বড় খোদা) বলে ঘোষণা দিত। আল্লাহ

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৯৩-৯৬; নাসবুর রায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪২৩-২৪; উয়ূনুল আছার, ২য় খণ্ড, ২৬৭।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৯৭।
৩. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৬৯৬ পৃ., উয়ূনুল আছার, ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃ.।

পাক তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হলো তখন তার না দেশ থাকল যা ছিল তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎস। এজন্য আপনি অন্যের দিকে তাকান এবং সবক গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয় আপনার পরিণতি থেকে অন্যে সবক গ্রহণ করবে।"

বাদশাহ বললেন ঃ আমাদের নিজেদেরই একটি ধর্ম আছে। আমরা তা পরিত্যাগ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত এর থেকে কোন উত্তম ধর্মের সন্ধান আমরা না পাব। হাতিব (রা) বললেন, 'আমি আপনাকে এমন এক দীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি যা সকল ধর্মের মুকাবিলায় আপনার জন্য যথেষ্ট হবে। নবী করীম (সা) সকলকেই ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছেন। কুরায়শরা বিরোধিতা করেছে আর ইয়াহূদীরা করেছে শত্রুতা। কিন্তু প্রেম ও ভালবাসার দিক দিয়ে খ্রিস্টানরাই ইসলামের কাছাকাছি থেকেছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, মূসা (আ) যেভাবে ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি হযরত ঈসা (আ.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছিলেন। কুরআন মজীদের দাওয়াত আমরা আপনাকে দিচ্ছি যেভাবে আপনারা তৌরাতের অনুসারীদের ইনজীলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

'যে নবী যেই জাতির যুগ পেয়েছেন সেই জাতিকেই সেই নবীর উম্মত মনে করা হয়। এজন্য আপনার জন্য জরুরী এবং অবশ্য কর্তব্য সেই নবীর আনুগত্য করা যাঁর যুগ আপনি পেয়েছেন এবং আপনি এটা বুঝুন, আমরা আপনাকে হযরত ঈসা মসীহ্‌র ধর্মেরই দাওয়াত জানাচ্ছি।' মুকাওকিস বললেন, আমি এই নবী সম্পর্কে ভেবেছি। এখন পর্যন্ত আমি কোন আকর্ষণ বোধ করছি না। যদিও তিনি কোন মজাদার ও তৃপ্তিকর বস্তু নিষেধ করেন নি, বাধাও দেন না। আমি জানি, তিনি ক্ষতিকর কোন যাদুকর কিংবা মিথ্যাবাদী গণক নন। তাঁর ভেতর তো নবূওতের আলামতই পাওয়া যাচ্ছে। সে যা-ই হোক, আমি এ বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করব।

এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত পত্রটি হস্তিদন্ত নির্মিত ডিব্বায় রেখে সীল মোহর করে মুহাফিজখানায় রেখে দেন। মহানবী (সা)-র জন্য উপহার-উপঢৌকন পাঠান। পত্রের উত্তরে তিনি লিখেন ঃ আমার তো জানা আছে একজন নবীর আবির্ভাব বাকী আছে। কিন্তু আমি জানতাম সেই নবী সিরীয় ভূখণ্ডে আবির্ভূত হবেন। দুলদুল নামক বিখ্যাত খচ্চর তিনিই উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।[১]

১. যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড, ৬৯১; নাসবুর রায়া, ৪র্থ খণ্ড ৪২১-২২, পৃ; উয়ূনুল আছার, ২য় খণ্ড , ৬৬৫-৬৬ পৃ.।

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে পত্র

সম্রাট হেরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপল অথবা রোমক সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের খ্যাতনামা শাহানশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টান। দাহিয়া ইবনুল খলীফাতুল-কালবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্র তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বায়তুল মাকদিসে সম্রাটের সঙ্গে হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-র সাক্ষাত ঘটে। সম্রাট রসূল (স) প্রেরিত দূতের সম্মানে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের আয়োজন করেন এবং দূতকে একান্তে কাছে ডেকে নবী করীম (সা) সম্পর্কে নানাবিধ কথা জিজ্ঞেস করেন।

এরপর সম্রাট হেরাক্লিয়াস এ বিষয়ে অধিকতর খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করে নির্দেশ দিলেন, আমাদের এখানে মক্কার কোন লোক যদি এসে থাকে এবং তাকে যদি পাওয়া যায় তবে তাকে আমার সামনে পেশ কর।

ঘটনাক্রমে সে সময় কুরায়শ দলপতি আবূ সুফিয়ান কুরায়শ বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাকে বায়তুল মাকদিসে ডেকে পাঠানো হয় এবং সম্রাটের দরবারে হাজির করা হয়। হেরাক্লিয়াস সঙ্গী বণিকদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের দলপতি আবূ সুফিয়ানকে কিছু প্রশ্ন করব। তিনি যদি কোন ভুল জওয়াব দেন তবে আমাকে বলে দেবে।

আবূ সুফিয়ান সে সময় নবী করীম (সা)-এর জানী দুশমন ছিলেন। তিনি বলেন, আমার যদি এ ভয় না হতো যে, আমার সাথীরা আমার মিথ্যা প্রকাশ করে দেবে তাহলে আমি অনেক কিছুই বানিয়ে বলতাম। কিন্তু সে সময় আ..কে সম্রাটের সামনে (বাধ্য হয়ে নিরুপায় হয়ে) সত্যই বলতে হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ

সম্রাট ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ ও খান্দান কেমন?

আ. সু. ঃ ভদ্র ও শরীফ বংশের তিনি।

এতদ্শ্রবণে তিনি বলেন, সত্যিই নবীরা ভদ্র ও শরীফ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, যাতে করে তাঁর আনুগত্য করতে ও তাঁকে মেনে চলতে কেউ লজ্জা ও সংকোচ বোধ না করে।

সম্রাট ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে আরবে কেউ নবী হবার দাবি করেছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

জওয়াব শ্রবণে হেরাক্লিয়াস বলেন, যদি এমনটি হতো তাহলে আমি বুঝতাম তিনি পূর্বসূরীর অনুসরণ করছেন এবং এক্ষেত্রে তার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

সম্রাট ঃ নবী দাবি করার আগে কখনও কি তিনি মিথ্যা বলতেন? মিথ্যা বলার অপবাদ কি তাঁর ওপর এসেছে?

আ. সু. ঃ না।

জওয়াবে হেরাক্লিয়াস বলেন, এমনটি হতে পারে না যিনি কোন মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন।

সম্রাট ঃ তাঁর বাপ-দাদা কিংবা পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি কখনো বাদশাহ হয়েছেন?

আ. সু. ঃ না।

এই জওয়াবের প্রেক্ষিতে সম্রাট বললেন, যদি তা হতো তাহলে আমি বুঝতাম, নবুওত দাবির বাহানায় তিনি বাপ-দাদার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান।

সম্রাট ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি—সবল ও নেতৃস্থানীয়দের সংখ্যা, নাকি দুর্বল ও অসহায় গরীব জনগণের?

আ. সু. ঃ গরীব ও অধঃপতিত লোকজন।

হেরাক্লিয়াস প্রদত্ত জওয়াবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন, নবীদের প্রথম পর্যায়ের অনুসরণকারী গরীব ও নিঃস্ব অসহায় লোকেরাই হয়ে থাকে।

সম্রাট ঃ তাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাকি হ্রাস পাচ্ছে?

আ. সু ঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হেরাক্লিয়াস বললেন, ঈমানের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এমন কি এক পর্যায়ে তা পূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছে।

সম্রাট ঃ কোন লোক তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পর অসন্তুষ্ট কিংবা বেজার হয়ে আবার পূর্ব ধর্মে ফিরে গেছে?

আ. সু ঃ না।

হেরাক্লিয়াস বললেন, ঈমানী স্বাদের এটাই তাছীর যে, যখন তা দিলের গভীরে বসে যায়, তার রূহের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে নেয় তখন আর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না।

সম্রাট ঃ তিনি কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন বা করেছেন?

আ. সু. ঃ না, তবে এ বছর তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। দেখা যাক, এ ব্যাপারে তিনি কী করেন!

আবু সুফিয়ান বলেন, আমি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এই সুযোগে কেবল এই কথাটুকু বেশি বলতে পেরেছিলাম। কিন্তু সম্রাট তার এই অতিরিক্ত কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ

করেন নি। তিনি বললেন, অবশ্যই একজন নবী কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। দুনিয়াদার লোকেরাই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে থাকে। নবী দুনিয়া চান না, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী হন না।

সম্রাট ঃ নবুওতের দাবিদার লোকটির সাথে তোমাদের কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ, হয়েছে।

সম্রাট ঃ যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?

আ. স. ঃ কখনো তিনি জিতেছেন (যেমন বদরে), আবার কখনো আমরা জিতেছি (ওহুদে)। হেরাক্লিয়াস বললেন, আল্লাহ্‌র নবীদের ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তাঁরাই বিজয়ী হয়ে থাকেন।

সম্রাট ঃ তিনি কী শিক্ষা দিয়ে থাকেন?

আ. সু ঃ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, বাপ-দাদার প্রথা অনুকরণ করা (মূর্তিপূজা) ছেড়ে দাও, নামায-রোযা কর, সত্য কথা বল, চরিত্র ঠিক রাখ, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা কর ইত্যাদি।

হেরাক্লিয়াস বললেন, প্রতিশ্রুত নবীর এসব আলামতের কথাই আমাদেরকে বলা হয়েছে। আমি মনে করতাম, একজন নবী সত্বর আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু এ জানতাম না তিনি আরব দেশে আবির্ভূত হবেন। আবূ সুফিয়ান! যদি তুমি সত্য সত্য উত্তর দিয়ে থাক তাহলে একদিন তিনি এই জায়গা যেখানে আমি বসে আছি, সিরিয়া ও বায়তুল মাকদিস-এর অবশ্যই মালিক হবেন। হায়! আমি যদি তাঁর খেদমতে পৌঁছুতে পারতাম এবং নবী করীম (সা)-এর পা ধুয়ে দিতাম!

এরপর নবী করীম (সা)-এর লিপি মুবারক পড়া হলো। দরবারের সভাসদবর্গ পত্র শ্রবণে খুব চীৎকার ও হৈ চৈ করল এবং আমাদেরকে দরবার থেকে বের করে দিল। আমার মনে সেদিন থেকেই নিজের প্রতি আত্মগ্লানি এবং মহানবী (সা)-র ভবিষ্যত মর্যাদার প্রতি গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি করল।[১]

পারস্য সম্রাট কিসরার নামে পত্র

খুসরাও পারভেয ছিল পারস্য সম্রাট, আধা প্রাচ্য জগতের শাহানশাহ্, যর-দশ্‌ত মাযহাবের অনুসারী। আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফা (রা)-কে পত্র সহযোগে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রেরিত পত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. বুখারী, কিতাব বাদউল ওয়াহয়ি; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার।

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس ـ سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الله فانى انا رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ـ اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس ـ

"পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খুসরাও-এর নামে। সত্য পথের অনুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আর তাদের প্রতি যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র পয়গামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা আমি আল্লাহ্‌র রসূল। সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমি প্রেরিত হয়েছি যাতে করে সকল জীবিত মানুষকে আযাবে ইলাহীর ভীতি প্রদর্শন করা যায় এবং অস্বীকারকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ বাণী পুরা হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে; অন্যথায় সকল অগ্নি উপাসকের গোনাহ তোমার কাঁধে বর্তাবে।"

খুসরাও পত্র পাঠমাত্রই ক্রোধে এটি ছিঁড়ে ফেলে এবং মুখে বলে, আমার একজন নগণ্য প্রজা হয়ে এভাবে আমাকে পত্র লেখে আর আমার নামের আগে নিজের নাম লেখে।

এরপর খুসরাও ইয়ামনের শাসনকর্তা বাযানকে, সমগ্র আরব যার ক্ষমতা কিংবা প্রভাবাধীন মনে করা হতো, নির্দেশ পাঠায়, এই লোকটিকে যে কিনা নবী দাবি করছে (আল্লাহ্‌র পানাহ চাই) গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

বাযান নির্দেশ পেতেই একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠান। সেনা কর্মকর্তার নাম ছিল খুর্রা খুস্‌রাহ। তার অধীনে বাবওয়ায়হ নামক একজন দেশীয় কর্মকর্তাও পাঠানো হয়। বাবওয়ায়হ্‌র প্রতি বাযানের বিশেষ নির্দেশ ছিল, সে মহানবী (সা)-র সকল অবস্থা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রাখবে এবং মহানবী (সা)-কে পারস্য সম্রাটের দরবারে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তিনি যদি যেতে অস্বীকার করেন তবে ফিরে এসে বিবরণী প্রদান করবে।

যখন এই সব কর্মকর্তা মদীনায় মহানবী (সা)-র খেদমতে হাজির হলো তখন নবী করীম (সা) তাদের বললেন, তোমরা আজকের দিন বিশ্রাম গ্রহণ কর। আগামী কাল পুনরায় এস। পরদিন দরবারে নববীতে হাজির হতেই তিনি বললেন, আজ

রাত্রে তোমাদের সম্রাটকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। যাও, গিয়ে দেখ গে। খোঁজ নাও গে। কর্মকর্তা এ খবর শুনতেই ইয়ামনে ফিরে যান। ইতোমধ্যে নতুন সম্রাটের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা বাযানের কাছে সরকারী পত্র এসে হাজির হয় যে, খুসরাওকে তৎপুত্র (শায়রুয়া) হত্যা করেছে এবং এক্ষণে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর বাযান নবী করীম (সা)-এর আচার-আচরণ, অভ্যাস, চরিত্র, ব্যবহার, শিক্ষা ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করলেন এবং এরপর মুসলমান হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে রাজদরবারের অনেক সভাসদ এবং প্রজাবর্গের এক বিরাট অংশ মুসলমান হয়ে যায়।[১]

নবী করীম (সা) যেই দূত সম্রাটের দরবারে পাঠিয়েছিলেন তিনি ফিরে এসে তার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, পারস্য সম্রাট প্রেরিত লিপি মুবারক ফেড়ে ফেলে। তখন নবী করীম (সা) বলেন, مزق ملكه 'সে তাঁর দেশকে ফেড়ে ফেলেছে, তার সাম্রাজ্যকে ফেড়ে ফেলেছে'।[২]

প্রিয় পাঠক! আপনি এই সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবমণ্ডিত বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন এবং সাড়ে তেরশ' বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে অনুসন্ধান করুন, কোথাও কি সাসানী সাম্রাজ্যের কোন চিহ্ন দেখতে পান যেই সাম্রাজ্য এই ঘটনার পূর্বে চার পাঁচ হাজার বছর যাবত অর্ধেক পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করে আসছিল এবং যার বিজয় অনেকবারই গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্যকে পরাজিত ও পদানত করেছিল? কোথাও তা দেখতে পাবেন না।

খায়বার যুদ্ধ

খায়বার মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে যেতে তিন মনযিল দূরে একটি স্থা নর নাম। এটি ছিল একটি নির্ভেজাল ইয়াহূদী বস্তি। বস্তির চারদিকে ছিল অনেক ' য়টি সুদৃঢ় দুর্গ।[৩]

নবী করীম (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপনের পর প্রত্যাবর্তনের বেশি দিন য়নি, কেবল অল্প কিছু দিনই হয়েছিল (এক মাসেরও কম), তিনি শুনতে পেলেন, খায়বারের ইয়াহূদীরা মদীনা আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। তারা বনূ গাতাফানের চার হাজার যুদ্ধবাজ সৈনিককেও নিজেদের সাথী বানিয়ে নিয়েছে। সেই সাথে তারা তাদের সাথে এই চুক্তিও করেছে যে, মদীনা বিজিত হলে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ তারা সব সময় বনূ গাতাফানকে দিয়ে যাবে।[৪]

১. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
৩. সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৭২৬ পৃ.।
৪. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৪৭৮ পৃ.।

নবী করীম (সা) কেবল সেই সব সাহাবীকেই এই যুদ্ধে শরীক হবার অনুমতি দিয়েছিলেন যাঁরা لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشجره فعلم مافى قلوبهم-এর সুসংবাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন এবং যাঁদেরকে وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। এঁদের সংখ্যা ছিল ষোল শত যাঁদের মধ্যে দু'শ জন ছিলেন অশ্বারোহী।[১]

মুসলিম সেনাবাহিনী খায়বার বস্তি সংলগ্ন এলাকায় রাতের বেলায়ই পৌঁছে যায়। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, রাতের বেলায় তিনি যুদ্ধ শুরু করতেন না এবং রাত্রি বেলা আক্রমণও করতেন না। এজন্য মুসলিম সেনাবাহিনী উন্মুক্ত ময়দানে ছাউনি ফেলে।[২] ময়দানটি ছিল খায়বার বস্তি ও বনূ গাতাফানের মধ্যবর্তী স্থানে। এই কৌশল গ্রহণ দ্বারা লাভ হলো এই, বনূ গাতাফান যখন খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলো দেখতে পেল মুসলিম সেনাবাহিনী পথিমধ্যে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাদেরকে নিঃশব্দে আপন আপন ঘরে ফিরে যেতে হয়।[৩]

রসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম খায়বারের দুর্গগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলো জয় করতে শুরু করলেন। এই সব দুর্গের মধ্যে একটি দুর্গ ছিল বিখ্যাত ইয়াহূদী যোদ্ধা মারহাবের সিংহাসন। এই দুর্গ হযরত আলী (রা) জয় করেছিলেন।

দুর্গ জয়ের ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

দুর্গটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ভেদ্য। ফলে কোনভাবেই এটি জয় করা যাচ্ছিল না। একদিন নবী করীম (সা) বললেন, لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه "আগামীকাল সেনাবাহিনীর পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে প্রদান করা হবে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করবেন।" এ ছিল এমন এক প্রশংসা যা শোনার পর মুসলিম ফৌজের বড় বড় বীর-পুরুষ পরদিন পতাকা লাভের জন্য উন্মুখ ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সকাল হতেই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে স্মরণ করলেন। সকলেই বললেন, তাঁর চোখ উঠেছে এবং চোখে ব্যথা। হযরত আলী (রা) খবর পেয়ে সামনে আসতেই নবী করীম (সা) মুখের লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। আর লালা মুবারক লাগাতেই তিনি চোখ মেললেন। সেই সাথে চোখের লালিমা কেটে গেল এবং চোখের ব্যথা-বেদনাও দূর হয়ে গেল। এরপর

১. সীরাতে হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, ৭২৬ পৃ.।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, খায়বার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩৩০ পৃ.।

নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে পতাকা প্রদান করে বললেন, যাও, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে, অন্যথায় যুদ্ধ করবে। আলী! যদি তোমার হাতে একজন মানুষেরও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হয়, ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায় তবে তা দুর্লভ সম্পদ লাভের তুলনায় অনেক বেশি উত্তম ও মূল্যবান প্রমাণিত হবে।[১]

হযরত আলী মুরতাযা (রা) নাইম দুর্গের পাশে সেনা ছাউনি ফেলেন। মুকাবিলার উদ্দেশে দুর্গের বিখ্যাত সর্দার মারহাব ময়দানে এসে অবতরণ করল। মারহাব নিজেকে এক হাজার যোদ্ধার সমকক্ষ বলে ঘোষণা করত। সে ময়দানে অবতরণ করতেই নিম্নোক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করল ঃ

قدعلمت خيبرانى مرحب

شاكى السلاح بطل مجرب

اذا القلوب اقبلت تلهب

"খায়বার জানে আমি মারহাব, অস্ত্রসজ্জিত

বীর পুরুষ আমি আর আমি অভিজ্ঞ যোদ্ধাও বটে,

যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় যখন মানুষের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে,

তখনই আমি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করি।"

তার মুকাবিলায় আমের ইবনুল আকওয়া' (রা) বের হন। তিনিও ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করে চলেছিলেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

قدعلمت خيبر انى عامر

شاكى السلاح بطل مغافر

"খায়বার জান আমি আমের, অস্ত্র চালনায় পারদর্শী আর অভিজ্ঞ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী।"

মারহাব তাঁর ওপর তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাত হানলে হযরত আমের (রা) ঢালের সাহায্যে সে আঘাত প্রতিহত করেন এবং মারহাবের ওপর পাল্টা আঘাত হানেন। কিন্তু তলোয়ার লম্বায় ছোট হওয়ায় আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা তাঁর নিজের হাঁটুতে গিয়ে লাগে এবং আঘাতের পরিণতিতে শাহাদত লাভ করেন। অতঃপর হযরত আলী মুরতাযা (রা) বহির্গত হন। তাঁর ছন্দোবদ্ধ হায়দারী কবিতা আবৃত্তিতে যুদ্ধের প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তিনি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, খায়বার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

انا الذى سمتنى امى حيدره
كليث غابات كريه المنظره
اوفيهم بالصاع كيل السندره

"আমি সেই যে, আমার মা আমার নাম রেখেছে হায়দার অর্থাৎ ক্রোধোন্মত্ত সিংহ। আমি জংলী সিংহের ন্যায় সাহসী এবং খুবই ভয়ানক প্রকৃতির। আর আমি আমার মান ও পরিমাপ মাফিক বদান্যতা প্রদর্শন করে থাকি।"

অতঃপর হযরত আলী মুরতাযা (রা) তার ওপর তলোয়ারের এমন এক আঘাত হানেন যে, এক আঘাতেই তার কম্ম সাবাড় হয়ে যায় এবং সে লাশে পরিণত হয়। আর এই সাথে দুর্গও বিজিত হয়।[১]

খায়বারে অনেকগুলো ঘটনা এ সময় সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হলো ঃ জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম যে তার ইয়াহূদী মনিবের বকরী চরাত, ইয়াহূদীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কী করতে যাচ্ছেন? তারা জানায়, আমরা ঐ লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যে নবুওত দাবি করে। এতে তার দিলে মহানবী (সা)-কে দেখার প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সে তার বকরী পাল নিয়ে মহানবী (সা)-র খেদমতে হাজির হয় এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি কী বলেন এবং কিসের দিকে আহ্বান জানান? নবী করীম (সা) বলেন, আমি ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকি আর এই আহ্বান জানাই, তোমরা সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আর আমি আল্লাহ্র রসূল এবং এর প্রতিও আহ্বান জানাই, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না। গোলাম বলল, আমি যদি এই সাক্ষ্য দেই এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনি তাহলে আমি কী পাব? নবী করীম (সা) জানালেন, জান্নাত পাবে যদি তুমি এই বিশ্বাসের ওপর মারা যাও। গোলাম ইসলাম কবুল করল। অতঃপর নিবেদন পেশ করল, এই বকরীর পাল আমার কাছে আমানত হিসাবে রয়েছে। এগুলো নিয়ে আমি কী করব? নবী করীম (সা) বললেন, এগুলো পাথর মেরে তাড়িয়ে দাও। মনিবের বাড়ির দিকে চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই তোমার আমানত আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন।

অতঃপর হাবশী গোলাম তাই করল। বকরীগুলো তাড়া খেয়ে সোজা তাদের মনিবের বাড়ি পৌঁছে যায়। মনিব বুঝতে পারে তার গোলাম মুসলমান হয়ে গেছে বিধায় সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ইতোমধ্যে মহানবী (সা) মুসলমানদের লক্ষ্যে ওয়াজ করলেন এবং সাহাবাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন। মুসলিম ও ইয়াহূদীদের মধ্যে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে এই গোলাম শাহাদত লাভ

১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার; কিতাবুল মানাকিব, আলী (রা)-র মানাকিব অধ্যায়।

করেন। মুসলমানেরা ময়দান থেকে তাঁর লাশটিও উঠিয়ে নিয়ে আসে। নবী করীম (সা) তাঁর শহীদী লাশ দেখে বলেন, আল্লাহ এই গোলামের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবং তাকে বিরাট তৌফিক দান করেছেন। আমি তার শিয়রে দু'টি হূর দেখতে পেয়েছি, অথচ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটি সিজদা করবার সুযোগ তার জীবনে ঘটে নি।[১]

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো এই ঃ মহানবী (সা)-র খেদমতে একজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি একজন কৃষ্ণকায় অসুন্দর মানুষ। আমার গন্ধ সুন্দর নয়। বিত্ত-সম্পদও নেই আমার। আমি যদি ইয়াহূদীদের সাথে লড়াই করি এবং মারা যাই তাহলে কি জান্নাতে যেতে পারব? রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, হ্যাঁ (যেতে পারবে)। একথা শুনে সে অগ্রসর হলো, যুদ্ধ করল এবং মারা গেল। মহানবী (সা) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌ তোমার চেহারা সুন্দর করে দিয়েছেন, তোমাকে খোশবুদার বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাকে অনেক বিত্ত-সম্পদেরও মালিক করেছেন। আমি দেখলাম, হূরদের ভেতর থেকে আল্লাহ তাকে দু'জন স্ত্রী দান করেছেন।[২]

খায়বার যুদ্ধের প্রথমে জনৈক বেদুঈন মহানবী (সা)-র খেদমতে হাজির হলো এবং ঈমান আনল ও তাঁর সঙ্গী হলো। বলল, আমি আপনার সঙ্গে হিজরত করছি। মহানবী (সা) তাকে একজন সাহাবীর খেদমতে সোপর্দ করলেন যেন সে তাকে তা'লীম ও তরবিয়ত করে অর্থাৎ তাকে যেন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলে। খায়বার যুদ্ধ হলো এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও হাতে এল। নবী করীম (সা) এর একটি অংশ বেদুঈনকেও দিলেন। বেদুঈন এ সময় তার সাথীদের উট চরাতে গিয়েছিল। ফিরে এসে যখন সে তার অংশ পেল, প্রাপ্ত অংশটুকু নিয়ে মহানবী (সা)-র খেদমতে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এ কি? তিনি বললেন, এ তোমার অংশ। সে বলল, আমি কি এজন্য আপনার সাথী হয়েছিলাম? আমি তো এজন্য সাথী হয়েছিলাম। (কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করে) যে, এখানে তীর লাগবে আর আমি মারা গিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাব। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি যদি তোমার এই ইচ্ছার ব্যাপারে আন্তরিক হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তাই করবেন। খায়বার যুদ্ধে এই বেদুঈন শহীদ হন। তার লাশ হুযূর আকরাম (সা)-এর খেদমতে আনা হলে তিনি তাঁর লাশের দিকে চেয়ে বললেন, এ কি সেই (বেদুঈন)? লোকেরা বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম (সা) বললেন, সে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সত্যবাদী ছিল। আল্লাহও তাই করলেন (যা সে চেয়েছিল)। নবী

১. দালাইলুন নবুওত, ৪৯ খণ্ড, ২২৯; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩২৩।
২. প্রাগুক্ত, ২২১ পৃ.; ঐ, ৩২৪ পৃ.।

করীম (সা) তাঁকে তাঁরই জামা দিয়ে কাফন পরালেন। এরপর তাঁকে সামনের সারিতে রেখে জানাযা পড়ালেন। দু'আর মধ্যে এও বললেন, হে আল্লাহ! এ তোমার বান্দা। তোমার রাস্তায় হিজরত করে বের হয়েছিল এবং শহীদ হিসাবে মারা গিয়েছে। আমি তার সাক্ষী।[১]

যুদ্ধ জয়ের পর বিজিত ভূমি দখল করা হয়। কিন্তু ইয়াহূদীরা আবেদন করল, ভূমি আমাদের অধিকারে থাকতে দিন। আমরা উৎপন্ন ফল-ফসলের অর্ধেক আপনাদেরকে দিতে থাকব। তাদের আবেদন মনজুর হয়।[২]

ফল-ফসল পাকার মৌসুমে নবী করীম (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহাকে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি উৎপন্ন খাদ্যশস্য দু'ভাগ করে ইয়াহূদীদের ডেকে বলতেন, যে ভাগ তোমাদের পছন্দ নিয়ে নাও। এরূপ ন্যায় ও ইনসাফে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত এবং বলত, এরূপ ন্যায় ও ইনসাফের দরুনই আজও আসমান-যমীন কায়েম আছে।[৩] খায়বারের ভূমি যুদ্ধে শরীক সকল মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।[৪]

হযরত জাফর (রা) ইবন আবী তালিবের প্রত্যাবর্তন

খায়বারে থাকতেই হযরত জাফর ইবন আবী তালিব তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সঙ্গে ইয়ামনের আশ'আরী গোত্রের লোকেরাও ছিল। এঁদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জনের কিছু বেশি। তাঁরা একই নৌকায় আরোহী ছিলেন। নৌকা তাদেরকে আবিসিনিয়া উপকূলে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের হযরত জাফর (রা) ইব্ন আবী তালিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাক্ষাত ঘটে। হযরত জাফর (রা) তাঁদেরকে বলেন, আমাদেরকে এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠিয়েছেন এবং অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরাও আমাদের সঙ্গে অবস্থান কর। তারা অবস্থান করে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় একই সঙ্গে রওয়ানা হয়। তাঁরা যখন হুযূর আকরাম (সা)-এর খেদমতে পৌঁছে তখন তিনি হযরত জা'ফরের গলার আওয়াজ শুনতেই খুবই আনন্দোৎফুল্লচিত্তে তাঁর দিকে অগ্রসর হন ও বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খান এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না, খায়বার বিজয়ে আমি বেশি আনন্দিত, নাকি জাফরের আগমনে। খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে প্রত্যাগত মুহাজিরদেরও তিনি অংশ প্রদান করেন।[৫]

---

১. সুনান নাসাঈ, ৪র্থ খণ্ড, ৬০ পৃ.; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৫৯৫; দালাইলুন নবূওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ২২১ পৃ.।
২. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ।
৩. বালাযুরীর ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৪।
৪. আবূ দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাহ।
৫. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল।

নবী করীম (সা) কে বিষ প্রয়োগ

খায়বারে থাকতেই জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা নবী করীম (সা) কে বিষ দিয়েছিল। সাল্লাম ইবন মাশকাম নামক ইয়াহূদীর স্ত্রী যয়নব লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে, হুযূর আকরাম (সা) গোশতের কোন অংশ বেশি পছন্দ করেন? সকলেই জানায় হাতার গোশ্‌ত। অতঃপর হাতার গোশ্‌তে তীব্র বিষ মিশিয়ে ভুনাকৃত একটি বকরী রসূল আকরাম (সা)-এর খেদমতে পেশ করে। তিনি ঐ অংশের গোশত মুখে দিতেই গোশতের টুকরাটির মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন, এতে তীব্র বিষ মেশানো হয়েছে। তাকে ডেকে একথা জিজ্ঞেস করতেই সে অকপটে তার অপকর্মের কথা স্বীকার করে। নবী করীম (সা) কেন সে এ কাজ করেছে, জিজ্ঞেস করতেই সে জানায়, আমরা ভেবেছি, আপনি যদি (আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) মিথ্যা হন তাহলে আমরা আপনার থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর আপনি যদি সত্য নবী হন (অবশ্যই তিনি সত্য নবী) তাহলে বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। মহিলাটিকে নবী করীম (সা)-এর সামনে হাজির করা হলেও সে একথাই স্বীকার করে, আমার ইচ্ছা মেরে ফেলারই ছিল। এতদ্‌শ্রবণে নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সে সুযোগ দেবেন না। সাহাবা-এ কিরাম (রা) তাকে মেরে ফেলার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে সেই অনুমতি দেন নি।[১]

ওমরাতুল কাযা আদায়

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, পরবর্তী বছর নবী করীম (সা) মক্কায় এসে ওমরাহ আদায় করবেন এবং তিন দিন অবস্থান করে ফিরে যাবেন।[২] স্থিরীকৃত শর্তের ভিত্তিতে তিনি এ বছর ওমরাহ আদায় করতে ইচ্ছা করেন এবং ঘোষণা দেন যারা গত বছর হুদায়বিয়াতে শরীক ছিল কেবল তারাই ওমরাহ করতে যাবে। এদের কেউ যেন অনুপস্থিত না থাকে। এ সময়ে যারা মারা গিয়েছিল তারা ব্যতিরেকে আর সকলেই এই সৌভাগ্যে শরীক হন।[৩]

চুক্তির অন্যতম শর্ত এও ছিল, মুসলমানরা মক্কায় আসার সময় কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র আনবে না। এজন্য অস্ত্রশস্ত্র বতনে ইয়াজুজ নামক স্থানে যা মক্কা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত, রেখে আসেন এবং দু'শ সৈন্যের একটি প্লাটুন অস্ত্রশস্ত্রের পাহারায় রেখে আসেন।[৪] রসূলুল্লাহ (সা) 'লাব্বায়ক' বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ্ ইবন রওয়াহা (রা) উটের রশি ধরে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ওমরাতুল কাযা শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাত ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৪২৯ পৃ.।
৪. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

خلوا بنى الكفار عن سبيله - اليوم نضربكم على تنزيله -
ضربا يزيل الهام عن مقيله - ويذهل الخليل عن خليله -

"কাফিরেরা! পথ ছেড়ে দাও, সামনে থেকে সরে যাও। আজ তোমরা আমাদের অবতরণ করতে বাধা দিলে আমরা তলোয়ারের আঘাত হানব। এমন আঘাত হানব যা মাথাকে ধড় থেকে আলাদা করে দেয় এবং বন্ধুর মন থেকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেয়।"[১]

সাহাবাদের একটি বিরাট দল সাথে ছিল। তারপর বহু বছরের বিলম্বিত তামান্না ও আকাঙ্ক্ষা, তদুপরি ধর্মীয় কর্তব্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আদায় করছিলেন। মক্কার লোকদের ধারণা ছিল, মদীনার আবহাওয়া মুসলমানদের কমযোর ও দুর্বল করে ছেড়েছে। এজন্য তিনি হুকুম দিলেন, তাওয়াফকালে প্রথম তিন চক্করে বীর দর্পে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হবে।[২] আরবী ভাষায় একে রাম্‌ল বলা হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এটি সুন্নত হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

মক্কার লোকেরা যদিও অনন্যোপায় হয়ে মুসলমানদেরকে ওমরাহ করার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা তাদের উপস্থিতিতে ও চোখের সামনে ওমরাহ আদায় করবে, এ দৃশ্য বরদাশ্‌ত করা ছিল অসম্ভব। ফলে এ দৃশ্য এড়াতে কুরায়শ নেতৃবর্গ বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অতঃপর তিন দিন হতেই হযরত আলী (রা) সমীপে এসে জানায়, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গিয়ে বল, শর্ত মুতাবিক তিন দিন হয়ে গেছে। অতএব, তিনি যেন মক্কা পরিত্যাগ করেন। হযরত আলী (রা) তাদের কথা মহানবী (সা)-কে জানাতেই তিনি সেই মুহূর্তেই রওয়ানা হয়ে যান।[৩] যাবার সময় হযরত হামযা (রা)-র অল্প বয়স্কা কন্যা উমামা, যিনি তখন মক্কায় ছিলেন, নবী করীম (সা)-এর কাছে 'চাচা চাচা' বলে দৌড়ে আসেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে উঠিয়ে নেন। হযরত আলী (রা)-র ভ্রাতা হযরত জাফর ও যায়দ ইবন হারিছা উমামাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন-পালনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। হযরত জাফর বলছিলেন, এ আমার চাচার মেয়ে। যায়দ (রা) বলছিলেন, এ আমার ধর্মীয় ভাইয়ের মেয়ে হিসেবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। হযরত আলী (রা) বলছিলেন, সে আমার বোনও বটে। তাছাড়া সে আমার কোলেই পয়লা এসে উঠেছে। নবী করীম (সা) সকলের সমান আগ্রহ দৃষ্টে তাঁকে জাফর (রা)-এর স্ত্রী আসমার কোলে তুলে দিলেন এই বলে, সে উমামার খালা আর খালা মায়ের তুল্য বিধায় তাঁর দাবিই অগ্রগণ্য।[৪]

১. সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মিছাল; নাসাঈ, কিতাবুল মানাসিকুল হাজ্জ।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ওমরাতুল কাযা শীর্ষক অধ্যায়।
৩. প্রাগুক্ত। ৪. প্রাগুক্ত।

মূতার যুদ্ধ

বিভিন্ন রাজ্যের শাসক সুলতান ও বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি ও প্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে যে সব পত্র প্রেরিত হয়েছিল তার ভেতর হেরাক্লিয়াসের অধীন বসরার (হাওরান) শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবন আমরের নামেও একটি পত্র ছিল। সে ছিল আরব খ্রিস্টান এবং সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার শাসক। পত্র বাহক ছিলেন হারিছ ইবন উমায়র। শুরাহবীল তাঁকে শহীদ করে দেয়। (দূত হত্যা অবৈধ ও নিন্দনীয় বিধায়) তিনি এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হন এবং তিন হাজার ফৌজের একটি বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন।[১] নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়দ ইবন হারিছা (রা)-কে এই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সেই সাথে তিনি এও বলেন, যদি যায়দ ইবন হারিছা শাহাদত লাভ করে তবে জাফর ইবন আবী তালিব সেনাপতি হবে। আর সেও শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ্ ইবন রওয়াহা বাহিনীর অধিনায়ক হবেন।[২]

যদিও দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য, তথাপি গোটা অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ। তাই তিনি বাহিনীর অধিনায়ককে বিশেষভাবে তাকীদ দেন, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত জানাবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তাহলে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। তিনি এও বলেন, সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের সেই জায়গায়ও যাবে যেখানে হারিছ ইব্ন উমায়র শাহাদত লাভ করেন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। ছানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত নবী করীম (সা) স্বয়ং ফৌজের সঙ্গে পায়দল তাশরীফ নেন। সাহাবায়ে কিরাম সজোরে আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করেন আল্লাহ যেন তাদের সহীহ-সালামতে ও কামিয়াবীর সাথে ফিরিয়ে আনেন।[৩]

ফৌজ মদীনা থেকে রওয়ানা হলো। গোয়েন্দা বাহিনী শুরাহবীলকে এ সংবাদ দিতেই কম বেশি এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনী তৈরি করে। এদিকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আরব গোত্রগুলোর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মা'ব নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন যা বালকা নামক জেলায় অবস্থিত। হযরত যায়দ এ খবর শুনে চাইলেন রসূল আকরাম (সা)-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করতে এবং পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা বললেন, আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো বিজয় লাভ নয়, বরং শাহাদতের মর্যাদা লাভ যা যে কোন সময় অর্জিত হতে পারে।[৪] মোটকথা ক্ষুদ্র এই বাহিনীটি সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং এক লক্ষ

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩৮১ পৃ;।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, মূতা যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাতুন্নবী ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃ.।
৪. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩৭৫।

ফৌজের বিশাল বাহিনীর ওপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত যায়দ (রা) বর্শার আঘাতে শাহাদত বরণ করলে এরপর হযরত জা'ফর তায়্যার (রা) পতাকা হাতে তুলে নিলেন এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে প্রথমে নিজেই তলোয়ারের আঘাতে ঘোড়ার পা কেটে দিলেন। এরপর এমন ভীষণ বেগে আক্রমণ চালালেন যে, অবশেষে তলোয়ারের আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে গেলেন।[১] হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা) বলেন, আমি তাঁর লাশ দেখেছি। তাঁর শরীরে তলোয়ার ও বর্শার ৯০ টি আঘাত ছিল। আর এর সবগুলো ছিল সম্মুখভাগে, একটিও পৃষ্ঠদেশে ছিল না।[২]

হযরত জাফর (রা)-এর পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন রওয়াহা পতাকা হাতে তুলে নিলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে অবশেষে তিনিও শহীদ হলেন। অতঃপর ইসলামের বীর কেশরী হযরত খালিদ সেনাপতি হন এবং তিনিও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, সেদিন যুদ্ধে তাঁর হাতে আটটি তলোয়ার ভেঙেছিল।[৩] কিন্তু হলে কি হবে? এক লক্ষ সৈন্যের মুকাবিলায় তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলাকে অসম যুদ্ধ ছাড়া আর কিই বা বলা চলে? দুশমনের হাত থেকে মুসলিম ফৌজকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পারাটাই ছিল মূতা যুদ্ধের সবচে' বড় সাফল্য।

আল্লাহ্র রসূল (সা) এই ঘটনায় বিরাট আঘাত পান। হযরত জাফর (রা)-এর সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক। তাঁর শাহাদত ছিল এক মর্মান্তিক বেদনা। তিনি মসজিদে গিয়ে শোকাহত অবস্থায় বসে পড়েন। এক ব্যক্তি গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসে বলল, জাফর (রা)-এর পরিবারের মহিলারা বিলাপ করছে এবং কান্নাকাটি করছে। তিনি বিলাপ ও কান্নাকাটি করতে নিষেধ করে পাঠালেন। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমাদের কথা শুনছে না। তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের মুখে মাটি পুরে দাও। এই ঘটনা হযরত আইশা (রা) থেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত। সহীহ বুখারীতে এও আছে, হযরত আইশা (রা) লোকটিকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা এটা করবে না (অর্থাৎ মুখে মাটি পুরে দেওয়া) এবং নবী করীম (সা)-ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন না।[৪]

মক্কা বিজয়

৬ষ্ঠ হিজরীতে কুরায়শদের সঙ্গে মহানবী (সা) হুদায়বিয়া নামক স্থানে যেই সন্ধি চুক্তি করেছিলেন তার একটি দফা এই ছিল, দশ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এই শর্তাধীনে যে, যে সব গোত্র ও সম্প্রদায় নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩৭৮।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, মূতার যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়। পুরো ঘটনা সীরাত ইবন হিশামে বর্তমান।
৪. প্রাগুক্ত।

মিলিত হতে চায় তারা সেদিকে মিলিত হবে এবং যে সব গোত্র ও সম্প্রদায় কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হতে চায় তারা তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

সে মুতাবিক খোযাআ গোত্র নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে এবং বকর গোত্র কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হয়। সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের দু'বছরও হয়নি, বনূ বকর বনূ খোযা'আর ওপর হামলা করে বসে এবং কুরায়শরা বনূ বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ইকরিমা ইবন আবী জেহেল, সুহায়ল ইবন আমর (সন্ধি চুক্তিতে কুরায়শদের পক্ষে সেই স্বাক্ষর করেছিল), সফওয়ান ইবন উমায়্যা (বিখ্যাত কুরায়শ নেতা) স্বয়ং কালো নেকাবে মুখ ঢেকে নিজেদের লোকজন নিয়ে বনূ খোযা'আর ওপর হামলায় অংশ নেয়। বনূ খোযা'আর লোকেরা প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানায় আক্রমণকারীদের কাছে। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে কা'বা ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পাষণ্ডদের প্রাণে এতটুকু দয়ামায়ার সঞ্চার হয় নি। তারা নির্দয়ভাবে এসব লোককেও হত্যা করে। এই সব অসহায় যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে ও দোহাই পেড়ে তাদের প্রতি দয়া ভিক্ষার আবেদন জানাচ্ছিল তখন ঐসব জালিম "আজ আল্লাহ বলতে কিছু নেই" বলে জওয়াব দিয়েছিল।[১]

এই নির্যাতিত ও অত্যাচারিত লোকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ যারা কোন রকমে এদিক সেদিক পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল তাদের চল্লিশ জনের একটি কাফেলা নবী করীম (সা)-এর দরবারে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের ধ্বংসের করুণ কাহিনী বিবৃত করে। আমর ইবনে সালেম আল-খোযাঈ মর্মস্পর্শী কবিতার মাধ্যমে গোটা ঘটনাই দরবারে নববীতে পেশ করে। তন্মধ্যে কয়েকটি লাইন নিচে উদ্ধৃত করা হল।

ان قريشا اخلفوك الموعدا ـ ونقضوا ميثاقك الموكدا

وجعلوا لى فى كداء رصدا ـ وزعموا ان لست ادعواحدا

وهم اذل واقل عددا ـ هم بيتونا بالوتيد هجدا

فقتلونا ركعا وسجدا

অর্থ ঃ কুরায়শরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা
সেই মযবুত চুক্তিকে যা তারা আপনার সঙ্গে করেছিল, ভেঙে ফেলেছে।
কিদা নামক স্থানে লোকদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে;
তারা মনে করে, আমাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না।
তারা নিকৃষ্ট এবং সংখ্যায় অল্প; তারা আমাদেরকে ওয়াতীর নামক
স্থানে শায়িত ও ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ চালিয়েছে।

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩৯০; তাবারীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫৩।

আমাদেরকে রুকূ' ও সিজদারত অবস্থায় তারা হত্যা করেছে।"[১]

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) (১) দৃঢ়ভাবে সন্ধি মেনে চলা, (২) মজলুম পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও (৩) মিত্র গোত্রগুলো ভবিষ্যতে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। সাথে ছিল জীবন উৎসর্গকারী দশ হাজার ভক্ত সাহাবী।[২] দু' মনযিল পথই কেবল অতিক্রম করেছিলেন এমন সময় পথিমধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবন আবী উমায়্যা মহানবী (সা)-র সঙ্গে মিলিত হয়।

এরা ছিল সে সব ব্যক্তি যারা নবী করীম (সা)-কে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল এবং ইসলামের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছিল। মহানবী (সা) তাদেরকে দেখতেই মুখ ফিরিয়ে নেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) নিবেদন পেশ করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান আপনার আপন চাচার সন্তান আর আবদুল্লাহ আপন ফুফু (আতেকা)-র ছেলে। এত নিকটাত্মীয় হিসাবে তারা আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত হবে না বলেই আশা করি।"[৩]

এরপর হযরত আলী (রা.) তাদের দু'জনকে ডেকে একটি কৌশল বাৎলে দিলেন, যেসব শব্দে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতৃবর্গ তাদের ভ্রাতা ইউসুফ-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তোমরাও মহানবী (সা)-র খেদমতে গিয়ে ঠিক সেভাবেই উল্লিখিত শব্দের মাধ্যমে ক্ষমা ভিক্ষা কর। নবী করীম ক্ষমাশীল, দয়ালু বিধায় আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হতে পারবে। তারা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে গিয়ে হাজির হয়ে এই আয়াত পাঠ করল ঃ

تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين ـ

"আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আমাদের ওপর আপনাকে প্রাধান্য দান করেছেন। আর নিশ্চিতই আমরা অপরাধী ছিলাম।"

এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحمين ـ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আর তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু" (আল-কুরআন)।[৪]

---

১. সীরাত-ই-ইব্ন হিশাম ২য় খণ্ড, ৩৯৫; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩৯৬।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, মক্কা বিজয়।
৩. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০০ পৃ.; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪৬ পৃ. মুসলিম-এর শর্ত মুতাবিক ইমাম যাহবী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।
৪. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৪০০ পৃ.।

এ সময় আবূ সুফিয়ান আবেগাতিশয্যে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন ঃ

لعمرك انى يوم احمل راية - لتغلب خيل اللات خيل محمد

لكالمدلج الحيران اظلم ليله - فهذا اوانى حين اهدى واهتدى

هدانى هاد غير نفسى ونالنى - مع الله من طردت كل مطرد

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র কসম! যেদিনগুলোতে আমি যুদ্ধের পতাকা এজন্যই বহন করতাম যেন লাত মূর্তির বাহিনী মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনীর ওপর জয়যুক্ত হয়। সেদিনগুলোতে আমি তারই মত ছিলাম যে অন্ধকার রাতে ঠোকর খেয়ে ফেরে। এখন সময় এসেছে যেন আমি হেদায়েত পাই এবং সোজা সরল পথে চলি। আমাকে হেদায়েত দানকারী পথ প্রদর্শক আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আমার মন নয় এবং আল্লাহ্‌র রাস্তা তিনি আমাকে দেখিয়েছেন যাঁকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম এবং পরিত্যাগ করেছিলাম।

আবূ সুফিয়ানের কবিতা শ্রবণের পর রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমাকে পরিত্যাগই করে চলেছিলে।[১]

নবী করীম (সা)-এর অভিপ্রায় ছিল যেন মক্কার লোকেরা তাঁর আগমনের খবর জানতে না পারে। তাই হয়েছিল অর্থাৎ তারা কিছুই জানতে পারে নি। যখন হুযূর আকরাম (সা) মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে বাইরে ছাউনি ফেললেন তখন তিনি সাহাবাদেরকে বললেন আগুন জ্বালাতে। নির্দেশ পালিত হল। সে সময় কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ান ইবন হারব গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য এ দিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আকস্মিকভাবে খোলা ময়দানে এত বিপুল সংখ্যায় আগুন জ্বলতে দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং বলে ওঠেন, এত বড় বিরাট বাহিনী এবং এ ধরনের আগুন জ্বলতে এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। হযরত আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (নবী করীম (সা.)-এর চাচা)-এর আগেই হিজরত করেছিলেন এবং মুসলিম ফৌজেই শরীক ছিলেন। তিনি আবূ সুফিয়ানের গলার আওয়াজ পেতেই তাকে চিনে ফেলেন এবং আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলেন, দেখ, রসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনের ভেতরই আছেন। ভেবে দেখেছ কি কাল কুরায়শদের পরিণতি কী ভয়াবহ হবে? এরপর একথা ভেবে, না জানি কোন মুসলমান তাকে দেখে ফেলে, অতঃপর পথেই তার কম্ম সাবাড় করে দেয়, আবূ সুফিয়ানকে আপন খচ্চরের পেছনে বসিয়ে তাকে লুকিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হন। আবূ সুফিয়ানের দিকে নজর পড়তেই নবী করীম (সা) বলেন, আবূ সুফিয়ান! তোমার কল্যাণ হোক। এখনও কি সময় আসে নি,

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০১ পৃ. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

যে, তুমি স্বীকার করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আপনি কত ধৈর্যশীল, দয়ালু আর আপনি কতটা আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদের অস্তিত্ব যদি থাকত তাহলে আজ আমাদের উপকারে আসত। নবী করীম (সা) বললেন, আবু সুফিয়ান! আল্লাহ্ তোমাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করুন। এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল বলে আমাকে স্বীকার করবে? আবূ সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আপনি কত ধৈর্যশীল আর দয়ালু এবং আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী। এ ব্যাপারে আমার মনে এখনও কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে। এ সময় হযরত আব্বাস (র) তাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, আরে আল্লাহর বান্দাহ! এখনও সন্দেহ? কেউ এসে তোমাকে দেখুক এবং তোমার কম্ম সাবাড় করে দিক তার আগেই কলেমাটা পড়ে ফেল আর বল, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল। এ কথা শুনতেই আবূ সুফিয়ান অবশেষে সকল দ্বিধা-সংশয় পেছনে রেখে কলেমা পড়ে মুসলমান হন এবং পরিপূর্ণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন।[১]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

আল্লাহ্‌র রসূল (সা) ক্ষমা, শান্তি ও নিরাপত্তার বৃত্ত এই দিন প্রসারিত করে দেন। ফলে মক্কার লোকদের মধ্যে কেবল সেই সব লোকই ধ্বংস হতে পারত যারা নিজেরাই শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে ইচ্ছুক কিংবা আগ্রহী নয় এবং নিজের জীবনের প্রতি যারা হতাশ কিংবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি ঘোষণা দেন ঃ যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ, আর মসজিদুল হারামে যে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাবাহিনীকে হেদায়েত দিয়ে রেখেছিলেন, মক্কায় প্রবেশের কালে কেবল তাদের ওপর হাত তোলা জায়েয যারা তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করবে কিংবা তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াবে। তিনি এও নির্দেশ দিয়েছিলেন, মক্কার লোকদের সহায়-সম্পদের ব্যাপারে সংযম প্রদর্শন করতে হবে, এ বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।[২]

আল্লাহ্‌র রসূল (সা) পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন আবূ সুফিয়ানকে এমন স্থানে নিয়ে দাঁড় করাতে যেখানে থেকে সে মুসলিম ফৌজের অগ্রযাত্রার দৃশ্য দেখতে পাবে। এই বিজয়ী বাহিনী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত একের পর এক আছড়ে পড়ছিল। বিভিন্ন গোত্র স্ব স্ব পতাকাসহ অতিক্রম করছিল। যখনই কোন

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০২-৩; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৩৯৮, ৪০১-২ পৃ.।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৪০৩ পৃ.।

গোত্র তাঁদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করত তখন আবূ সুফিয়ান আব্বাস (রা)-কে গোত্রের নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং বলতেন, এই গোত্রের সাথে আমার কী সম্পর্ক?[১] এমন সময় স্বয়ং নবী করীম (সা) কে সশস্ত্র বাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থায় আসতে দেখা গেল যাঁদেরকে সবুজ মনে হচ্ছিল। এঁরা ছিলেন লৌহ বর্মপরিহিত আনসার ও মুহাজির বাহিনী যাদের কেবল চোখই দেখা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। আবূ সুফিয়ান এই দৃশ্য দেখে বলে ওঠেন ঃ আল্লাহ্‌র কী শান! আব্বাস, এঁরা কারা? উত্তরে জানালেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তশরীফ আনছেন। আবূ সুফিয়ান বললেন, ওদের ভেতর কারুরই এর আগে এই শক্তি ও শান-শওকত ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! ওহে আবুল ফযল! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্ষমতা আজ সকালে কত বিরাট। আব্বাস (রা) তার কথা শুধরে দিয়ে বললেন, ক্ষমতার বিরাটত্ব নয়, এ হলো নবূওয়তের মু'জিযা।

এরপর আবূ সুফিয়ান বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা দিলেন, হে কুরায়শরা! মুহাম্মদ (সা) এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের দরজায় এসে হাজির হয়েছেন যাঁর সম্মুখীন তোমরা কখনো হও নি। এখন যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ। একথা শুনে লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন! তোমার ঘরই কতটুকু যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের স্থান সংকুলান হবে? এরপর আবূ সুফিয়ান বললেন, যারা আপন আপন ঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তারাও নিরাপদ। আর যারা মসজিদুল হারামে গিয়ে আশ্রয় নেবে তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে। একথা শুনতেই লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ আপন ঘরের দিকে আর কেউ বা মসজিদুল হারামের দিকে আশ্রয় নেবার উদ্দেশে ধাবিত হল।[২]

বিজয়ীর বেশে নয়—বিনয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ

নবী করীম (সা) এমন বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন যখন তাঁর মস্তক মুবারক আল্লাহ্‌র প্রতি দাসত্বসুলভ ভয় ও বিনয়ের আধিক্যে একেবারে ঝুঁকে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল নবী করীম (সা)-এর থুতনি উটনীর পিঠের কুঁজ স্পর্শ করবে।[৩] এ সময় তিনি কুরআন শরীফের সূরা ফাত্‌হ তেলাওয়াত করছিলেন।[৪]

বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশের সময় (যে মক্কা আরব উপদ্বীপের হৃদয় ও আত্মা এবং আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল) ন্যায়, ইনসাফ, সাম্য, বিনয় ও দাসসুলভ আনুগত্য প্রকাশের এমন কোন মাপকাঠি ছিল না যা তিনি এখতিয়ার

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী;
২. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০৪-৫ পৃ.; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, মক্কা বিজয় শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০৫; হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৫০পৃ.।
৪. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

করেন নি। হযরত উসামা, যিনি তাঁরই মুক্ত দাস হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রা)-র পুত্র, নবী করীম (সা)-এর সওয়ারীতে তাঁরই পেছনে তখন উপবিষ্ট। অভিজাত বনূ হাশিম কিংবা অপর কোন কুরায়শ গোত্রের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য জোটে নি যারা সেখানে তখন বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।[১]

বিজয়ের এই দিনে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি তার এই অবস্থা অনুভব করে তাকে অভয় প্রদান করেন এবং বলেন, ভয় পেয়ো না, শান্ত হও। আমি কোন বাদশাহ নই। আমি এমন এক কুরায়শ মহিলার সন্তান যিনি শুকনো গোশ্ত ভক্ষণ করতেন।[২]

"আজ ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের দিন, রক্তপাতের দিন নয়"

এ দিন আনসারদের পতাকা ছিল তাঁদের অধিনায়ক হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা.)-র হাতে। অপর দিকে তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সর্দার। তিনি সে সময় আবূ সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবূ সুফিয়ানের দিকে নজর পড়তেই বলে ওঠেন, اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبةاليوم اذل الله قريشا "আজ ঘোরতর যুদ্ধের দিন, প্রবল শোণিত পাতের দিন। আজ কা'বা শরীফ অঙ্গনে সব কিছুই অনুমোদিত ও বৈধ বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আজ কুরায়শদের অবনমিত করেছেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহিনীর মধ্যে আবূ সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন এই বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মাত্র সা'দ কী বলল তা কি আপনি শুনেছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কি বলল সা'দ? এ কথা শুনতেই তিনি সা'দ (রা)-এর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। নবী করীম (সা) সা'দ-এর কথা খুবই অপছন্দ করলেন এবং বললেন,

اليوم يوم المرحمة يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة ـ

"না, আজ ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শনের দিন। আল্লাহ্ তা'আলা আজ কুরায়শদেরকে সম্মানিত করবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"

এরপর তিনি হযরত সা'দ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং মুসলমানদের পতাকা তাঁর হাত থেকে নিয়ে তৎপুত্র কায়স (রা)-এর হাতে তুলে দিলেন। তিনি এই ধারণায় তা করলেন যে, পিতার পতাকা পুত্রের হাতে তুলে দেবার অর্থ হবে এই যে, তার হাত থেকে পতাকা নেওয়াই হয়নি।

---

১. প্রাগুক্ত।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৪০৫।

আর এভাবেই একটি হরফের পরিবর্তন (الملحمة-এর পরিবর্তে المرحمة) এবং এক হাতের পরিবর্তন অন্য হাত দ্বারা ঘটিয়ে (যার একটি হাত ছিল পিতার আর অপর হাত ছিল পুত্রের) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবন উবাদা (যাঁর ঈমান ও মুজাহিদসুলভ অবদান ও কর্মকাণ্ড দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত ছিল)-র দিলে এতটুকু আঘাত না দিয়ে আবূ সুফিয়ান (যাঁর আত্মিক সান্ত্বনার প্রয়োজন ছিল)-এর অন্তরের পছন্দের উপকরণ এমন প্রজ্ঞার সঙ্গে, বরং বলা চলে, আশ্চর্যজনক পন্থায় আঞ্জাম দিলেন তার চেয়ে উত্তম পন্থা কল্পনা করাও দুষ্কর। পিতার পরিবর্তে তাঁরই পুত্রকে এই পদমর্যাদা দান করলেন যার মাধ্যমে আবূ সুফিয়ানের আহত দিলকে সান্ত্বনা প্রদানও উদ্দেশ্য ছিল। অপর দিকে তিনি সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কেও বিষণ্ন ও যন্ত্রণাকাতর দেখতে চাচ্ছিলেন না যিনি ইসলামের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

সামান্য সংঘর্ষ

এ সময় সফওয়ান ইবন উমায়্যা, ইকরিমা ইবন আবূ জেহেল, সুহায়ল ইবন আমর ও খালিদ ইবন ওয়ালীদের সঙ্গীদের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষ ঘটে যে সংঘর্ষে প্রায় এক ডজন কাফির মুশরিক মারা যায়। এরপর তারা পরাজয় স্বীকার করে নেয়।[১] এর পেছনে কারণ ছিল, রসূল আকরাম (সা) মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন তারা মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তারা কেবল তাদের ওপরই হাত তুলবে যারা তাদের ওপর হাত ওঠাবে।

হারাম শরীফ মূর্তি থেকে মুক্ত

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় আপন জায়গায় পৌঁছে গেলেন এবং লোকে রাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল তখন তিনি বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং বায়তুল্লাহ্র দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করলেন। এ সময় তাঁর পবিত্র হাতে একটি ধনুক ছিল। কা'বার ভেতর সে সময় ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। তিনি ধনুকের সাহায্যে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "সত্য সমাগত আর মিথ্যা দূরীভূত; মিথ্যা তো দূরীভূত হবার জন্যই"। [সূরা বনী ইসরাঈল, ৮১ আয়াত]

তিনি কা'বার দেওয়াল গাত্রে কিছু ছবি লটকানো দেখতে পান যেগুলো তাঁরই নির্দেশে নামিয়ে ফেলা হয় এবং দূরে নিক্ষেপ করা হয়।[২]

১. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪০৮ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, মক্কা বিজয় শীর্ষক অধ্যায়।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা শীর্ষক অধ্যায়।

অতঃপর তিনি তওয়াফ শেষে কা'বার চাবি রক্ষক উছমান ইবন তালহাকে ডেকে পাঠান এবং বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলে দিতে বলেন।[৩] এরপর তিনি চাবি হাতে বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুললেন এবং ভেতরে প্রবেশ করে এর প্রতিটি কোণে গিয়ে আল্লাহু আকবার-এর সঙ্গীত গাইলেন, শোকরানা সালাত আদায় করলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ও কাতরভাবে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সামনে কপাল মাটিতে রেখে সিজদা করলেন।[১]

আল্লাহ্‌র শান! কা'বা শরীফের চাবি রসূল করীম (সা)-এর হাতে। আজ তিনি এই চাবির মালিক মুখতার। অথচ সেদিনের কথা। মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রথম দিককার কথা। রসূলুল্লাহ্ (সা) চাবিরক্ষক উছমান ইব্‌ন তালহাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌য় প্রবেশের উদ্দেশে চাবি চাইলেন। উছমান ইবন তালহা চাবি দিতে অস্বীকার করলেন। রসূল আকরাম (সা) বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি দেখতে পাবে একদিন এই চাবি আমার হাতে আসবে এবং সেদিন আমার যাকে ইচ্ছা তাকে এই চাবি দেব। উছমান ইবন তালহার জওয়াব ছিল ঃ সেদিন কি কুরায়শরা সবাই অবমানিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে? নবী করীম (সা) জওয়াব দিয়েছিলেন : না, বরং সেদিন তারা সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান হবে।[২]

আল্লাহ্‌র নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে আল্লাহ যাঁকে বানিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত সমাপনান্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে বের হতেই নবী করীম (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এগিয়ে এলেন এবং আর্জি পেশ করলেন, বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবি পাবার হকদার বনূ হাশিম বিধায় তাদেরকেই এই চাবি প্রদান করা হোক।[৩] কিন্তু নবী করীম (সা) اليوم يوم البر والوفاء (আজকের দিন সদাচরণ ও প্রতিজ্ঞা পূরণের দিন) বলে উছমান ইবন তালহাকে ডাকলেন এবং তাঁর হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললেন, এই নাও চাবি। এরপর যে তোমার হাত থেকে এই চাবি ছিনিয়ে নেবে কিংবা নিতে চাইবে সুনিশ্চিতভাবে সে হবে জালিম।[৪]

আরবে নিয়ম ছিল, কেউ কাউকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির রক্তের বদলা গ্রহণ করা অপরিহার্য খান্দানী দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াত অর্থাৎ ঘাতককে না পেলে নিহতের খান্দানী দফতরে তার নাম লিখে নেওয়া হতো এবং শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও প্রতিশোধ গ্রহণের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করা হতো। হত্যাকারী ঘাতক

১. তাবাকাত ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৩৬-৩৭।
২. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১১৯-২০।
৩. হাদাইকুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, ৬৭৩পৃ.।
৪. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃ.।

মারা গেলে তার খান্দান কিংবা গোত্রের কাউকে হত্যা করা হতো। ঠিক তেমনি রক্তপণের দাবিও পিতা-পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসত। রক্তের এই প্রতিশোধ গ্রহণ আরবে সবচে' বড় গর্বের বিষয় ছিল। ঠিক এমনি ধরনের আরও বহু অহেতুক বিষয় খান্দানী অহংকারের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম এসব মেটাবার জন্যই এসেছিল এবং এরই ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ, রক্তপাত ও যাবতীয় অন্যায় অহংকার প্রদর্শন সম্পর্কে বলেন, আমি এ সবই আমার দু'পায়ের নিচে পিষে ফেললাম।[১]

আরব ও সমগ্র বিশ্বে জাতি ও বংশ-গোত্রের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য কায়েম করা হয়েছিল। যেভাবে ভারতবর্ষে হিন্দুরা চারিটি শ্রেণী তথা চতুঃবর্ণ কায়েম করেছিল এবং শূদ্রকে সেই স্থান দিয়েছিল যা ছিল পশুর স্তর। এরই সাথে সাথে এই বাধ্য-বাধকতাও আরোপ করেছিল যাতে তারা কখনোই নিজেদের স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে না পারে।

ইসলামের সবচে' বড় অনুগ্রহ যা সারা দুনিয়ার ওপর করেছে তাহলো সাধারণ মানুষের মাঝে সাম্য কায়েম করা। অর্থাৎ ইসলাম আরব-অনারব, অভিজাত-অনভিজাত, ইতর-ভদ্র, বাদশাহ-ফকীর সকলকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান। সব মানুষই উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হতে পারে। এরই ওপর ভিত্তি করে নবী করীম (সা) কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর পঠিত আয়াতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, মনে রেখো, তোমরা সকলেই আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরী।[২]

খুতবা প্রদানের পর তিনি সমবেত জনসমাবেশের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন কুরায়শদের নেতৃবৃন্দ তাঁরই সামনে উপস্থিত। এদের মধ্যে সেই সব অত্যুৎসাহী নেতাও ছিল যারা ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবার অগ্রসারিতে ছিল। তারাও ছিল যাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি গালির বৃষ্টি বর্ষিত হতো। তারাও ছিল যাদের তীক্ষ্ণধার যবান নবী করীম (সা)-এর পবিত্র শানে বেআদবী ও গোস্তাখী করেছিল। তারা ছিল যারা মহানবী (সা)-র চলার পথে কাঁটা বিছাত। তারাও ছিল যারা উপদেশ প্রদানের মুহূর্তে নবী করীম (সা)-এর পদযুগল প্রস্তারাঘাতে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করে দিত। এই জনসমাবেশে তারাও উপস্থিত ছিল যাদের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট নবীর খুন পান করা ছাড়া কিছুতেই তৃপ্ত হতো না। তারাও ছিল যাদের আক্রমণের উপর্যুপরি সয়লাব মদীনার প্রাচীর গাত্রে এসে আছড়ে পড়ত। তারাও ছিল যারা মুসলমানদের ধরে এনে আরবের তপ্ত মরুভূমির ওপর শুইয়ে দিয়ে তাদের বুকের ওপর ততোধিক তপ্ত পাথর চাপা দিত।

১. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১২ পৃ.; সুনান আবী দাউদ, কিতাবুদ দিয়্যাত।
২. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১২ পৃ.।

করুণার সাগর রসূলুল্লাহ (সা) তাদের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, তোমাদের কি জানা আছে আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে যাচ্ছি?

তারা যদিও অত্যাচারী ছিল, জালিম ছিল, দুর্ভাগা ছিল, কিন্তু তারা মানুষের মেযাজ বুঝত। তারা চীৎকার দিয়ে বলে উঠল, আপনি আমাদের মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভ্রাতুষ্পুত্র।

ইরশাদ হলো, لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فاذهبوا فانتم الطلقاء। "তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। যাও, তোমরা মুক্ত।"[১]

মক্কার কাফিররা মুসলমান মুহাজিরদের সকল ঘর-বাড়ি দখল করে নিয়েছিল। আজ ছিল সময় যখন তাদের লুণ্ঠিত হক প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দয়ার নবী মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের হৃত সম্পদের ওপর থেকে তোমাদের দাবি প্রত্যাহার করে নাও।

সালাতের ওয়াক্ত হতেই হযরত বেলাল (রা) কা'বার দেওয়ালের ওপর চড়ে আযান দেন। সেই অবাধ্য ও বিদ্রোহী স্বভাবের লোকগুলো যারা এখন বিনীত ও পোষ মেনেছে, তাদের মর্যাদাবোধের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পুনরায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তাদের একজন আত্তাব ইবন উসায়দ বলল, আল্লাহ আমার পিতার সম্মান রেখেছেন যে, তিনি এই আওয়াজ শোনার পূর্বেই তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। কুরায়শদের আরেক নেতা বলল, এখন বেঁচে থাকাটা বেকার ও অর্থহীন।[২]

তিনি সাফায় একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে বসলেন। যে সব লোক ইসলাম কবুল করার জন্য আসত তাঁর হাতে বায়'আত হতো। পুরুষদের পালা শেষ হলে মহিলারা আসতে শুরু করল। মহিলাদের বায়আতের তরীকা ছিল এই ঃ প্রথমে তাদের থেকে ইসলামের রোকন ও চারিত্রিক সৌন্দর্যসমূহ অনুসরণের স্বীকৃতি নেওয়া হতো। এরপর এক পেয়ালা পানির ভেতর রসূল আকরাম (সা) হাত ডুবাতেন, তারপর তা থেকে হাত বের করে নিলে মহিলারা ঐ পেয়ালাতে হাত ডুবাত। এর মাধ্যমে বায়আতের অঙ্গীকার পাকাপোক্ত হয়ে যেত।[৩]

আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন দশজন ছিল যারা ছিল কুরায়শদের মাথার মুকুট। এদের একজন ছিল সফওয়ান ইবন উমায়্যা। সে জেদ্দার দিকে পালিয়ে যায়। উমায়র ইবন ওয়াহ্ব নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়ে আবেদন জানায়, আরব সর্দার মক্কা থেকে নির্বাসনে চলে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিরাপত্তা

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১২ পৃ.। এ ধরনের বর্ণনা মুসনাদ আহমদেও আছে, ৫ম খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।
২. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১৩।
৩. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১২০-২১ পৃ.।

দেন, দেন অভয় এবং এরই প্রতীক হিসাবে উমায়র-এর হাতে নিজের পাগড়ী খুলে দেন। উমায়র জেদ্দায় গিয়ে তাকে অভয় দেন এবং মক্কায় ফিরিয়ে আনেন। হুনায়ন যুদ্ধ অবধি সে ইসলাম কবুল করে নি।[১]

আবদুল্লাহ্ ইবন যিবা'রা ছিল আরবের অন্যতম কবি। সে কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর কুৎসা গাইত এবং কুরআনুল করীম-এর টিপ্পনি কাটত। সেও এ সময় মক্কা থেকে নাজরানে পালিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করে।[২]

হারিছ ইবন হিশাম-এর কন্যা উম্মু হাকীম ছিলেন ইকরিমা ইবন আবী জেহেলের স্ত্রী। তিনি অর্থাৎ উম্মু হাকীম মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী ইকরিমা ইসলাম থেকে পালিয়ে ইয়ামান যান। উম্মু হাকীম ইয়ামান গিয়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত জানান। তিনি মুসলমান হন এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। নবী করীম (সা) তাঁকে দেখতেই আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপনের উদ্দেশে এত দ্রুত অগ্রসর হন যে, সে সময় তাঁর পবিত্র শরীরে চাদর পর্যন্ত ছিল না। এরপর তিনি ইকরিমা থেকে বায়'আত নেন।[৩]

ওয়াহ্শীকেও ক্ষমা করা হয়, যে হযরত আমীর হামযা (রা)-কে প্রতারণাপূর্বক শহীদ করে দিয়েছিল। অতঃপর তাঁর লাশ মুবারককে অসম্মান করেছিল।[৪]

মক্কা বিজয়ের পরের দিনের ঘটনা। নবী করীম (সা) কা'বা ঘর তওয়াফ করছিলেন। ফাদালা ইবন উমায়র মওকা বুঝে এই সুযোগে নবী করীম (সা)-কে হত্যার সংকল্প করল এবং এই উদ্দেশে নিকটবর্তী হলো। এ সময় নবী করীম (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ফাদালা নাকি হে! ফাদালা বলল, হ্যাঁ।

নবী করীম (সা) বললেন, তুমি এক্ষণে মনে মনে কী অভিপ্রায় পোষণ করছিলে? ফাদালা বলল, কৈ কিছু না তো! আমি তো আল্লাহ আল্লাহ করছিলাম। নবী করীম (সা) তার এই কথা শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তোমার আল্লাহ্র কাছে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এই বলে তিনি ফাদালার বুকের ওপর নিজের হাত রাখলেন।

এরপর ফাদালার বক্তব্য শুনুন ঃ

"নবী করীম (সা) তাঁর হাত আমার বুকের ওপর রাখতেই দিলে এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং মহানবী (সা)-র প্রেম ও ভালবাসা আমার দিলে এমত পরিমাণে সৃষ্টি হয়ে গেল যে, হুযূর (সা) থেকে অধিকতর ভালবাসার পাত্র আমার আর কেউ রইল না।

১. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১৪-৪১৮ পৃ.।
২. ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১৮-১৯ পৃ.; দালাইলুন নবূওত, ৯৯ পৃ.।
৩. দালাইলুন নবূওত, বায়হাকীকৃত, ৫ম খণ্ড, ৯৫ পৃ.।
৪. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃ.।

"এরপর আমি ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তায় আমার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা যার সান্নিধ্যে আমি অবস্থান করতাম। সে আমাকে বলল, ফাদালা! আমার একটা কথা শুনে যাও। আমি জওয়াব দিলাম, না, না। আর তা হয় না। আল্লাহ ও ইসলাম আমাকে এসবের অনুমতি দেয় না, বরং এর থেকে নিষেধ করে"।[১]

হুনায়ন যুদ্ধ

মক্কা বিজয় সম্পন্ন হতেই পার্শ্ববর্তী সকল গোত্র ও কবিলাই কার আগে কে ইসলাম কবুল করবে নিজেরাই তার প্রতিযোগিতা শুরু করল।[২] কিন্তু হাওয়াযিন ও ছাকীফ নামক দু'টো কবিলার ওপর এর প্রতিক্রিয়া হলো উল্টো। কবিলা দু'টোই ছিল অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং যুদ্ধ ও রণকৌশল সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। ইসলাম যতই শক্তিশালী হচ্ছিল এদের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়ছিল এই ভেবে যে, তাদের সাম্রাজ্য ও বিশেষ অবস্থানগত মর্যাদা এই বুঝি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই ভেবে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হাওয়াযিন নেতৃবর্গ সমগ্র আরব সফর করে এবং সর্বত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগায়। গোটা বছর ধরে তারা তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অধিকন্তু সকল আরব গোত্রই মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হামলার ব্যাপারে একমত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের ফলে তাদের দৃঢ়মূল ধারণা জন্মে যায়, এখনই যদি এর একটা হেস্তনেস্ত করা না যায় তাহলে কোন শক্তিই ইসলামকে অবদমিত করতে পারবে না।[৩]

নবী করীম (সা.) রওয়ানা হবার সময় তাদের কাছে এই ভুল খবর গিয়ে পৌঁছে যে, তিনি তাদেরকেই আক্রমণ করতে আসছেন। সেজন্য আর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। ফলে আকস্মিকভাবেই তারা নিজেরাই অত্যন্ত জোরেশোরে হামলা করার জন্য অগ্রসর হলো। তাদের উৎসাহের পরিমাণ কেমন ছিল তা এ থেকেই অনুমান করা যাবে যে, সকল গোত্রই তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল[৪] এই প্রত্যাশায় যে, যদি নারী ও শিশু তাদের সাথে থাকে তাহলে তাদের জীবন রক্ষার্থে তারা জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও লড়াই করবে।[৫]

এই যুদ্ধে যদিও ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের সকল শাখাই শরীক ছিল, তথাপিও কা'ব ও কিলাব নামক দু'টি শাখা গোত্র পৃথক ছিল অর্থাৎ তারা এই যুদ্ধে যোগ দেয় নি। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের জন্য দু'জন লোক নির্বাচন করা হয় : মালিক ইব্‌ন আওফ ও দুরায়দ ইবন সিম্মা। মালিক ইবন আওফ ছিল হাওয়াযিন গোত্রের শ্রেষ্ঠতম নেতা তথা রঈস-এ আজম। আর দুরায়দ ইবন সিম্মা ছিল

---

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪১৭ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, مكارم لنبى صـ بمكة।
৩. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী, ১ম খণ্ড, ৫৩০-৩১ পৃ.।
৪. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃ.।
৫. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৫৩১ পৃ.।

আরবের মশহূর কবি ও জুশাম কবিলার সর্দার। তার কবিতা চর্চা ও যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের খ্যাতি অদ্যাবধি আরবের ইতিহাসে স্মৃতি হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু হলে কি হবে! এ সময় তার বয়স ছিল একশ'-এর বেশি। কেবল হাড্ডির একটি কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু আরবরা তাকে খুব মান্য করত এবং তার মতামত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশলের ওপর সমগ্র দেশবাসীর আস্থা ছিল, স্বয়ং মালিক ইব্ন আওফ তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল বিধায় তাকে পালংকে উঠিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসা হয়। দুরায়দ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই জানতে চাইল, এটি কোন জায়গা? লোকেরা বলল, আওতাস। দুরায়দ বলল, হ্যাঁ, যুদ্ধের জন্য জায়গাটি উপযোগী বটে। এ ভূমি না খুব বেশি শক্ত, আবার এত নরমও নয় যে, পা ধসে যাবে। এরপর জিজ্ঞেস করল, বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। ব্যাপার কী? লোকেরা জানায়, শিশু ও মহিলারা সাথে এসেছে যাতে করে কেউ পালাতে না পারে। দুরায়দ বলল, একবার পদস্খলন ঘটলে কোন কিছুই আর আটকাতে পারে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কেবল তলোয়ারই কাজে লাগে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পরাজয়ই ঘটে তাহলে মহিলাদের কারণে আরও বেশি যিল্লতির বোঝা বইতে হয়।

এরপর দুরায়দ আবার জিজ্ঞেস করল, কা'ব ও কিলাবও কি যুদ্ধে শরীক হয়েছে? যখন সে জানতে পারল, সম্মানিত কবিলা দু'টোর একজন লোকও যুদ্ধক্ষেত্রে আসে নি, তখন সে বলল, যদি আজকের দিনটি সম্মান ও সৌভাগ্যের দিন হতো তাহলে কা'ব ও কিলাব অনুপস্থিত থাকত না। তার অভিমত ছিল, ময়দান থেকে সরে গিয়ে কোন নিরাপদ ও সুরক্ষিত জায়গায় ফৌজ একত্র করা হোক এবং সেখানেই যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হোক। কিন্তু তিরিশ বছরের যুবক মালিক ইবন আওফের টগবগে খুন তার এই অভিমত মানতে পরিষ্কার অস্বীকার করল এবং বলল, আপনি অথর্ব হয়ে গেছেন এবং আপনার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে।[১]

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসব ঘটনা জানতে পেরে এসবের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আবদুল্লাহ ইবন আবী হাদরাদকে পাঠান। তিনি গুপ্তচর সেজে হুনায়ন আসেন এবং সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করে সমগ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।[২] মহানবী (সা) তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের রসদ ও সাজ-সামানের জন্য ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয়। আবূ জেহেলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবন রবী'আ খুবই ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার থেকে তিরিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করা হয়।[৩] মক্কার বিখ্যাত সর্দার সফওয়ান ইবন উমায়্যা, মেহমানদারিতে

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৪৬৬ পৃ.; সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩৩৮-৩৯ পৃ.।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃ; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৪০ পৃ.।
৩. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৫৩৩ পৃ.।

যে ছিল খুবই মশহূর, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে ইসলাম কবুল করে নি, তার থেকেও নবী করীম (সা) যুদ্ধাস্ত্র ধার চান। সে এক শ' লৌহ বর্ম ও আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র ধার দেয়।[১]

৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে তথা ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী মাসে বারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মহানবী (সা) হুনায়ন-এর দিকে অগ্রসর হন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই বিশাল বাহিনী দৃষ্টে একটু আত্মশ্লাঘার শিকার হন। ফলে তাঁদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আজ আমাদের বিরুদ্ধে আর কে জয়লাভ করতে পারে! আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের এই আত্মশ্লাঘা অপছন্দনীয় হয়।[২] তাঁদের এই আত্মশ্লাঘার পরিণতি কী হয়েছিল তার বর্ণনা কুরআনুল করীমের ভাষাতেই শোনা যাক ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا - وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ -

"আর বিশেষ করে হুনায়ন-এর (যুদ্ধের) দিনের কথা (স্মরণ কর) যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জন্য গর্বিত ছিলে, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং পৃথিবী বিস্তৃতি সত্ত্বেও তোমাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর রসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর 'সকীনা' তথা প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক সেনাদল প্রেরণ করলেন যা তোমরা দেখ নি। আর কাফিরদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের শাস্তি" (সূরা তওবাহ্)।

মুসলমানরা যুদ্ধের প্রথম দিকে জিতেছিল এবং লোকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে এ সময় শত্রুপক্ষের তীরন্দাযরা মুষলধারে তীর বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলমানদের সেনাসারির শৃঙ্খলা ও বিন্যাস ভেঙে পড়ে, তাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[৩]

হযরত আবূ কাতাদা (রা), যিনি এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন, বলেন ঃ যখন লোকেরা পালাচ্ছিল তখন আমি দেখতে পেলাম, জনৈক কাফির একজন মুসলমানের বুকের ওপর চড়ে বসেছে। আমি পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর

১. সুনান বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৯ পৃ.; আবূ দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৫৩৩, ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৬৪।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হুনায়ন।

তলোয়ারের আঘাত হানলাম যা তার লৌহবর্ম কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। সে ফিরে আমাকে এমন জোরে চেপে ধরল যে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কিন্তু তার আঘাত গুরুতর ছিল বিধায় ক্রমেই সে নিস্তেজ হয়ে পড়ল এবং এক সময় নীরব ও নিথর হয়ে পড়ে গেল। ইতোমধ্যে আমি হযরত ওমর (রা)-কে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মুসলমানদের অবস্থা কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ফয়সালা এটাই ছিল।[১]

বাহ্যিক এই পরাজয়ের বিভিন্ন কারণ ছিল। অগ্রবর্তী সেনাদলের সেনানায়ক ছিলেন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)। এই দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন মক্কার সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিম তরুণ যারা তারুণ্যের অহমিকায় তেমন করে অস্ত্র-সজ্জিত না হয়েই যুদ্ধের ময়দানে এসেছিল। এদের সংখ্যা ছিল দু'হাজার। এমন কিছু সদস্যও ছিল যারা তখনও ইসলাম কবুল করে নি। তদুপরি হাওয়াযিন গোত্র তীরন্দাযীতে গোটা আরবেই ছিল মশহুর। এক্ষেত্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিক্ষিপ্ত তীর সাধারণত ব্যর্থ হতো না। অধিকন্তু তারা পূর্বেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে সুবিধাজনক জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছিল এবং তীরন্দাযরা পাহাড়ের ঘাঁটি, গুহা ও গিরিপথে নিজেদের মোতায়েন করেছিল।[২]

বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হচ্ছিল। বার হাজার সৈন্য হাওয়া হয়ে গেল। কেবল একজন বরকতময় সত্তা পাহাড়ের ন্যায় অনড় ও অটল রইলেন যিনি একাই ছিলেন এক বিরাট সেনাদল, একটি দেশ, একটি মহাদেশ, একটি জগত, বরং সম্মানিত সমগ্র সৃষ্টিকুল।[৩]

নবী করীম (সা) তাঁর ডান দিকে তাকালেন এবং ডাক দিলেন, يامعشر انصار! "হে আনসার সম্প্রদায়!" ডাক দিতেই উত্তর ভেসে এল, আমরা হাজির। এরপর তিনি বাম দিকে ঘুরে ডাক দিলেন। একই উত্তর ভেসে এল। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এলেন এবং জালালে নবুওতের স্বরে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।[৪]

বুখারী শরীফের অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তাঁর যবান মুবারকে তখন নিম্নোক্ত কবিতার চরণটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب -

"আমি নবী, মিথ্যা নয় তা; আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, মিথ্যা নয় তাও"।[৫] হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। নবী করীম (সা)

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হুনায়ন যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৫৩৫ পৃ.।
৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৫৩৫-৩৮; ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় পরাজয়ের কতিপয় কারণ আলোচনা করেছেন।
৪. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, তায়েফ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৫. প্রাগুক্ত, হুনায়ন যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

তাঁকে মুহাজির ও আনসারদের ডাক দেবার জন্য বললেন। তিনি ডাক দিলেন, يامعشر الانصار ওহ আনসার সম্প্রদায়! ওহে যারা বায়আতে রিদওয়ানে শরীক ছিলে! يا اصحاب السمرة প্রভাবমণ্ডিত আওয়াজ কানে পড়তেই সমগ্র ফৌজ হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল। যাঁদের ঘোড়া দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়াবহ যুদ্ধের দরুন তাৎক্ষণিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে নি তাঁরা শরীরে পরিহিত লৌহবর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েন। ফলে হঠাৎ করেই যেন যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রের গোটা চিত্রই যায় পাল্টে।[১] কাফিররা পালাতে থাকে আর যারা পালাতে পারে নি তারা বন্দী হয়। ছাকীফ গোত্রের একটি শাখা বনূ মালিক দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের সত্তর জন মারা যায়। তাদের পতাকাবাহী উছমান ইবন আবদুল্লাহ্ মারা যেতে তারাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।[২]

পরাজিত ফৌজ চতুর্দিক থেকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আওতাসে এসে জমায়েত হয় এবং কিছু সংখ্যক তায়েফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের সাথে তাদের সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফও ছিল।[৩]

দুরায়দ ইবনুস-সিম্মাহ কয়েক হাজার সৈন্যসহ আওতাসে এসে উপস্থিত হয়। নবী করীম (সা) আবূ আমের আশ'আরীর নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক ফৌজ এদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করবার জন্য প্রেরণ করেন। আবূ আমের দুরায়দ-এর পুত্রের হাতে শাহাদত লাভ করেন। মুসলিম ফৌজের পতাকা ছিল তাঁর হাতে। তাঁর শাহাদতের পর এ পতাকা দুরায়দ-পুত্রের হস্তগত হয়। এ অবস্থাদৃষ্টে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) অগ্রসর হয়ে প্রচণ্ড বেগে হামলা করেন। অতঃপর শত্রু সৈন্য নির্মূল করত পতাকা তার থেকে ছিনিয়ে নেন।[৪] ইবন দুরায়দ উটের পিঠে হাওদায় আরোহী ছিল। রবী'আ ইবন রফী' তার ওপর তলোয়ারের আঘাত হানেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সে তখন বলে, তোমার মা দেখি তোমাকে ভাল অস্ত্রও দেয় নি। এরপর আবার বলে, আমার উটের পিঠের হাওদাতে তলোয়ার আছে, বের করে নাও এবং যখন মার কাছে ফিরে যাবে তখন বলবে, আমি দুরায়দকে কতল করেছি। রবী'আ ইব্ন দুরায়দকে হত্যার পর মাকে গিয়ে বললে মা বলেছিল, আল্লাহ্র কসম! দুরায়দ তোমার তিন মাকে মুক্ত করিয়েছিল।[৫]

যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজারেরও বেশি। এদের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর দুধ বোন হযরত শায়মা'ও ছিলেন। লোকেরা যখন তাঁকে বন্দী করেছিল

১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, ওয়াস-সিয়ার, হুনায়ন যুদ্ধ; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ৫ম খণ্ড, ৩৮০-৮১।
২. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৪৯-৫০।
৩. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৫৩.।
৪. প্রাগুক্ত, ৪৫৪ পৃ.; বুখারী, আওতাস যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।
৫. প্রাগুক্ত, ৪৫৩ পৃ; তাবারী, ২য় খণ্ড ১৭০ পৃ.।

তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাদের পয়গম্বরের দুধ বোন। এ কথার সত্যতা নিরূপণের জন্য তারা তাঁকে নবী করীম (সা) সমীপে নিয়ে এলে তিনি তাঁর পিঠ খুলে দেখালেন এবং বললেন, একবার শৈশবে আপনি আমাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়েছিলেন। এটা তারই দাগ। ভালবাসার আবেগে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি তাঁকে বসবার জন্য তাঁর চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন, স্নেহ-মমতার কথা বললেন। এরপর তাঁকে কিছু উট ও বকরী প্রদান করে বললেন, আপনি চাইলে আমার বাড়ি চলুন, সেখানে থাকবেন। আর নিজের বাড়ি যেতে চাইলে আমার লোকেরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তিনি তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজনের মাঝে ফিরে যেতে চাইলেন। অতঃপর তাঁকে পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়।[১]

হুনায়নের অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্যরা তায়েফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তায়েফ ছিল সুরক্ষিত নগরী। তায়েফকে এজন্যই তায়েফ বলা হতো যেহেতু তার চতুষ্পার্শে সুরক্ষিত নিরাপত্তা প্রাচীর ছিল। এখানে বনূ ছাকীফের যেই সম্প্রদায় বসত করত তারা শৌর্য-বীর্যে সমগ্র আরবে মশহূর ও বিশিষ্ট ছিল এবং সকল দিক দিয়েই তারা কুরায়শদের সমকক্ষ ছিল। ওরওয়া ইব্ন মাসউদ ছাকাফী ছিলেন এখানকার রঈস। তিনি কুরায়শ সর্দার আবূ সুফিয়ানের জামাতা ছিলেন। মক্কার কাফিররা বলত, কুরআন যদি নাযিলই হবে তাহলে মক্কা ও তায়েফের নেতৃবৃন্দের ওপরই তা নাযিল হতো। এখানকার লোকেরা সমরশাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল।[২] ঐতিহাসিক তাবারী ও ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ওরওয়া ইব্ন মাসউদ ও গায়লান ইব্ন সালামা ইয়ামনের একটি জেলা জারাশে গিয়ে দুর্গবিধ্বংসী যন্ত্রপাতি যেমন দাবাবা, সনূবর ও মিনজানীক বানাবার ও ব্যবহারের নিয়ম-প্রণালী শিখেছিল।[৩]

এখানে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। শহরের অধিবাসী ও পরাজিত সৈনিকরা মিলে এর সংস্কার করে। গোটা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার জমা করে। চতুর্দিকে মিনজানীক জায়গা মুতাবিক স্থাপন করে।[৪]

নবী করীম (সা) হুনায়ন থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন, ওসব জি'ইর-রানায় নিয়ে হেফাজত করা হোক এবং স্বয়ং তায়েফ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। হযরত খালিদ (রা)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে প্রথমেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তায়েফ অবরোধ করা হয়।

১. ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড, ৪৫৮ পৃ.; তাবারী, ১৭১ পৃ.।
২. সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, ৫৪১ পৃ.।
৩. ইব্ন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭৮ পৃ.।
৪. তাবাকাত ইবন সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৫৮ পৃ.।

ইসলামে এই প্রথমবারের মত দুর্গবিধ্বংসী যন্ত্র অর্থাৎ দাবাবা ও মিনজানীক ব্যবহার করা হয়। দাবাবার ওপর দুর্গের লোকেরা লোহার গরম স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে এবং এত প্রচণ্ডভাবে তীর বর্ষণ করে যে, আক্রমণকারীদের পিছু হটতে হয়। অনেকেই আহত হন। বিশ দিনের মত অবরোধ স্থায়ী হয়। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও শহর জয় করা সম্ভব হয় না।[১] নবী করীম (সা) নওফল ইবন মুআবিয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? তিনি বলেন, শেয়াল গর্তে ঢুকে গেছে। প্রয়াস অব্যাহত থাকলে ধরা পড়বে। ছেড়ে দিলেও আশংকার কোন কারণ নেই। যেহেতু কেবল প্রতিরোধ করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাই নবী করীম (স) অবরোধ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের বিরুদ্ধে বদদোআ করার জন্য বললে তিনি দোআ করলেন, اللهم اهدثقيفا وائت بهم। "হে আল্লাহ! তুমি ছাকীফকে হেদায়েত দাও এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।"[২]

অবরোধ প্রত্যাহারপূর্বক তিনি জি'ইর-রানায় তশরীফ নেন। সাথে ছিল বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ-সামগ্রী। এসবের মধ্যে ছিল ছ'হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার বকরী ও চার হাজার আওকিয়া রৌপ্য। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি তাদের আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের আগমনের অপেক্ষায় থাকেন যাতে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পরও যখন কেউ আসল না তখন সে সব সম্পদ পাঁচ ভাগ করা হয়। নিয়ম মাফিক চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করা হয় এবং এক ভাগ বায়তুল মাল ও গরীব মিসকীনদের জন্য রেখে দেওয়া হয়।

মক্কার অধিকাংশ নেতা, যারা কেবলই ইসলাম কবুল করেছিল, যাদের বিশ্বাস তখন পর্যন্ত দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল, কুরআনুল করীমের ভাষায় যাদেরকে مولفة القلوب। বলা হয়েছে, কুরআন মজীদে যাকাতের ব্যাখা বর্ণনায় এদের নামেরও উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম (সা) তাদেরকে উদার ও অকৃপণভাবে ধন-সম্পদ দান করেন।[৩]

যাদেরকে অকৃপণভাবে দান করা হয় তারা সাধারণত সকলেই ছিল মক্কার অধিবাসী এবং সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিম। এতে আনসারদের কেউ কেউ আহত হন। কেউ কেউ তো বলেই বসেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদেরকে পুরস্কৃত করলেন আর আমাদেরকে করলেন মাহরূম। অথচ আজও আমাদের তলোয়ার থেকে কুরায়শদের রক্ত ঝরছে। কেউ কেউ এতদূর পর্যন্ত বলে বসেন, বিপদে পড়লে আমরা আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পায় অন্যে।

১. সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৮২-৮৩ পৃ.; তাবাকাত ইবন সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৫৮ পৃ.।
২. তাবাকাত ইবন সাদ, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃ.; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৮৮ পৃ.।
৩. দালাইলুন নবুওয়াত, ৫ম খণ্ড, ১৭১ পৃ.; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃ.; সীরাতুন্নবী,১ম খণ্ড, ৫৪২-৪৩ পৃ.; বুখারী ও মুসলিমে উদার হস্তে দানের কথা রয়েছে।

এ ধরনের মন্তব্য ও কানাঘুষা শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছে। তিনি আনসারদের ডাকলেন এবং চর্মনির্মিত একটি তাঁবুতে জড়ো করলেন। এরপর আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? লোকেরা জানাল, হুযূর! আমাদের নেতৃস্থানীয় ও প্রবীণদের মধ্যে কেউ এসব কথা বলেনি। কতিপয় অপরিণত বয়স্ক তরুণ এসব বলেছে। বুখারী শরীফের 'মানাকিবুল আনসার' শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন নবী করীম (সা) আনসারদের ডেকে বললেন, এসব কী ব্যাপার? যেহেতু আনসাররা মিথ্যা বলত না বিধায় তাঁরা সত্য স্বীকার করলেন। বললেন, আপনি যা শুনেছেন তা সত্য।[১]

এরপর তিনি আনসারদের লক্ষ্য করে এমন এক ভাষণ দিলেন অলংকারশাস্ত্রে এর কোন নজীর মিলবে না। আনসারদের বললেন, "এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, গোমরাহ ছিলে? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়েত দান করলেন। তোমরা অনৈক্যের শিকার ছিলে, বিশৃঙ্খল ছিলে; আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করলেন। তোমরা গরীব ছিলে, আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের ধনী বানিয়েছেন।" এভাবে তিনি এক একটি বাক্য বলে চলেছিলেন আর আনসাররা প্রতিটি কথার শেষে বলছিলেন, "আল্লাহ্র রসূল সত্য বলছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এহসান আমাদের ওপর সবচে' বেশী।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, বরং তোমরা বল, "হে মুহাম্মদ (সা)! মানুষ যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল তখন আমরাই আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনেছিলাম। লোকে যখন আপনাকে পরিত্যাগ করেছিল তখন আমরাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আপনি দরিদ্র ও অসহায় ছিলেন আর আমরাই আপনাকে সর্বপ্রকারে ও সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করেছি।"

এই বলে তিনি বললেন, "তোমরা এই জওয়াব দিতে থাক আর আমি বলতে থাকি, তোমরা সত্য বলছ। কিন্তু ওহে আনসার! তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, এসব লোক উট ও ভেড়া-বকরী নিয়ে ঘরে যাক আর তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে নিজেদের ঘরে যাও।"

একথা শুনতেই আনসাররা বেএখতিয়ার চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, "আমরা কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে চাই।"

অতঃপর অধিকাংশের অবস্থা হয়েছিল এই, কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের দাড়ি ভিজে গিয়েছিল। এরপর তিনি তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, মক্কার লোকেরা কেবলই

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, তায়েফ যুদ্ধ; কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবুল আনসার শীর্ষক অধ্যায়।

ইসলাম কবুল করেছে। আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা তাদের প্রাপ্য বা অধিকার হিসাবে দেইনি, বরং তাদের মনকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দানের উদ্দেশেই দিয়েছি।[১]

হুনায়নের যুদ্ধবন্দীরা তখন পর্যন্ত জি'ইর-রানায় সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ইতোমধ্যে তাদের পক্ষ থেকে বন্দীদের মুক্ত করার লক্ষ্যে একজন সম্মানিত দূত নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। বন্দী গোত্র ছিল হযরতের দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা)-র গোত্র। গোত্রের সর্দার বক্তৃতা করেন এবং নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, "যেসব মহিলা বন্দীশালায় বন্দিনী অবস্থায় রয়েছে তাদের মধ্যে আপনার ফুফু ও খালাও আছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আরব সর্দারদের শাসক কেউ যদি আমাদের খান্দানের দুধ পান করত তাহলে আমরা তার কাছে অনেক কিছু আশা করতাম। আর আপনার কাছে তো আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক বেশী।"

নবী করীম (সা) তাদের কথার প্রত্যুত্তরে বললেন, আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের লোকদের ভাগে যেসব বন্দী পড়েছে তাদের তোমরা নিয়ে যেতে পার। কিন্তু সকলের ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, সালাতের পর প্রকাশ্য সমাবেশে তোমরা তোমাদের দরখাস্ত পেশ করবে। এরপর জোহর সালাত অন্তে মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশে তারা তাদের বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে দরখাস্ত পেশ করল। এ সময় নবী করীম (সা) বললেন, আমার কেবল আমার খান্দানের ওপর এখতিয়ার আছে। বাকী রইল সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপার। তা আমি সকলের কাছে তাদের আওতাধীন বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য সুপারিশ করছি। একথা বলতেই সকল মুহাজির ও আনসার একযোগে বলে উঠলেন, আমরা আমাদের লোকদেরও মুক্তি দিচ্ছি। এভাবে ছ' হাজার বন্দী একই সঙ্গে মুক্তি পেয়ে যায়।[২]

তবুক যুদ্ধ

সিরিয়া থেকে একটি কাফেলা এল এবং তারা জানাল, রোমক সেনাবাহিনী মদীনার ওপর হামলা করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। লাখম, জুযাম ও আমেলা, গাসসান প্রমুখ আরবের খ্রিস্টান গোত্র তাদের সহযোগী হিসাবে আসছে।[৩]

নবী করীম (সা) সমীচীন মনে করলেন, আক্রমণোদ্যত সেনাবাহিনীকে আরব ভূখণ্ডে প্রবেশের পূর্বেই প্রতিরোধ করা দরকার যাতে দেশের অভ্যন্তরে বিরাজিত শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন না হয়।

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, তায়েফ যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়; কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবিল আনসার অধ্যায়।
২. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃ.; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৪৮৮-৮৯ পৃ.।
৩. তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৬৫।

এই মুকাবিলা ছিল এমন এক সাম্রাজ্যের সঙ্গে অর্ধ পৃথিবী ছিল যার অধীন এবং যার ফৌজ এই সেদিন বিশাল পারসিক সাম্রাজ্যকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল।[১]

মুসলমানরা ছিল সহায়-সম্বলহীন। অধিকন্তু এ সফর ছিল দূর পথের। আরবের প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ ছিল উত্তুঙ্গে। এদিকে মদীনায় তখন ফসল পাকার মৌসুম। পাকা ফল খাওয়া ও ফলবান বৃক্ষের সুনিবিড় ছায়ায় বিশ্রাম নেবার সময়।[২]

নবী করীম (সা) যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও রসদ-সম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণ চাঁদা আদায়ের খাতা খুললেন। হযরত উছমান গনী (রা) তিন শত উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া ও এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চাঁদা হিসাবে দিলেন। দরবারে নবুওত থেকে তিনি مجهزه جيش العسرة খেতাব পেলেন।[৩]

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) দিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম।[৪]

হযরত ওমর ফারূক (রা) তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন যার মূল্য হবে কয়েক হাজার দিরহাম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যা আনলেন, মূল্য হিসেবে যদিও তা কম ছিল কিন্তু তার ওযন ছিল অনেক বেশী। জানা গিয়েছিল এ সময় তাঁর ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না।[৫]

আবূ আকীল আনসারী (রা) দু'সের খেজুর এনে পেশ করলেন এবং নিবেদন পেশ করলেন, রাত ভর কুয়া থেকে পানি তুলে যমীন ভিজিয়েছি। পারিশ্রমিক হিসাবে চার সের খেজুর পেয়েছিলাম। দু'সের বিবি-বাচ্চার জন্য রেখে বাকী দু'সের নিয়ে এসেছি। নবী করীম (সা) তাঁর দান গ্রহণ করে বললেন, এগুলো স্তূপীকৃত মাল-মাত্তার ওপর ছড়িয়ে রেখে দাও।[৬]

মোটের ওপর সকল সাহাবীই যিনি যার সাধ্য মতো এ সময় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ৮২ জনের মতো নামধারী মুসলমান বিভিন্ন বাহানায় মুসলিম ফৌজে শরীক না হয়ে নিজেদের বাড়ি-ঘরে অবস্থান করে।[৭] আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়্যি ইবন সলূল ছিল বিখ্যাত মুনাফিক। সে তাদেরকে

১. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৩৬।
২. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫১৬।
৩. সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব উছমান ইবন আফফান; মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৬৩।
৪. তফসীরে তাবারীতে বিশ হাজার দিরহামের উল্লেখ রয়েছে, ১০ম খণ্ড, ১৯১।
৫. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
৬. তফসীরে তাবারী, ১০ম খণ্ড, ১৯৭।
৭. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৫২৯; ইব্ন সা'দ, ২য় খণ্ড, ১৬৫।

নিশ্চয়তা দেয়, এবার আর মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না। রোম সম্রাট কাইজার তাঁদেরকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেবে।[১]

আল্লাহ্‌র নবী তিরিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তবূকের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।[২]

মদীনায় তিনি সিবা ইবন আরফাতাকে আপন খলীফা নিযুক্ত করলেন এবং হযরত আলী মুর্তাযা (রা)-কে আহলে বায়ত-এর আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পাদন ও দেখাশোনা করার জন্য রেখে গেলেন।[৩]

সেনাবাহিনীতে বাহনের অভাব ছিল প্রকট। ১৮ জন মানুষের জন্য ছিল মাত্র একটি করে উট। খাবারের পরিমাণ ছিল এত কম যে, অনেক সময় গাছের পাতা খেতে হয়েছে। ফলে অনেকের ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল। পানির স্বল্পতার দরুন স্বল্প সংখ্যক বাহনের উট যবাই করে উটের পেটে সঞ্চিত পানি পান করতে হয়েছে।[৪]

মোট কথা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যাবতীয় কষ্ট সহ্য করে বাহিনী তবুক গিয়ে উপস্থিত হয়।

তবুক যাবার পথে পথিমধ্যেই হযরত আলী মুর্তাযা (রা) বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। আসলে হয়েছিল কি, হযরত আলী (রা)-কে একা পেয়ে মুনাফিকরা তাঁকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করতে শুরু করেছিল, অকস্মা ভেবে রেখে গেছে। কেউ বলেছিল, সহানুভূতি জানিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে। এসব কথায় শেরে খোদা হযরত আলী মুর্তাযা (রা)-র মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তিনি এক মনযিল দু'মনযিল করে অবশেষে নবী করীম (সা)-এর খেদমতেই গিয়ে হাজির হন। দূর পথের সফরের কষ্ট-ক্লান্তি, তদুপরি প্রচণ্ড রৌদ্রের দরুন হযরত আলী (রা)-র পা ফুলে গিয়েছিল এবং স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সা) এ সময় তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى -

"হে আলী! তুমি কি এতে খুশী নও যে, তুমি আমার জন্য তেমনই যেমন মূসার জন্য ছিল হারূন? কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, আমার পরে কোন নবী নেই।" এ কথা শুনে হযরত আলী মুর্তাযা (রা) খুশী হয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন।[৫]

---

১. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।
২. তাবাকাত ইবন সা'দ, মাগাযী অংশ, ১১৯ পৃ.।
৩. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫১৯ পৃ.।
৪. মাদারিজুন নবূওত, ২য় খণ্ড, ৫৭৭-৫৮০পৃ.।
৫. ইবন হিশাম ২য় খণ্ড, ৫১৯-২০; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, তবূক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়।

তবুকে পৌঁছে নবী করীম (সা) এক মাস অবস্থান করেন। সিরিয়াবাসীর ওপর এই বীরোচিত ও সাহসী অভিযানের প্রতিক্রিয়া হলো, তারা আরব ভূখণ্ডের ওপর হামলার অভিলাষ সে সময় পরিত্যাগ করে এবং নবী করীম (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তা মুলতবী রাখে ঐ সময় এর জন্য উপযোগী মওকা ভেবে।[১]

তবুকে তিনি একবার সালাত আদায় অন্তে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক একটি ভাষণ দেন। নিচে আমরা মূল ভাষণটি অর্থসহ পেশ করছি ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সর্বোত্তম হাম্দ ও ছানা পেশের পর তিনি বলেন ঃ

امابعد ! فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمة التقوى وخيرالملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد ص واشرف الحديث ذكرالله واحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشرالامور محد ثاتها واحسن الهدى هدى الا نبياء واشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الا عمال ما نفع وخير الهدى ما اشبع وشرالعمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خيرمما كثر والهى وشرالمعذرة حين يحضر الموت وشرالندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتى الجمعة الا دبرا ومن لا يذكر الله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من حرجهنم والكنز كى من النار والشعر من مزامير ابليس والخمر جماع الاثم وشرالمأكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن امه وملاك العمل خواتمه وشرالروايا رواياالكذب وكل ماهوات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتأل على الله يكذبه ومن يغفر يغفرله ومن يعف يعف الله عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن

১. রহমাতুল্লিল-আলামীন ১ম খণ্ড, ১৩৭;

يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمعه الله ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله ثم استغفر ثلثا ـ

"সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাণী হলো তাকওয়ার কলেমা ঃ সর্বোত্তম মিল্লাত হলো মিল্লাতে ইবরাহিমী; সর্বোত্তম তরীকা মুহাম্মদ (সা)-এর তরীকা (সুন্নত); সর্বাধিক অভিজাতপূর্ণ কথা হলো আল্লাহ্‌র যিক্‌র; সর্বোত্তম কাহিনী এই আল-কুরআন; সর্বোত্তম কাজ দৃঢ়তাপূর্ণ কাজ; আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো বিদআত (ইসলামের নামে নতুন আবিষ্কৃত ও নবোদ্ভাবিত কাজ); সর্বোত্তম হেদায়েত (দিক-নির্দেশনা বা পথ) আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর হেদায়েত; অভিজাত মৃত্যু হলো শহীদদের মৃত্যু; নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হলো হেদায়েত লাভের পর পথভ্রষ্টতা; সর্বোত্তম আমল হলো তাই যা উপকারী; সর্বোত্তম পথ যা অনুসরণীয় যে পথে মানুষ চলতে পারে; নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হলো হৃদয়ের অন্ধত্ব তথা দিলের অন্ধত্ব; নিচের হাত (গ্রহীতা বা ভিক্ষুকের হাত) থেকে ওপরের হাত (দাতার হাত) উত্তম; অল্প ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সম্পদ সেই প্রাচুর্য থেকে উত্তম যেই প্রাচুর্য মানুষকে অলসতার মাঝে নিক্ষেপ করে।

"নিকৃষ্ট ওযরখাহী তাই যা মৃত্যুকালীন করা হয়; আর নিকৃষ্টতম লজ্জা তাই যা কিয়ামতের দিনে কাউকে পেতে হবে; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জুমুআর দিনে (মসজিদে) আসে বটে, কিন্তু তার দিল থাকে পেছনে; এদের কেউ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে অনাদরে ও অবহেলায় কখনো কখনো; সবচে' বড় গোনাহ হল মিথ্যা কথা বলা; মনের ঐশ্বর্যই হল সবচে' উত্তম ঐশ্বর্য; সর্বোত্তম পাথেয় ও সম্বল হলো তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা; শ্রেষ্ঠতম হিকমত (প্রজ্ঞা) হলো আল্লাহ্‌র ভয়; চিত্ত আকর্ষণকারী সর্বোত্তম বস্তু হলো দিলের য়াকীন; সন্দেহ পোষণ কুফুরী; বুক চাপড়ে ও চীৎকার করে কাঁদা জাহিলী যুগের কাজ; চুরি করা জাহান্নামের শাস্তির উপকরণ; মাতাল হওয়া আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া; কাব্য-কবিতা ইবলীসের যন্ত্র বিশেষ; মদ যাবতীয় গোনাহ্‌র সমাহার; নিকৃষ্টতম আহার্য ও খোরাক হলো পিতৃহীন ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে যে অপরের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে আর প্রকৃত হতভাগা সে যে মাতৃগর্ভ থেকেই হতভাগা; কর্মের পুঁজি তার সর্বোত্তম পরিণতি; মিথ্যা স্বপ্নই নিকৃষ্টতম স্বপ্ন; যা হবার তা সত্বর হবে; মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপ আর তাকে হত্যা করা কুফুরী; মুসলমানের গীবত করা তথা তার অসাক্ষাতে নিন্দা করা আল্লাহর নাফরমানী করা; একজন মুসলমানের ধন-সম্পদ অন্যের জন্য তেমনি হারাম ও নিষিদ্ধ যেমন রক্তপাত করা হারাম। যে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যে কারুর দোষ গোপন করে আল্লাহ্‌ তার দোষ গোপন করেন। যে অন্যকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। যে ক্রোধ দমন করে আল্লাহ্‌ তাকে পুরস্কৃত করেন।

বিপদ-আপদে ও ক্ষতির মুকাবিলায় যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন; যে চোগলখুরী করে আল্লাহ্ তাকে সাধারণ্যে অপমানিত করেন। যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তার (মর্যাদা, স্থিতি) বৃদ্ধি করেন। যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, অবাধ্যতা করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।"[১]

তবূকে অবস্থানকালে হযরত আবদুল্লাহ যুল-বিজাদায়ন (রা) ইনতিকাল করেন। এই নিষ্ঠাবান সাহাবীর আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, নবী করীম (সা) এই দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান সাহাবার ওপর কতটা মেহেরবান ও অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন।

সাহাবীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্। শৈশবে পিতা মারা যায়। চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন। যৌবনে পৌঁছুতেই চাচা তাঁকে উট, বকরী ও দাস-দাসী দিয়ে তাঁর অবস্থা সচ্ছল করে দিয়েছিল। ইসলাম প্রচার শুরু হতেই তিনি এর আওয়াজ শুনতে পান এবং দিলে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু তিনি তাঁর চাচাকে এত ভয় পেতেন যে, তিনি এটির প্রকাশ করতে পারেন নি। অতঃপর নবী করীম (সা) যখন মক্কা বিজয় সমাপন শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন একদিন আবদুল্লাহ্ চাচাকে গিয়ে বললেন ঃ

"চাচাজান! বছরের পর বছর এই অপেক্ষায় অতিবাহিত হয়ে গেল, কখন আপনার দিলে ইসলাম গ্রহণের চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং আপনি কখন ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আপনার অবস্থা সেই আগের মতই রয়ে গেছে (এতটুকু পরিবর্তন আপনার ভেতর দেখা দেয় নি)। আমি আমার জীবনের ওপর বেশি নির্ভর করতে পারছি না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি মুসলমান হই।"

উত্তরে চাচা বলল, দেখ! যদি তুমি মুহাম্মদ-এর ধর্ম গ্রহণ করতে চাও তাহলে আমি তোমার থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেব। তোমার শরীরে যে চাদর রয়েছে, আর পরিধানে যেই লুঙ্গি আছে সেটুকু পর্যন্ত থাকতে দেব না।

আবদুল্লাহ জওয়াবে বললেন, "চাচাজান! আমি অবশ্যই মুসলমান হব এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যই কবুল করব। শির্ক ও মূর্তি পূজার প্রতি আমার মনে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন আপনার মন যা চায় তা করুন। আমার কব্জায় যে সব মাল-মাত্তা আছে তা সবই আপনি নিয়ে নিন। আমি জানি, এ সবই একদিন আমাকে এখানেই দুনিয়াতে ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যেতে হবে। এ সবের জন্য আমি সত্য-সুন্দর ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না।"

আবদুল্লাহ্ এই বলে কাপড় খুলে ফেললেন এবং মার সামনে গেলেন। মা দেখে বিস্মিত হলেন, কী হচ্ছে? আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি মুসলমান ও একত্ববাদী

১. দালাইলুন নবূওত, বায়হাকীকৃত, ৫ম খণ্ড, ২৪১-৪২।

হয়ে গেছি। এখন আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে যেতে চাই। আমার সতর ঢাকার জন্য, লজ্জা নিবারণের মত কাপড় দরকার। মেহেরবানী করে আমাকে তা দিন।

মা তাঁকে একটি কম্বল দিলে তিনি সেটি মাঝখান থেকে ফেড়ে ফেললেন। অর্ধেক লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন আর বাকী অর্ধেক দিয়ে শরীর ঢেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। অবশেষে দীর্ঘ সফর শেষে একদিন প্রত্যূষে মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে পৌঁছুলেন এবং মসজিদের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষমাণ অবস্থায় বসে পড়লেন।

নবী করীম (সা) মসজিদে এসে তাঁকে দেখতেই জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? বললেন, আমার নাম আবদুল উযযা। আমি এক দরিদ্র মুসাফির। সৌন্দর্যের আশিক (প্রেমিক) ও হেদায়েত লাভের প্রত্যাশায় আমি আপনার দুয়ারে এসে হাজির।

নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, "(এখন থেকে) তোমার নাম আবদুল্লাহ্, উপাধি যুল-বিজাদায়ন (দুই টুকরো চাদরের মালিক)। তুমি আমার কাছেই থাকবে এবং মসজিদে অবস্থান করবে।"

আবদুল্লাহ আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। নবী করীম (সা) থেকে তিনি কুরআন শিখতেন এবং সারা দিন অত্যাশ্চর্য আগ্রহ সহকারে ও উৎসাহ ভরে তা তেলাওয়াত করতেন।

একবার হযরত ওমর ফারূক (রা) বললেন, লোকে নামায পড়ছে আর এই আরবী যুবক এত উচ্চ স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করছে যে, অন্যের কেরাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। নবী করীম (সা) তখন তাঁকে বললেন, ওমর! ওকে কিছু বল না। সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এসেছে!

আবদুল্লাহ্র চোখের সামনেই তবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে গিয়ে নিবেদন পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন, আমি যেন আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হই। নবী করীম (সা) বললেন, যাও! কোনো গাছ থেকে বাকল (ছাল) নিয়ে আস। আবদুল্লাহ্ ছাল নিয়ে আসলে নবী করীম (সা) সেই ছাল তার বাযুতে বেঁধে দিলেন এবং মুখে বললেন, "ইলাহী! আমি কাফিরদের ওপর তার রক্ত হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করছি।" আবদুল্লাহ্ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো শাহাদত কামনা করছি।" নবী করীম (সা) বললেন, "যখন জিহাদের নিয়তে তুমি ঘর থেকে বের হবে, এরপর যদি জ্বরেও মারা যাও, তবুও তুমি শহীদই হবে।"

তবুকে পৌঁছে শেষাবধি তাই হলো। আবদুল্লাহ্র গায়ে জ্বর দেখা দিল এবং তিনি পরলোকের পথে পাড়ি জমালেন। বেলাল ইব্ন হারিছ মুযানী বলেন, "আমি

আবদুল্লাহ্‌র দাফনের অবস্থা দেখেছি। রাত্রি কাল। বেলাল (রা)-এর হাতে প্রদীপ। আবূ বকর ও ওমর (রা) তাঁর লাশ কবরে নামাচ্ছেন। এমন সময় নবী করীম (সা) তাঁর কবরে নামলেন এবং আবূ বকর ও ওমর (রা)-কে বললেন, ادنيا الى اخاكما। 'তোমাদের ভাইকে আমার কাছাকাছি করে দাও'। অতঃপর তিনি তাঁর কবরে ইটও নিজের হাতে রাখলেন এবং এরপর দু'আ করলেন, "আল্লাহ্! আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট; তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও।" সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, "এ সময় আমার মন বলছিল, হায়! এই কবরের অধিবাসী যদি আমি হতাম!"[১]

রসূলুল্লাহ্ (সা) তবুক থেকে ফিরলেন এবং মদীনার কাছাকাছি হলেন। এ সময় লোকে আনন্দের আতিশয্যে খোশ আমদেদ জ্ঞাপনের জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। এমন কি পর্দানশীন মহিলারা পর্যন্ত আগ্রহের আধিক্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

যে সব মুনাফিক ভেবেছিল, এবার মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা বন্দী হয়ে অন্য কোন দ্বীপ-উপদ্বীপে প্রেরিত হবে এবং সহী-সালামতে মদীনায় ফিরতে পারবে না তারা খুব লজ্জিত হলো এবং যুদ্ধে না যাবার পেছনে নানাবিধ মিথ্যা অজুহাত পেশ করতে লাগল। নবী করীম (সা) তাদের সবাইকেই মাফ করে দিলেন। কিন্তু যুদ্ধে অনুপস্থিতদের কাতারে তিনজন নিষ্ঠাবান সাহাবীও ছিলেন যাঁরা কেবলই অলসতাবশত নবী করীম (সা)-এর সহগামী হতে ব্যর্থ হন। তাঁরা মিথ্যা ওযর পেশ না করে সত্য ঘটনা বিবৃত করায় তাঁদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

এঁদের মধ্যে একজন বুযুর্গ সাহাবী তাঁর নিজের সম্পর্কে আপন যবানে যা বিবৃত করেছেন এখানে আমরা তাই বর্ণনা করছি। এই সাহাবী ছিলেন হযরত কা'ব ইবন মালিক আনসারী (র)। তিনি সেই ৭৩ জন সাহাবীর অন্তর্গত যাঁরা দ্বিতীয় বায়আতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্ট কবিদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২]

কা'ব (রা)-এর বর্ণনা, "এই সফরে আমার ঘরে থাকাটা শুধুই পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। এমনটি করার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এবং আমার কোন ওযরও ছিল না। সফরের সামানও প্রস্তুত ছিল। ভাল উটও আমার কাছে বর্তমান ছিল। আমার আর্থিক অবস্থা এতটা ভাল ছিল যা এর আগে কখনো ছিল না। এই সফরের জন্য আমি দু'টো শক্ত-সমর্থ উটও কিনেছিলাম, অথচ এর আগে আমার কাছে এক সাথে কখনোই দু'টো উট হয়নি। লোকে সফরের প্রস্তুতি নিত এবং এ ব্যাপারে

১. মাদারিজুন নবুওত, ২য় খণ্ড, ৯০-৯১; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫২৭-২৮ পৃ.।
২. রহমাতুল্লিল-আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।

মনে কোন সংশয় ছিল না। আমি ভেবে রেখেছিলাম যেদিন লোকে যাত্রা করবে আমি সেদিনই বেরিয়ে পড়ব। ইসলামী সেনাবাহিনী যেদিন রওয়ানা হলো সেদিন আমার অল্প কিছু কাজ ছিল। আমি মনে মনেই বললাম, ঠিক আছে! আমি কাল গিয়ে মিলিত হব। দু'তিন দিন এভাবেই অলসতা আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে কেটে গেল। এক্ষণে বাহিনী এত দূর চলে গেছে যে, তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে গেল। আমার কষ্ট লাগছিল, কি দিয়ে কী হয়ে গেল।

"একদিন আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমি সেই সব মুনাফিক ছাড়া যারা মিছামিছি মিথ্যা কথা বলায় ও মিথ্যা বাহানা পেশে অভ্যস্ত ছিল অথবা যারা নিতান্তই মা'যূর ছিল, আর কাউকে রাস্তায় পেলাম না। এ কথা বলে আমার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল দুঃখে ও শোকে। এ দিনটিও আমার এভাবে অতিবাহিত হলো। শেষাবধি নবী করীম (সা) তবুক থেকে ফিরেও এলেন। এখন আমি ভেবে হয়রান হচ্ছিলাম, কি করব, কী বলব এবং কীভাবে আল্লাহ্‌র রসূলের শাস্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাব। লোকে আমাকে বাহানাবাজির আশ্রয় নিতে বলল এবং কিভাবে নিতে হবে তাও বলল। কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তই নিলাম, সত্যের আশ্রয় গ্রহণের মাঝেই মুক্তি মিলতে পারে। অতএব, যা-ই ঘটুক আমি সত্যই বলব।

"শেষে আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে দেখলেন এবং মুচকি হাসলেন। মুচকি হাসি ছিল ক্রোধমিশ্রিত। আমার তো তখনই হুশ-জ্ঞান হারাবার উপক্রম। নবী করীম (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব! তুমি যুদ্ধে গেলে না কেন? তুমি পেছনে পড়ে রইলে কেন? তোমার কি সামান-পত্র জোগাড় ছিল না? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে তো সব কিছুই ছিল। আমার নফ্‌স আমাকে অলস ও গাফিল বানিয়ে দিয়েছিল, অলসতা আমার ওপর ভর করেছিল। শয়তান আমার ওপর হামলা করেছিল এবং আমাকে লজ্জা ও বঞ্চনার পংকে নিক্ষেপ করেছিল। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি তোমার ঘরেই থাক এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা কর।

"এ সময় আমাকে কেউ কেউ বলল, দেখ! তুমিও যদি বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে তাহলে এমনটা হতো না। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র ওয়াহীর মাধ্যমে আমার মিথ্যা ফাস হয়ে যেত আর কোথাও আমার জায়গা থাকত না। ব্যাপারটা তো কোন দুনিয়াদারের সঙ্গে নয়, বরং আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে। এরপর আমি জানতে চাইলাম, আমার ক্ষেত্রে যেমনটি হুকুম দেওয়া হয়েছে তেমনটি কি আর কারও ক্ষেত্রে হয়েছে? লোকে জানাল, হ্যাঁ, হেলাল ইবন উমায়্যা ও মারারা ইবন রবী'রও একই অবস্থা। একথা শুনে আমি একটু সান্ত্বনা পেলাম, আল্লাহ্‌র আরও দুই নেক বান্দার অবস্থাও আমারই অনুরূপ।

"এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিলেন, কোন মুসলমান যেন আমাদের সাথে কথা না বলে এবং আমাদের সঙ্গে ওঠা-বসা না করে। এরপর আমাদের জীবন-যিন্দেগী ও দুনিয়াটা আমাদের জন্য দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াল। হেলাল ইবন উমায়্যা ও মারারা ইবন রবী' তো ঘরের মধ্যেই বসে পড়ল। তাঁরা বাইরে বেরুনোই বন্ধ করে দিল। কেননা তাঁরা ছিল বৃদ্ধ। কিন্তু আমি ছিলাম যুবক ও সাহসী। আমি ঘর থেকে বের হতাম, মসজিদে নববীতে যেতাম। সালাত আদায় অন্তে মসজিদে নববীর এক কোণে বসে পড়তাম।

"নবী করীম (সা) কখনো স্নেহভরা দৃষ্টি দিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে দেখতেন। কখনো বা আড় চোখে আমার দিকে চাইতেন, আমার পর্যুদস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন। এরপর আমি যখন হুযূর (সা)-এর দিকে চোখ তুলে চাইতাম তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

"মুসলমানদের অবস্থা ছিল এমন যে, কেউ আমার সাথে কথা বলত না, এমন কি কেউ আমার সালামের জওয়াবও দিত না। একদিন আমি বিষাদ ভারাক্রান্ত অবস্থায় মদীনা থেকে বাইরে গেলাম। আবূ কাতাদা (রা) ছিলেন আমার চাচাতো ভাই। আমাদের দু'জনের মাঝে ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। সামনেই ছিল তার বাগান। বাগানের ভেতর সে ঘর তৈরি করছিল। আমি তার কাছে গেলাম। সালাম করলাম, কিন্তু সে এর জওয়াবটুকু পর্যন্ত দিল না এবং মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আবূ কাতাদা! তুমি খুব ভালই জান যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি এবং মুনাফিকী ও শির্কের কোন আছর আমার দিলের ওপর নেই। তারপরও তুমি আমার সাথে কথা বলছ না কেন? আবূ কাতাদা (রা) এরপরও কথার কোন জওয়াব দিল না। আমি যখন এ কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করলাম তখন আমার চাচাতো ভাই কেবল এতটুকু জওয়াব দিল, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই খুব ভাল জানেন।" একথা শুনে আমার খুব কান্না এল এবং আমি খুব কাঁদলাম।

"অতঃপর আমি শহরে ফিরে এলাম। এ সময় একজন খ্রিস্টানের সঙ্গে আমার দেখা। সে আমাকে মদীনায় তালাশ করছিল। লোকে আমাকে দেখিয়ে তাকে বলল, তুমি যাকে খুঁজছ তিনি ইনিই। তার কাছে আমার নামে গাসসানের বাদশাহর লিখিত একটি চিঠি ছিল। চিঠিটি আমাকে দিলে আমি তা খুলে পড়লাম। এতে লেখা ছিল ঃ

"আমরা শুনেছি, তোমার প্রভু তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তোমাকে তাঁর সামনে থেকে বের করে দিয়েছেন। বাকী লোকেরাও তোমার প্রতি জোর-জুলুম করছে। আমরা তোমার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বেশ ভালই অবহিত আছি। তুমি এমন নও যে, কেউ তোমার প্রতি এতটুকু উপেক্ষা প্রদর্শন করবে অথবা তোমার

সম্মানের বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে আচরণ করবে। এখন তুমি এই পত্র পাঠ মাত্রই আমার কাছে চলে আসবে এবং এসে দেখ আমি তোমার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় কী করি!"

"পত্র পাঠ করতেই আমি মনে মনেই বললাম, এই আরেকটি মুসীবত এসে আমার ওপর দেখা দিল। এর থেকে বড় বিপদ-মুসীবত আর কী হতে পারে যে, আজ একজন খ্রিস্টান আমার ওপর এবং আমার দীন-ধর্মের ওপর চড়াও হবার আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করেছে এবং আমাকে কুফরের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই ধারণায় আমার দুঃখ-বেদনা ও মনোকষ্ট অনেক গুণ বেড়ে গেল। পত্রটি পত্রবাহকের সামনেই আমি আগুনে নিক্ষেপ করলাম এবং তাকে বলে দিলাম, যাও! তোমার মনিবকে বলে দিও, তার অনুগ্রহ ও নেক নজরের চাইতে আমার সর্দার ও মনিব (সা)-এর উপেক্ষাও আমার জন্য লক্ষ গুণ উত্তম ও সৌভাগ্যের স্মারক।

"আমি আমার ঘরে ফিরলাম। ফিরে দেখলাম, নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে একজন লোক এসেছে। তিনি আমাকে বললেন, নবী করীম (সা) আমাকে আমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, তিনি কি তালাক দিতে বলেছেন? বললেন, না, শুধু আলাদা থাকার জন্য বলেছেন। এ কথা শুনে আমি আমার স্ত্রীকে আমার শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আমি এও জানতে পারলাম, একই হুকুম হেলাল ও মারারার কাছেও পৌঁছে গেছে। হেলালের স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হেলাল দুর্বল ও কমযোর মানুষ। আর তাঁর দেখ-ভাল ও সেবা করার মত কোন খাদেমও নেই। যদি অনুমতি দেন আমি তাঁর খেদমত করতে পারি। রসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, পার। তবে পৃথক বিছানায় থাকবে। তাঁর স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হেলালের দুঃখ ও মনোকষ্টে এমন অবস্থা হয়েছে যে, অন্য কোন দিকে আদৌ খেয়াল নেই।

"এরপর লোকে আমাকে বলা শুরু করল, তুমিও অনুমতি নাও যাতে তোমার স্ত্রী প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিতে পারে। আমি বললাম, আমি তো এতটা সাহস করতে পারি না। না জানি হুযূর (সা) অনুমতি দেন কি না দেন। তাছাড়া আমি তো যুবক মানুষ। আমার কাজ আমি নিজেই করতে পারি। আমার খেদমতের কোন প্রয়োজন নেই।

"মোটের ওপর এভাবেই কষ্টের পঞ্চাশটি দিন অতিক্রান্ত হলো। একদিন রাত্রে আমি আমার ঘরের ছাদে শুয়ে ছিলাম এবং আমার বিপদভারে আমি প্রায় ভেঙে পড়েছিলাম। এমন সময় আমার বাড়ির কাছাকাছি সিলা' পর্বতের ওপর থেকে হযরত আবূ বকর (রা) হেঁকে উঠলেন, কা'বকে মুবারকবাদ; তার তওবাহ কবুল

হয়েছে। এই আওয়াজ শুনতেই আমার বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই দৌড়ে এল এবং আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলতে লাগল, তোমাদের তওবাহ কবুল হয়েছে। আমি একথা শুনতেই মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজদায়ে শোকর আদায় করলাম এবং দৌড়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলাম।

"নবী করীম (সা) তখন মুহাজির ও আনসারদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমাকে দেখে মুহাজির সাহাবীরা আমাকে মুবারকবাদ জানাল এবং আনসাররা নিশ্চুপ রইল। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম করলাম। সে সময় নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক আনন্দ ও খুশীতে পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছিল। আর যখনই তিনি আনন্দিত হতেন, খুশী হতেন তখনই তাঁর চেহারা মুবারক অধিকতর আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত। তিনি আমাকে বললেন, কা'ব! মুবারকবাদ আজকের এই বরকতময় দিনের জন্য। তোমার জীবনে এমন দিন আর আসেনি সেদিন ছাড়া যেদিন তুমি মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলে। এস, তোমার তওবাহ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করেছেন।

"আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই কবুলিয়তের শুকরিয়া হিসাবে আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে সাদাকা করতে চাই, বিলিয়ে দিতে চাই। নবী করীম (সা) বললেন, না (তা হয় না)। আমি বললাম, অর্ধেক। তিনি এবারও বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ খুবই ভাল এবং এক-তৃতীয়াংশই অনেক।"[১]

মুনাফিকদের কূটচাল

মুনাফিকরা সব সময় এই ধান্ধায় থাকত মুসলমানদের মধ্যে যে কোনভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা। তারা দীর্ঘ দিন থেকে এই ফিকিরে ছিল, মসজিদে কুবা ভেঙে সেখানে আরেকটি মসজিদ বানাবে এই অজুহাতে যে, দুর্বলতা হেতু কিংবা অন্য কোন কারণে যারা মসজিদে নববীতে যেতে পারে না তারা এখানে এসে সালাত আদায় করবে। আবূ আমের নামক একজন আনসার, যে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল, মুনাফিকদের বলে, তোমরা উপায়-উপকরণ তৈরি কর। আমি রোম সম্রাটকে বলে সেখান থেকে সৈন্য আনছি যাতে করে এদেশ থেকে ইসলাম বিতাড়িত করা যায় এবং এ ভূখণ্ডকে মুক্ত করা যায়।

নবী করীম (সা) যখন তবুক অভিযানে রওয়ানা হতে চলেছেন তখন মুনাফিকরা গিয়ে নিবেদন করল, আমরা অসুস্থ ও অক্ষম লোকদের জন্য একটি

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, কা'ব ইবন মালিকের ঘটনা শীর্ষক অধ্যায়।

মসজিদ বানিয়েছি। আপনি গিয়ে একবার নামায পড়িয়ে আসুন যাতে তা গৃহীত হয়। নবী করীম (সা) বললেন, এই মুহূর্তে আমি অভিযানে বের হচ্ছি। যখন তবুক থেকে ফিরে আসব তখন দেখা যাবে। তবুক থেকে ফিরেই তিনি মালিক ও মা'আন ইবন আদীকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা গিয়ে ওদের তৈরী মসজিদে আগুন লাগিয়ে দাও। এই মসজিদ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ[১]

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۔ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ۔ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۔ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۔ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۔ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۔

"আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতি সাধন, মু'মিনদের মধ্যে কুফরী ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঘাটিরূপে তার জন্য যে সংগ্রাম করেছিল আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে এর আগে। তারা অবশ্যই হলফ করে বলবে ঃ আমরা তো কল্যাণ ছাড়া কিছুই ইচ্ছা করিনি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী। আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না। অবশ্য যে মসজিদ স্থাপিত হয়েছে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর সেটিই সবচাইতে উপযুক্ত যে, আপনি সেখানে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন"। [সূরা তওবাহ; ১০৭-১০৮ আয়াত]

দওস গোত্রের প্রতিনিধি দল

তুফায়ল ইবন আমর দওসী (রা)-র ইসলাম গ্রহণের কথা গ্রন্থের প্রথম দিকেই উল্লিখিত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হন তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দোআ করুন, আমার কওমও যেন আমার দাওয়াতে মুসলমান হয়ে যায়। নবী করীম (সা) দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তুফায়লকে তুমি একটি নিদর্শন বানিয়ে দাও। তুফায়ল বাড়ি পৌঁছুলে বৃদ্ধ পিতা সাক্ষাত করতে আসল। তুফায়ল তাঁর পিতাকে বললেন, বাপজান! এখন আমি তোমাদের নই আর আপনিও আমার কেউ নন। বৃদ্ধ পিতা বললেন, তা কেন? তুফায়ল বললেন, আমি তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং মুসলমান হয়ে এসেছি। বৃদ্ধ পিতা বললেন, বাপ! তোমার যেই

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫২৯-৩৫; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৫৪৯।

ধর্ম সেই ধর্ম আমারও। তুফায়ল (রা) খুশী হয়ে বললেন, খুব ভাল কথা। তাহলে আপনি উঠে গিয়ে গোসল সেরে আসুন, পাক-পবিত্র কাপড় পরে আসুন যাতে করে আমি আপনাকে ইসলামের তা'লীম দিতে পারি।

এরপর তুফায়ল-এর স্ত্রী এল। তার সঙ্গেও তিনি এ ধরনের কথাই বললেন। তার স্ত্রীও মুসলমান হলো। এরপর তুফায়ল (রা) সাধারণ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এ ঘোষণায় কেউ মুসলমান হলো না।[১]

তুফায়ল (রা) পরবর্তী বছর পুনরায় নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হলেন। আরয করলেন, আমার কওমের মধ্যে ব্যভিচারের মাত্রা খুব বেশি (যেহেতু ইসলাম ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেছে); এজন্য মানুষ ইসলাম কবুল করছে না। নবী করীম (সা) তার জন্য দুআ করলেন। অতঃপর এই দুআ করলেন, اللهم اهد دوسا আল্লাহ্! তুমি দওস গোত্রকে হেদায়েত দান কর।[২] এরপর তিনি তুফায়লকে বললেন, যাও, মানুষদেরকে আল্লাহ্র দীনের দিকে আহ্বান জানাও। তাদের সঙ্গে নম্র, কোমল ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর।

এবার তুফায়ল সফলতা লাভ করলেন। হিজরী ৫ম সনে দওস গোত্রের ৭০ কিংবা ৮০ টি পরিবার নিয়ে, যারা মুসলমান হয়েছিলেন, মদীনায় পৌঁছেন। পৌঁছে তিনি জানতে পারেন হুযূর (সা) খায়বার অভিযানে গেছেন। এজন্য তিনিও খায়বার রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে দর্শন লাভে ধন্য হন। তাঁর সাথীরাও খায়বারেই নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেন।[৩] নবী করীম (সা)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর ইবন আবী তালিব (রা)-ও এ সময় আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সোজাসুজি খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হন। আবিসিনিয়ার যেসব গোত্র মুসলমান হয়েছিল তারাও তাঁর সঙ্গে খায়বার গমন করেছিল।

হযরত জাফর (রা)-এর আবিসিনিয়া থেকে সেখানকার নও মুসলিম ও তুফায়ল ইবন আমর (রা)-এর ইয়ামনের দওস গোত্রের নও মুসলিম পরিবারগুলো নিয়ে খায়বারে গমন এর স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে, এ যেন ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহ্র তরফ থেকে এ কথা বলে দেওয়া যে, যেই নবীর শিক্ষামালা ও তা'লীম এমন সব দূর-দরাজ দেশের মানুষের অন্তররাজ্যের কেল্লাগুলো খুব সহজে জয় করছে তার বিরোধিতায় নিজেদের ইট-পাথরের নির্মিত কেল্লার ওপর ভরসা করা কতটা ভিত্তিহীন।[৪]

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬২৫।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, দওস গোত্রের কাহিনী।
৩. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬২৫-২৬।
৪. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃ.।

ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল

ছাকীফ গোত্র থেকে যিনি প্রথম ইসলামের শিক্ষা লাভের জন্য নবী করীম (সা)-এর খেদমতের এসেছিলেন তিনি ছিলেন ওরওয়া ইব্ন মাসঊদ (রা) ছাকাফী। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের সর্দার। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি কুরায়শদের পক্ষ থেকে উকীল হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে এসেছিলেন। হাওয়াযিন ও ছাকীফ যুদ্ধের পর আল্লাহ্র তৌফিকপ্রাপ্ত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হন এবং ইসলাম কবুল করেন। ওরওয়ার ঘরে ছিল ১০ জন স্ত্রী। নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, তুমি তাদের ভেতর থেকে চারজনকে রেখে বাকীদেরকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাই করেন।[১]

ওরওয়া (রা) যখন ইসলাম শিখলেন তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিবেদন পেশ করলেন, এখন আপনি আমাকে আমার কওমের মধ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন। নবী করীম (সা) তাকে বললেন, আমার ভয় হয় তোমার কওম তোমাকে হত্যা না করে বসে। ওরওয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কওম আমাকে এত ভালবাসে যতটা ভালবাসে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে। এরপর তিনি তাঁর কওমের মাঝে ফিরে এলেন এবং কওমের লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাসাদে সালাত আদায় করছিলেন এমন সময় এক হতভাগা তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। আর এতেই তিনি শহীদ হয়ে যান।[২]

যদিও ওরওয়া তাঁর মিশনে সফল হন নি, তবুও যেই আওয়াজ তিনি তাঁর কওমের কানে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন তা তাদের দিলের ওপর প্রভাব না ফেলে যায় নি, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে থাকে নি। অল্প দিন অতিবাহিত না হতেই তাঁর কওম তাদের নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচিত করে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পাঠায় যাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হয়।

এই প্রতিনিধি দলটি নবম হিজরী সালে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন 'আবদে ইয়ালীল। ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে বোঝাবার জন্য নবী করীম (সা) নবুওতের দশম বর্ষে তায়েফ গমন করেছিলেন এবং যিনি সেদিন নবী করীম (সা)-এর কথাটুকু পর্যন্ত শুনতে রাযী হন নি। অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বস্তির উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, যে সব তরুণ তাঁকে উপহাস করত, বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছিল, ধুলি-বালি ছড়িয়েছিল।

---

১. দালাইলুন নবূওত; ৫ম খণ্ড, ২৯৯; যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৪৯৮।
২. হাকেম-এর মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৭১৩ পৃ.।

নবী করীম (সা) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বদ-দুআর জন্য অনুরুদ্ধ হলে বলেছিলেন, আমি ধ্বংসের জন্য দুআ করব না। যদি তারা ইসলাম কবুল নাও করে তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের আল্লাহ হেদায়েত দান করবেন। আজ সেই ইসলাম দুশমন স্বয়ং ইসলাম্ গ্রহণের জন্য উৎসুক এবং আন্তরিকভাবেই সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দরবারে নববীতে হাজির।

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিবেদন পেশ করলেন, এরা (ছাকীফ গোত্রের লোকেরা) আমার গোত্রের লোক। আমি কি তাদেরকে আমার কাছে থাকতে দেব এবং তাদের দেখাশোনা ও মেহমানদারি করব? নবী করীম (সা) বললেন ঃ لا امنعك ان تكرم قومك তোমার কওমের লোকদের মেহমানদারি করতে আমি নিষেধ করছি না। তবে এমন স্থানে তাদের থাকার ব্যবস্থা কর যেখানে কুরআন পাকের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছে।

মোট কথা, তাদের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণেই তাঁবু টাঙানো হয় যেখানে থেকে তারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনত এবং সাহাবায়ে কিরামের সালাত আদায় করতে দেখত। এই কৌশলের ফলে তাদের দিলের ওপর ইসলামের সত্যতার আছর পড়ে। অবশেষে তারা নবী করীম (সা)-এর হাতের ওপর হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামে দাখিল হবার আগে তাদের সালাত আদায়ের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি দেবার অনুমতি প্রার্থনা করে। নবী করীম (সা) তখন তাদের বলেন, لا خير فى دين ليس فيه ركوع "যেই ধর্মে সালাত নেই, সেই ধর্মে কোন কল্যাণ নেই।" এরপর তারা অনুমতি চাইল, ঠিক আছে, আমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকবেন না এবং আমাদের থেকে যাকাতও নেবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই দরখাস্ত কবুল করলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বললেন, ইসলামের প্রভাবে তারা নিজেরাই এ দু'টো কাজ করবে অর্থাৎ যাকাতও দেবে এবং জিহাদেও তারা অংশ গ্রহণ করবে।[১]

আবদে ইয়ালীল, যিনি ছিলেন প্রতিনিধিদলের নেতা, বিভিন্ন সময় পর্বে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন ঃ

১. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ব্যভিচার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আমার কওমের লোকেরা (ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উপলক্ষে) অধিকাংশ সময় বিদেশে থাকে। এজন্য ব্যভিচারের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাদের কোন উপায় বা গত্যন্তরই থাকে না। নবী করীম (সা) বললেন, ব্যভিচার তো হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার

১. এই অংশটি সুনান আবী দাউদ-এর কিতাবুল খারাজ; ماجاء فى خبر الطائف শীর্ষক অধ্যায়েও উল্লিখিত হয়েছে।

হুকুম হলো ঃ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না; নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পন্থা"।

[সূরা বনী ইসরাঈল, ৪র্থ রুকূ']

২. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুদ সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এতো সম্পূর্ণত আমাদেরই সম্পদ। নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের আসল মূলধন নিয়ে নাও। দেখো, আল্লাহ এ সম্পর্কে কী বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অবশিষ্ট যে সব সুদ রয়েছে তা ছেড়ে দাও"। [সূরা বাকারা, ৩৮ রুকূ']

৩. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদ পান সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এতো আমাদের দেশেই উৎপাদিত যমীনের নিংড়ানো রস। এ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না।

নবী করীম (সা) বললেন, মদ পান আল্লাহ তা'আলা হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। দেখো, আল্লাহ কী বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও পাশা খেলা (সবই) অপবিত্র শয়তানী কর্মের অন্তর্গত; অতএব, তোমরা এ সমস্ত পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [সূরা আল-মায়েদাহ, ৯ আয়াত]

দ্বিতীয় দিন তারা এসে বলল, ভাল কথা! আমরা আপনার কথা মেনে নেব। কিন্তু 'রাব্বা' নামক দেবীর ব্যাপারে কি করা যাবে? (রাব্বা' 'রব' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ; যেই দেবীর তারা পূজা করত তাকে 'রাব্বা' বলত)। নবী করীম (সা) সেটাকে ভূমিস্মাৎ করবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

এ নির্দেশ শুনতেই প্রতিনিধি দলের লোকেরা হায়! হায়! করে উঠল। তারা বলল, যদি 'রাব্বা' দেবী জানতে পারেন যে, আপনি তাকে ভেঙে ফেলতে চাচ্ছেন তাহলে সে আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।

তাদের একথা শুনতেই হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন, 'আবদে ইয়ালীল! আফসোস যে, তুমি এতটুকু জান না, সেটি একটি প্রস্তর খণ্ড ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। হযরত ওমর (রা)-এর কথা শুনে ইবনে আবদে ইয়ালীল উষ্মা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, ওমর! আমরা তোমার সাথে কথা বলতে আসি নি। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকে ফিরে বললেন, মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব আপনি নিজেই

গ্রহণ করুন। কেননা আমরা তাকে কখনোই ভাঙতে পারব না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঠিক আছে। মূর্তি ভাঙার জন্য আমিই লোক পাঠাব। তখন প্রতিনিধি দলের একজন বলল, আমরা এখান থেকে রওয়ানা হবার পর তাঁকে পাঠাবেন। তিনি যেন আমাদের সাথে না যান।

মোটের ওপর প্রতিনিধি দলের সকলেই ইসলাম কবুলপূর্বক মুসলমান হয়ে নিজেদের গোত্রের নিকট ফিরে যান। যাবার মুহূর্তে তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেবার জন্য তাঁরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে দরখাস্ত করেন। সে মুতাবিক তাঁদেরই ভেতর থেকে উছমান ইবন আবুল আস যিনি ছিলেন সবার মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠকে তাদের ইমাম হিসাবে মনোনীত করেন। উছমান ইবন আবুল আস লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন মজীদ ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-নিষেধসমূহ শিখতেন। কখনো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে, আবার কখনো আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে শিখতেন। নবী করীম (সা) এজন্যই তাঁকে তাঁদের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন।

প্রতিনিধি দল প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে পরামর্শ করে, তারা তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে প্রথমে কওমের লোকদের হতাশ ও নিরাশ করে দেবে। যখন তারা দেশে গিয়ে পৌঁছুল তখন কওমের লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এখন বল, কী অবস্থা?

প্রতিনিধি দল বলল, (আল্লাহর আশ্রয় চাই) আমরা একজন কঠিনপ্রাণ ও রূঢ়-ভাষী মানুষের মুখোমুখী হয়েছিলাম যিনি আমাদেরকে অসম্ভব সব বিষয় করার জন্য নির্দেশ দেন। যেমন, তিনি আমাদের লাত ও উযযার মূর্তি ভেঙে ফেলার কথা বলেন, সুদী টাকা-পয়সা ছেড়ে দিতে বলেন, মদ পান করতে নিষেধ করেন, ব্যভিচার নিষিদ্ধ মনে করেন তিনি। কওমের লোকেরা এসব শুনে কসম খেয়ে বলল, আমরা এ সব কথা কখখনো মানব না।

প্রতিনিধি দল তখন বলল, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা অস্ত্র শানাতে থাকো এবং পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। নিজেদের দুর্গগুলোর সংস্কার কর। অতঃপর দু'দিন পর্যন্ত ছাকীফ গোত্র এই সংকল্পে অটল রইল। তৃতীয় দিনের দিন তারা নিজেরাই বলতে শুরু করল ঃ

"ভাল! মুহাম্মদের সাথে আমরা কিভাবে লড়াই করব যেখানে সমগ্র আরব তাঁর সামনে নতি স্বীকার করছে, আনুগত্য করছে।" এরপর তারা প্রতিনিধি দলের লোকদের কাছে গিয়ে বলল, "যাও! তিনি যা কিছু বলেন তা গ্রহণ করে নাও।"

প্রতিনিধি দল এবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে বললেন, এখন আমরা তোমাদের সত্যি কথাটাই বলছি। আসলে আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে তাকওয়া পরহেযগারী তথা

আল্লাহ্ভীরুতার ক্ষেত্রে, বিশ্বস্ততায়, দয়া-মায়ায় ও সত্যবাদিতায় সকলের তুলনায় অগ্রগামী পেয়েছি। আমাদের তোমাদের সকলের জন্যই এই সফর বিরাট বরকত লাভের কারণ হয়েছে।

গোত্রের লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের থেকে এই রহস্য গোপন রেখেছিলে কেন এবং আমাদেরকে এমন কঠিন দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার মধ্যেই বা ফেলেছিলে কেন? প্রতিনিধি দল বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দিল্ থেকে যেন শয়তানী অহমিকা বের করে দেন। অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যায়।

কয়েকদিন পর সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত একটি দল হযরত মুগীরা ইবন শু'বার নেতৃত্বে পৌঁছে যায়। তিনি লাত মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে এই কার্যক্রমের সূচনা করতে চাইলেন। ছাকীফ গোত্রের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ এই কাজ খুব সহজসাধ্য হবে না বলেই ঠাওরেছিল। পর্দানশীন মহিলারা পর্যন্ত এই তামাশা দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) এই মূর্তি ভাঙার জন্য তীর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু জোরে নিক্ষেপ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে নিজেই পড়ে যান। এই দৃশ্যে গোত্রের লোকেরা চিৎকার করে ওঠে, খোদা তাকে ধাক্কা মেরেছে আর 'রাব্বা' দেবতা তাকে মেরে ফেলেছে। এরপর তারা খুবই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল, তোমরা যত চেষ্টাই কর না কেন, তাকে ভেঙে ফেলতে পারবে না।

এবার হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বললেন, ছাকীফের লোকেরা! তোমরা খুবই বেওকুফ আর আহম্মক। এতো এক টুকরো পাথর বৈ তো নয়! সে কিই বা করতে পারে? লোকসকল ! তোমরা আল্লাহ্র আফিয়াত কবুল কর এবং একমাত্র তাঁরই গোলামী কর।

এরপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে হযরত মুগীরা প্রথমে সেই মূর্তিটাকে ভাঙলেন। অতঃপর মন্দিরের দেওয়ালের ওপর আরোহণ করলেন এবং তা ভাঙতে শুরু করলেন। বাকী মুসলমানেরাও দেওয়ালের ওপর চড়লেন। মন্দিরের এক একটি পাথর খসিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন।

এই দৃশ্যে মন্দিরের পুরুত ঠাকুর বলতে শুরু করল, মন্দিরের বুনিয়াদ তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে ছাড়বে। হযরত মুগীরা (রা) একথা শুনতেই মন্দিরের ভিত্তি শুদ্ধ তুলে ফেলেন এবং এভাবেই ছাকীফ গোত্রের লোকদের মনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি মূল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[১]

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৫৯৬-৯৯; দালাইলুন নবুওত, বায়হাকীকৃত, ৫ম খণ্ড, ২৯৯-৩০৪ পৃষ্ঠায় ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

আবদুল কয়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল

আবদুল কয়েস গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। নবী করীম (সা) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, রবী'আ গোত্রের। নবী করীম (সা) তাদের খোশ আমদেদ জানান। অতঃপর তারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আপনাদের মাঝে মুদার নামে একটি কাফির গোত্র রয়েছে। আমরা কেবল নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাসগুলোতেই আপনার খেদমতে আসতে পারব। এজন্য আমাদেরকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিন যার ওপর আমরা আমল করব এবং তদনুযায়ী কওমের অপরাপর লোকেরাও আমল করবে।

রসূল আকরাম (সা) তাদেরকে বললেন, আমি চারটি জিনিসের ওপর আমল করতে এবং চারটি জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছি। যে চারটি কাজ তোমাদেরকে করতে হবে তা হচ্ছে এই ঃ

(১) তোমরা এক আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনবে আর তা এভাবে ঃ তোমরা لا اله الا الله محمد رسول الله আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল-এর সাক্ষ্য দেবে।

(২) তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে।

(৩) তোমরা যাকাত আদায় করবে।

(৪) রমযানের এক মাস সিয়াম পালন করবে। অধিকন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দেবে।

যে চারটি বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা হল ঃ

(১) দুব্বা-লাউয়ের ডিববা; (২) হানতুম, সবুজ ঘড়া; (৩) নাকীর, গাছের গুঁড়ি খোদাইপূর্বক নির্মিত পাত্র ও (৪) মুযাফফাত, এক জাতীয় পাত্র যে সব পাত্রে মদ ও নেশা জাতীয় বস্তু রাখা হতো। উপরিউক্ত সকল ধরনের পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে আসা লোকদেরকেও বলে দেবে।[১] তারা আরও নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হুযূর (সা) কি জানেন 'নাকীর' কী জিনিস? নবী করীম (সা) বললেন, আমি জানি আর তা হলো, তোমরা খেজুর গাছের গোড়া খোদাই করে গর্ত বানাও। অতঃপর তোমরা তাতে খেজুর ফেল। এর ওপর পানি ঢেলে থাকো। কয়েক দিন রাখার পর তা ফুলে ফেঁপে ওঠে। এক সময় তা থিতিয়ে যায়। এরপর তোমার তা পান কর। সম্ভবত তোমাদের কেউ তা পান করে নেশাযুক্ত ও মাতাল হয়ে আপন

১. বুখারী, কিতাবুল ঈমান; এছাড়াও আরও নয়টি স্থানে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম মুসলিম ও তাঁর সহীহ মুসলিমে হাদীছটির উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল ঈমান الامر بالايمان بالله تعالى

চাচাতো ভাইকেও হত্যা করে থাকবে। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ প্রতিনিধিদলে এমন একজন ছিল যে নাকীর পান করে মাতাল অবস্থায় আপন চাচাতো ভাইকে হত্যা করেছিল।

তারা আবার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কী ধরনের পাত্রে পানি পান করব? বললেন, মুখ বাঁধা মশকে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এখানে ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেশী। এজন্য এখানে চামড়ার মশক খুব বেশী নিরাপদ নয়। বললেন, তদ্‌সত্ত্বেও অর্থাৎ নিরাপদ না হলেও (চামড়ার মশকই ব্যবহার করতে হবে)।[১]

এই প্রতিনিধিদলের সাথে জারূদ ইবন মু'আল্লাও এসেছিলেন যিনি ছিলেন ধর্মে খ্রিস্টান। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এখন একটি ধর্মে বিশ্বাসী। আমি যদি তা পরিত্যাগ করি এবং আপনার ধর্মে দাখিল হই তাহলে আপনি কি আমাদের যামিন হতে পারবেন? নবী করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ, আমি যামিন হচ্ছি। কেননা আমি যেই ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছি তা তোমার এখনকার ধর্মের থেকে উত্তম।

অতঃপর জারূদের সঙ্গে আগত অন্যান্য খ্রিস্টানও মুসলমান হয়ে যায়।[২]

বনূ হানীফার প্রতিনিধিদল

বনূ হানীফার প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়। ছুমামা ইবন উছাল-এর চেষ্টায় উক্ত এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। এই প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। এই প্রতিনিধিদলের সাথে মুসায়লামা কাযযাবও ছিল। সে মদীনায় এসে বলতে থাকে, যদি মুহাম্মদ (সা) এ কথা স্বীকার করেন, তিনি আমাকে তাঁর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত বানাবেন তাহলে আমি বায়'আত হব। নবী করীম (সা) যখন একথা শুনতে পান তখন তাঁর হাতে খেজুর গাছের একটি ডাল ছিল। তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের এই ডাল প্রদানের শর্তেও বায়আত করব না। সে যদি আমার হাতে বায়আত না করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দেবেন। তার পরিণতি আল্লাহ আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার হাতে স্বর্ণের কাঁকন। আমার কাছে তা খুব খারাপ মনে হলো। স্বপ্নেই আমি ওয়াহী মারফত জানতে পারলাম, আমাকে বলা হলো, তুমি তা ফু দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমি ফু দিতেই তা উড়ে গেল। আমার ধারণা স্বপ্নের কাঁকনের অর্থ ইয়ামামার মুসায়লামা ও সান'আর (আসওয়াদ) 'আনাসী।[৩]

---

১. দালাইলুন নবুওত, ৫ম খণ্ড, ৩৬৬;
২. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, ৩২৮; ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড ৫৭৫।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল শীর্ষক অধ্যায়।

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল তাদের সর্দার যায়দ আল-খায়ল-এর নেতৃত্বে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। নবী করীম (সা) বলেন, আরবের যেই ব্যক্তির প্রশংসা আমার সামনে করা হয়েছে তাকে দেখার সময় তার প্রশংসার তুলনায় কমই পেয়েছি। কিন্তু যায়দ আল-খায়ল এর ব্যতিক্রম। তিনি তার নাম রাখেন যায়দ আল-খায়র। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার পর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।[১]

আশ'আরিয়া গোত্রের যারা ইয়ামনেরই বাসিন্দা ছিল, প্রতিনিধিদল এসে হাজির হয়। এদের আগমনের সময় নবী করীম (সা) বলেছিলেন ঃ ইয়ামনের লোকেরা এসেছে, যাদের দিল্ খুব নরম ও দুর্বল। ঈমান ইয়ামনীদের আর প্রজ্ঞাও ইয়ামনীদের। যারা ছাগল পালে তারা বিনয়ী হয় আর যারা উট পালন করে তারা (সাধারণত) অহংকারী ও উদ্ধত হয় যারা প্রাচ্যের লোক।[২]

এসব লোক মদীনায় প্রবেশ কালে এইরূপ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে প্রবেশ করেছিল ঃ

غدا نلاقى الاحبه محمدا وحزبه -

"কাল আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হব; মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে।"[৩]

আয্দ গোত্রের প্রতিনিধিদল

এই প্রতিনিধি দল ছিল সাত সদস্যবিশিষ্ট। তারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। নবী করীম (সা) তাদের চাল-চলন ও বেশভূষা দেখে বেশ পছন্দ করেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কারা?" তারা বলল, আমরা মু'মিন (অর্থাৎ বিশ্বাসী)। নবী করীম (সা) তাদের এই কথা শুনে বলেন, প্রতিটি কথার একটি হাকীকত বা তাৎপর্য থাকে। এখন তোমরা বল, তোমাদের কথা ও ঈমানের হাকীকত কি? তারা নিবেদন করল, আমাদের ভেতর পনেরটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য আছে। তন্মধ্যে পাঁচটি হলো তাই যার ওপর বিশ্বাস পোষণের আলোচনা আপনার প্রেরিত দূতরা করেছেন। আর পাঁচটি তাই যার ওপর আমল করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর আমরা প্রথম থেকেই পাবন্দ।

---

১. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫৭৭ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, আশ'আরী ও ইয়ামনবাসীদের আগমন।
৩. মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ১০৫, ১৫৫।

"যে পাঁচটি বিষয়ে হুযূর আকরাম (সা)-এর প্রেরিত প্রচারক (মুবাল্লিগ)-বৃন্দ আমাদের ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো হলো এই ঃ

"আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান, ফেরেশতাদের ওপর ঈমান, আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের ওপর ঈমান, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসূলদের ওপর ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ঈমান।"

"যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর আমল করতে আমাদেরকে বলা হয়েছে তা এই ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান, রমযান মাসে সিয়াম পালন এবং রাস্তায় শক্তি-সামর্থ্য থাকলে (আর্থিক ও কায়িক) বায়তুল হারামের হজ্জ করা।"

যে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আমরা প্রথম থেকেই জানতাম তা হলো, "তৃপ্তির সময় শুকরিয়া আদায় করা, বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, পরীক্ষার সময় দৃঢ় পদ থাকা এবং শত্রুকেও গালি-গালাজ না করা।"

এতদশ্রবণে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) বললেন, "যিনি এসব কথার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি একজন প্রজ্ঞার অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দূরদর্শিতা থেকে মনে হয় তিনি একজন নবী ছিলেন।" আচ্ছা, আমি আরও পাঁচটি জিনিস তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যাতে পূরো বিশটি হয়ে যায় ঃ

(১) এমন জিনিস জমা করো না যা তুমি খাবে না; (২) এমন বাড়ি বানিও না যে বাড়িতে তুমি বসবাস করবে না; (৩) এমন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করো না যা তুমি কাল পরিত্যাগ করবে; (৪) আল্লাহকে ভয় করবে যাঁর কাছে তোমাকে ফিরে যেতে হবে এবং যাঁর সামনে তোমাকে হাজির হতে হবে; (৫) সেসব জিনিসের প্রতি তুমি আগ্রহী হও পরকালীন জীবনে যা কাজে আসবে, যেখানে তুমি চিরদিন থাকবে।

তাঁরা নবী করীম (সা)-এর উপদেশের ওপর পুরোপুরি আমল করেছিল।[১]

আরব ভূখণ্ডের উত্তরাংশের যতটা কনস্টান্টিনোপলের দখলে ছিল ঐ সমগ্র এলাকার গভর্নর ছিলেন ফারওয়া ইবন আমর। এর রাজধানী ছিল মাআন। ফিলিস্তিনী সংলগ্ন এলাকাও ছিল তাঁর শাসনাধীন।

নবী করীম (সা) তাঁর নামেও দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন। ফারওয়া (রা) ইসলাম কবুল করেন এবং মহানবী (সা)-এর খেদমতে একজন দূত প্রেরণ করেন এবং সেই সাথে একটি সাদা মূল্যবান খচ্চর হাদিয়া হিসাবে পাঠান।

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৭২-৭৩; আল-ইসাবা, ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.।

কনস্টান্টিনোপল সম্রাট তাঁর ইসলাম গ্রহণের ও মুসলমান হবার সংবাদ পেয়ে তাঁকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান। প্রথমে তাঁকে ইসলাম পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ফারওয়া (রা) তা করতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁকে বন্দী করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতঃপর তাঁকে ফিলিস্তীন শহরের আফরা নামক একটি পুকুর পাড়ে ফাঁসিতে চড়ান হয়।

প্রাণ বিয়োগের পূর্বে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন ঃ

بلغ سراة المسلمين بانني سلم لربي اعظمي ومقامي [১]

হামদান গোত্রের প্রতিনিধি দল

এই গোত্রের বসতি ছিল ইয়ামনে। তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে অনেক দিন অবস্থান করেন। কিন্তু তথাপি ইসলামের বিস্তার ঘটেনি। অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত আলী মুরতাযা (রা)-কে সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠান। তাঁর ফয়েয ও বরকতে সমগ্র কবিলা একদিনে মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত আলী (রা)-র প্রেরিত এতদ্‌সম্পর্কিত পত্র যখন নবী করীম (সা) শুনতে পেলেন অমনি শুকরিয়া হিসাবে সিজদায় গমন করেন এবং মুখ দিয়ে তাদের উদ্দেশে "আস-সালাম 'আলা হামদান" বলে তাদের জন্য দো'আ করেন।১ এই প্রতিনিধি দল তাদেরই ছিল যারা হযরত আলী (রা)-র হাতে ঈমান এনেছিল। তাঁরা নবী করীম (সা)-কে দেখে নয়ন-মন সার্থক করতে এবং নিজেদের জীবনকে ধন্য করতে এসেছিল।

তারিক ইবন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় সূক আল-মাজায-এ দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে ডেকে ডেকে বলছিল, يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا "হে লোকসকল! তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, সফলকাম হবে।" এরপর তাঁর পেছনে পেছনে আরেকজন এল, যে পাথর মারছিল আর বলছিল, তাকে সত্যবাদী বলে মনে কর না; সে তো মিথ্যাবাদী ايها الناس لا تصدقوه فانه كذاب। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? লোকেরা বলল, আগের লোকটি বনূ হাশিমের, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল মনে করে। আর পেছনে যে লোকটি আসছিল, সে তাঁরই চাচা আবদুল উয্‌যা (আবূ লাহাব)। তারিক বলেন, এরপর অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে। নবী করীম (সা) মদীনায় যাচ্ছিলেন, সে সময়

১. প্রাগুক্ত; ৩য় খণ্ড, ৬৪৬ পৃ.; ইব্‌ন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৫৯২।
২. বায়হাকী, ২য় খণ্ড, ৩৬৯; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

আমাদের কওমের কতক লোক যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম, মদীনায় গেলাম যাতে করে সেখানকার খেজুর কিনতে পারি। যখন মদীনার জনবসতি এলাকার কাছাকাছি পৌঁছুলাম তখন আমরা এজন্য থেমে গেলাম যাতে করে সফরের কাপড় পাল্টে অন্য কাপড় পরে মদীনায় প্রবেশ করতে পারি।

ইতোমধ্যে একজন লোক আসলেন যার পরিধানে দুটো পুরনো চাদর ছিল। তিনি সালামের পর জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এলে এবং কোথায় যাবে? আমরা বললাম, রবযা থেকে এলাম এবং এ পর্যন্ত আসার উদ্দেশেই এসেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও? আমরা বললাম, খেজুর কিনতে চাই। আমাদের কাছে একটি লাল উট ছিল যার ওপর নাকে বাঁধা রশি ছিল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সেই উট বিক্রি করবে? তারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে উটটি বিক্রি করতে রাজী হল। লোকটি মূল্য কমাবার জন্য একটি কথাও বললেন না এবং উটের নাকের রশি সামলে নিয়ে শহরে চলে গেলেন। শহরের ভেতরে চলে গেলে লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আমরা করলামটা কি? এমন একজনকে দিয়ে দিলাম যাকে আমরা চিনি না, আর মূল্য আদায়ের কোন ব্যবস্থাও করলাম না!

আমাদের সাথে একজন পর্দানশীন মহিলাও ছিল যে ছিল গোত্র প্রধানের স্ত্রী। সে বলল, আমি ঐ লোকটির চেহারা খুব ভালভাবে দেখেছি যা পূর্ণিমার চাঁদের মত আলো ঝলমল করছিল। এমন একজন যদি মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে (তাঁর হয়ে) আমি আদায় করব।

আমরা এই নিয়ে কথা বলছিলাম, এমন সময় একজন এলেন, বললেন, আমাদের আল্লাহ্‌র রসূল (সা) পাঠিয়েছেন এবং উটের মূল্য হিসাবে খেজুর পাঠিয়েছেন। তোমাদের খিলাফতের খেজুর আলাদা রাখো। অতঃপর খাও, দাও এবং অধিক মূল্যের খেজুরগুলো মেপে পুরো কর। আমরা খেয়ে দেয়ে যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন শহরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম, সেই পূর্বের দেখা লোকটি মসজিদের মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ওয়াজ করছেন। এ সময় আমরা তাঁকে নিম্নোক্ত ওয়াজ করতে শুনলেন ঃ

تصدقوا فان صدقة خيرلكم اليد العلياء خيرمن اليد السفلى ـ

امك وابا ك واختك واخاك وادناك وادناك ـ

"লোক সকল! তোমরা দান-খয়রাত করতে থাক। কেননা দান-খয়রাত তোমাদের জন্য উত্তম। নিচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত অর্থাৎ গৃহীতার হাতের

চেয়ে দাতার হাত) উত্তম। মাকে, বাপকে বোনকে, ভাইকে, অতঃপর নিকটাত্মীয়কে, এরপর তার কাছাকাছি লোকদেরকে দান কর"।[১]

নুজায়ব গোত্রের প্রতিনিধি দল

নুজায়ব গোত্রের তের সদস্য-বশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হলো। তারা তাদের গোত্রের মাল-মাত্তা ও চতুষ্পদ পশুর যাকাত নিয়ে এসেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং নিজেদের গোত্রের গরীব-দুঃস্থ লোকদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দাও। তারা আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফকীরদের দেওয়ার পর যা থাকবে আমরা তাই নিয়ে এসেছি।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের থেকে উত্তম কোন প্রতিনিধি দল আর কেউ আসেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হেদায়েত আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ যার মঙ্গল চান তার বুক ঈমানের জন্য খুলে দেন।

এরপর তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তিনি সে সব প্রশ্নের জওয়াব লিখে দেন।

এ সমস্ত লোক কুরআন শরীফ ও নবী করীম (সা)-এর সুন্নতসমূহ শেখার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল। এজন্য নবী করীম (সা) হযরত বেলাল (রা)-কে তাদের খেদমতের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করে দেন।

তারা ফেরার অনুমতি লাভের জন্য খুবই অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা এখান থেকে যাবার জন্য অস্থির কেন? তারা জানায়, আমাদের হৃদয়মন আবেগোদ্দীপ্ত এজন্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্দর্শন দ্বারা যে আলো ও নূর আমরা লাভ করেছি, আল্লাহ্র নবীর কথা থেকে যেই ফয়েয আমরা পেয়েছি এবং যেই বরকত ও উপকারিতা আমরা এখানে এসে লাভ করেছি সে সব সম্পর্কে যথাসত্বর আমাদের কওমের লোকদের জানাতে চাই।

নবী করীম (সা) অতঃপর তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দ্বারা ভরপুর করে দেন এবং বিদায় কালে বলেন, তোমাদের মধ্যে আর কেউ বাকী আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, একজন তরুণ বাকী রয়ে গেছে যাকে আমরা আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে এসেছি। নবী করীম (সা) তাকেও পাঠিয়ে দেবার জন্য বলেন। সে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার কওমের লোকদের ওপর স্নেহ ও করুণা বর্ষণ করেছেন। আমাকেও কিছু দয়া করুন।

নবী করীম (সা) তাকে বললেন, তুমি কি চাও?

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৪৬-৪৭; ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী একে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চাওয়া আমার কওমের চাওয়া থেকে ভিন্ন। আমি জানি, তারা এখানে ইসলামের প্রতি প্রেম ও ভালবাসায় এসেছে এবং তারা সাদাকার মালও সাথে এনেছিল।

নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি চাও?

সে বলল, আমি আমার বাড়ি থেকে কেবল এজন্যই এসেছিলাম যে, হুযূর আমার জন্য দু'আ করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন, আমার ওপর দয়া করেন এবং আমার দিল্‌কে ধনী বানিয়ে দেন।

নবী করীম (সা) তার জন্য সেই দুআই করলেন। হি. ১০ সনে যখন নবী করীম (সা) হজ্জ করেন তখন এই কবিলার লোকেরা পুনরায় হুযূর আকরাম (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। নবী করীম (সা) উক্ত তরুণের কথা তাদের জিজ্ঞেস করেন, বলেন, সেই তরুণের খবর কী? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ পর্যন্ত আমরা তার মত আর কাউকে দেখতে পাইনি এবং তার মত অল্পে তুষ্ট কোন লোকের কথা শুনি নি। দুনিয়ার সব সম্পদ তার সামনে ভাগ-বণ্টন হলেও সে চোখ তুলে চাইবে না।[১]

বনূ সা'দ ইবন হুযায়ম-এর প্রতিনিধি দল

এটি বনূ কুদা'আর একটি শাখা গোত্র। তারা যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছে তখন নবী করীম (সা) একটি জানাযার সালাত আদায় করছিলেন।

তারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে হাজির হবার আগে আমাদের কোন কাজ করা উচিত হবে না। এজন্য তারা একদিকে আলাদা হয়ে বসে থাকল। হুযূর আকরাম (সা) যখন এদিক দিয়ে মুক্ত হলেন তখন তাদেরকে ডাকলেন, জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা মুসলমান। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দোআয় শামিল হলে না কেন? তারা বলল, আমরা মনে করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়আত হবার আগে কোন কাজই করা জায়েয হবে না। নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা যেই মুহূর্তেই ইসলাম কবূল করেছ সেই তখন থেকেই তোমরা মুসলমান হয়ে গেছ।

ইতোমধ্যে সেই মুসলমানও এসে পৌঁছুল যাকে তারা তাদের সওয়ারীর কাছে বসিয়ে রেখে এসেছিল। প্রতিনিধি দল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমাদের মধ্যে সবার ছোট এবং সেজন্য সে আমাদের খাদেম। নবী করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ, اصغر القوم خادمهم কওমের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি মুরুব্বীদের খাদেম হয়ে

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৫-৫১; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩২৩।

থাকে। আল্লাহ্ তাকে বরকত দিন। এই দো'আর বরকত হলো এই যে, সেই তার কওমের ইমাম, কওমের মধ্যে সেই কুরআন মজীদের সবচে' বেশি জাননেওয়ালায় পরিণত হয়।

প্রতিনিধি দলটি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমগ্র কবিলায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।[১]

বনী আসাদ প্রতিনিধি দল

এরা ছিল দশ সদস্যবিশিষ্ট যাদের মধ্যে ওয়ারিস ইবন মা'বাদ ও খুওয়ায়লিদ ছিলেন। তাঁরা রসূল আকরাম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর আপনি তাঁর বান্দা ও রসূল। দেখুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা নিজেরাই নিজ থেকে হাজির হয়েছি আর আপনি আমাদের কাছে কোন লোকও পাঠান নি। তাদের এই কথার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ـ قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"ওরা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কর না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

[সূরা হুজুরাত, ১৭ আয়াত]

অতঃপর তারা নবী করীম (সা)-কে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তন্মধ্যে তারা জানতে চায়, জানোয়ারের ডাক ও চিৎকার ধ্বনি থেকে অশুভ অর্থ গ্রহণ কেমন? আল্লাহ্র রসূল (সা) তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করেন। তারা নিবেদন করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আরেকটি কথা জানা বাকী রয়ে গেছে, সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তা কী? তারা বলল, দাগ টানা। তিনি বললেন, একজন নবী তা মানুষকে শিখিয়েছিলেন যা কেউ কোন সূত্র থেকে পেয়েছিল। অবশ্যই তা একটি জ্ঞান।[২]

বাহরা' প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় এসে হযরত মিকদাদ (রা)-এর ঘরের সামনে উট থামায়। মিকদাদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে বললেন তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে এবং

১. প্রাগুক্ত, ৬৫২ পৃ. প্রাগুক্ত; ৩২৯ পৃ.।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৫৪; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২৯২।

নিজে তাদের কাছে গেলেন এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপনপূর্বক নিজের ঘরে নিয়ে আসলেন। তিনি তাদের সামনে 'হায়স' নামক এক প্রকার খাবার রাখলেন যা খেজুর ও ছাতু একত্রে মিলিয়ে ঘি'র ভেতর তৈরি করা হয়। ঘি'র সঙ্গে কখনো কখনো চর্বিও দেওয়া হয়।

এই খাবারের ভেতর থেকে কিছু পরিমাণ নবী করীম (সা)-এর জন্যও হযরত মিকদাদ (রা) পাঠিয়ে দেন। নবী করীম (সা) কিছুটা খেয়ে সেই পাত্র ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত মিকদাদ এখন দু' বেলাই সেই পেয়ালা ঐ সব মেহমানের সামনে পেশ করতেন। আর তারা খুব আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন, খুব পেট ভরে খেতেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও খাবার কম হতো না। তারা এ দৃশ্যে খুবই বিস্মিত হন। শেষে একদিন তারা মেযবানকে জিজ্ঞেসই করে বসেন ঃ

মিকদাদ! আমরা শুনেছিলাম, মদীনার লোকদের খোরাক যবের ছাতু ইত্যাদি। তুমি তো আমাদের সব সময় সেই খাবার খাইয়েছ যা আমাদের সেখানে খুবই উত্তম ও উপাদেয় খাবার হিসাবে বিবেচিত হয় আর দৈনিক আমাদের ভাগ্যে জোটেও না। আবার খাবারও এমন মজাদার যে, আমরা কখনো এমন খাবার খাইও নি।

হযরত মিকদাদ (রা) বলেন, ভাই সকল! এ সব কিছুই নবী করীম (সা)-এর বরকত বৈ আর কিছু নয়। কেননা নবী করীম (সা)-এর মুবারক হাতের স্পর্শ এ খাবারে লেগেছিল।

একথা শুনতেই সবাই একমত হয়ে বলল এবং একথা বলে নিজেদের ঈমান তাজা করল যে, নিশ্চিতই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। এরপর তারা আরও কিছু কাল মদীনায় অবস্থান করল, কুরআনুল করীম ও হুকুম-আহকাম শিখল এবং এরপর দেশে চলে গেল।[১]

হাওলান গোত্রের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলের সদস্যও ছিল দশজন। দশম হিজরীর শা'বান মাসে তারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। তারা আরয জানায়, আমরা আমাদের কওমের পশ্চাৎপদ লোকদের পক্ষ থেকে উকীল হিসাবে এসেছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর আমাদের ঈমান আছে। আমরা হুযূর (সা)-এর খেদমতে দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে এসেছি এবং স্বীকার করছি, আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগ্রহ রয়েছে। আমরা কেবল হুযূর (সা)-এর যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি।

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৫৫-৫৬; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩৩১।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, من زارنى بالمدينة كان فى جوارى يوم القيمة "যে ব্যক্তি মদীনায় এসে আমার যিয়ারত করল কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।" এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আম্মু আনাসের কি হলো? (আম্মু আনাস ছিল একটি মূর্তির নাম যা তাদের উপাস্য দেবতা ছিল)। প্রতিনিধি দল উত্তরে জানায়, আল্লাহ্র হাজারো শোকর যে, আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সা)-এর শিক্ষা ও তা'লীমকে তার বিনিময় বানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কোন কোন বুড়ো-বুড়ি এখন পর্যন্ত তার পূজা করে। এখন ইনশাআল্লাহ্ আমরা গিয়ে সেটা ভেঙে ফেলব। আমরা দীর্ঘকাল ধোঁকা ও ফেতনার মাঝে নিক্ষিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, আচ্ছা, তোমরা কোন একদিনের ঘটনা বলতো দেখি?

প্রতিনিধি দল জানায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একবার আমরা এক'শ বলদ একত্র করি ও সবগুলো একই দিনে 'আম্মু আনাসের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় এবং জীব-জন্তুর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ আমাদের গোশ্ত ও পশুর খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। তারা আরও জানায়, চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষিজাত পণ্যের একটি অংশ আগাগোড়াই 'আম্মু আনাসের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হতো। যখন কেউ ক্ষেত-খামার করত তখন তার মধ্যবর্তী অংশ 'আম্মু আনাসের জন্য নির্দিষ্ট করা হতো এবং প্রান্তের অংশ আল্লাহ্র নামে নির্ধারিত করা হতো। যদি ফসল মারা যেত তাহলে আল্লাহ্র নামে নির্ধারিত অংশ 'আম্মু আনাসের নামে করে দেওয়া হতো, কিন্তু 'আম্মু আনাসের অংশ আল্লাহ্র নামে করা হতো না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে দীনের অপরিহার্য বিষয়াদি, যেমন ফরয ও ওয়াজিব শিখিয়েছেন, বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাদেরকে নসীহত করেন এবং উপদেশ দেন ঃ

(১) প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে, (২) আমানত আদায় করবে, (৩) প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, (৪) কারুর ওপর জুলুম করবে না। (৫) তিনি এও বলেন, জুলুম-নির্যাতন কিয়ামতের দিন তার জন্য অন্ধকার ডেকে আনবে।[১]

বনূ মাখারিব প্রতিনিধি দল

এরাও ছিল দশ সদস্য বিশিষ্ট যারা কওমের পক্ষ থেকে অভিভাবক হিসাবে হিজরী ১০ম সনে এসেছিল। হযরত বেলাল (রা) এদের মেহমানদারীর ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনিই তাদের জন্য খাবার বয়ে আনতেন। একদিন জোহর থেকে আসর পর্যন্ত গোটা সময় নবী করীম (সা) তাদেরকে দেন।

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৬২; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩২৪।

এদের ভেতরকার একজনকে নবী করীম (সা) দেখতে শুরু করলেন। এরপর বললেন, আমি তোমাকে আগেও দেখেছি। লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! হ্যাঁ, হুযূর (সা) আমাকে দেখেছিলেন এবং আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। আর আমি সেদিন খুব খারাপ ভাষায় হুযূর (সা)-এর কথার জওয়াব দিয়েছিলাম এবং খুব খারাপভাবে হুযূর (সা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এটি ছিল উকায বাজারের ঘটনা যেখানে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, লোকদেরকে বোঝাতেন। নবী করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ, ঠিক।

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার বন্ধুদের মধ্যে সেদিন কেউই আমার চেয়ে বেশী হুযূর (সা)-এর বিরোধিতাকারী এবং ইসলাম থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিল না। তারা সকলেই তাদের পৈতৃক ধর্মে থেকেই (অবিশ্বাসী অবস্থায়) মারা গেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর, তিনি আজও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং হুযূর (সা)-এর ওপর ঈমান আনা আমার ভাগ্যে জুটেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সকলের দিল্ আল্লাহ্‌র হাতে।

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রথম দিককার অবস্থা মার্জনার জন্য আপনি দো'আ করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কুফরী অবস্থায় যা কিছু ঘটেছে ইসলাম তা সবই মিটিয়ে দেয়, নিঃশেষ করে দেয়।[১]

বনূ 'আব্‌স-এর প্রতিনিধি দল

নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের চার মাস আগে এই প্রতিনিধি দলটি এসেছিল। এরা ছিল নাজরান এলাকার অধিবাসী। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েই তারা হুযূর (সা)-এর খেদমতে এসেছিল। তারা আরয জানায়, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইসলামের ঘোষকদের থেকে শুনেছি, হুযূর আকরাম (সা) বলেন, لا اسلام لمن لا هجرة له "যে হিজরত করে নি সে মুসলমান নয়।"

'আমাদের কাছে সম্পদ আছে, পশু পাল আছে যার সাহায্যে আমাদের দিন গুজরান চলে। এখন হিজরত ছাড়া যদি আমাদের ইসলামই সঠিক না হয় তাহলে আমাদের ধন-সম্পদ কী কাজে আসবে আর আমাদের পশু পালই বা আমাদের কোন উপকার দর্শাবে? বরং এটাই ভাল, আমরা আমাদের সব কিছু বিক্রি করে সকলে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যাই।'

নবী করীম (সা) তখন বললেন, اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم اعمالكم شيئا ـ

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৬৩-৬৪; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২৯৯।

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে। এতে তোমাদের আমল এতটুকু হ্রাস পাবে না।"[১]

গামিদ প্রতিনিধি দল

হিজরী দশম সনে এই প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। এই প্রতিনিধি দলটিও ছিল দশ সদস্যবিশিষ্ট। এরা মদীনা থেকে বাইরে এসে অবতরণ করে। একজন বালককে সামানের কাছে বসিয়ে রেখে তারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। নবী করীম (সা) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তোমাদের সামানের কাছে কাকে বসিয়ে রেখে এসেছ? লোকেরা জওয়াব দেয়, একজন বালককে বসিয়ে রেখে এসেছি। নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা চলে আসার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরপর চোর আসে এবং তোমাদের গাঁঠরি চুরি করে পালিয়ে যায়। প্রতিনিধি দলের একজন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই গাঁঠরি আমার ছিল। নবী করীম (সা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ঘাবড়িও না। ইত্যবসরে বালকটি জেগে যায় এবং চোরের পেছনে পেছনে দৌড়ায় এবং তাকে গিয়ে পাকড়াও করে। মাল-আসবাব সবই মিলে যায় ঠিকঠাক মত।

প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বালক থেকে জানতে পারে, নবী করীম (সা) যেভাবে তাদেরকে গোটা ব্যাপারটা অবহিত করেছিলেন– আসলে ব্যাপারটি তেমনি ঘটেছিল। প্রতিনিধি দল ঠিক সেই মুহূর্তেই মুসলমান হয়ে যায়। নবী করীম (সা) হযরত উবায়্যি ইবন কা'ব (রা)-কে তাদের কুরআন শরীফ মুখস্থ করানো এবং ইসলামী শরীয়তের তা'লীম দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। তারা যখন ফিরে যেতে থাকে তখন তাদেরকে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে একটি কাগজে লিখে দেওয়া হয়।[২]

বনূ ফাযারাহ্র প্রতিনিধি দল

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তবূক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বনূ ফাযারাহ্র একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে এসে উপস্থিত হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন দশ থেকে পনের জনের মত। তারা ইসলাম স্বীকার করত। আরোহণের জন্য তাদের ছিল কৃশ ও দুর্বল উট। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের বস্তিগুলোর অবস্থা কি? তারা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! বস্তিগুলোতে দুর্ভিক্ষ চলছে, পশুপাল মারা গেছে, বাগানগুলো শুকিয়ে গেছে আর বাল-বাচ্চা ক্ষুধায় মরছে। আপনি আল্লাহ্র দরবারে দোআ করুন যেন তিনি

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৭০; ঐ, ২৯৫ পৃ.।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৭১; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩৪৫।

আমাদের ফরিয়াদ শোনেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করুন। আর আল্লাহ্ আমাদের জন্য আপনার কাছে সুপারিশ করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা যা বললে আল্লাহ্ সে সব থেকে পাক পবিত্র। তোমাদের খারাপ হোক। ভাল কথা, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করব, কিন্তু আল্লাহ কার কাছে সুপারিশ করবেন? তিনিই উপাস্য প্রভু। তিনি ব্যতিরেকে কেউ মা'বূদ নেই। তিনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। আসমান ও যমীনের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই।

অতঃপর নবী করীম (সা) তাদের কওমের জন্য বৃষ্টির দোআ করেন। যে ভাষায় তিনি দোআ করেছিলেন হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থগুলোতে তা সংরক্ষিত আছে। আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

اللهم اسق عبادك وبهائمك ،انشر رحمتك واحى بلدك الميت ـ

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير اجل

نافعا غيرضار اللهم سقيارحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا

محق ـ اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء ـ

"হে আল্লাহ! তুমি তোমাদের বান্দাদেরকে পানি পানে পরিতৃপ্ত কর, পান করাও পশুপালকে। তোমার রহমতের বিস্তার ঘটাও এবং তোমার মৃত জনপদগুলো জীবিত কর। ইলাহী! আমরা তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি বৃষ্টির যা হবে আরাম ও স্বস্তিদায়ক যা খুব সত্বর আসবে দেরী না করে, যা হবে উপকারী, ক্ষতিকর হবে না, যা পরিতৃপ্ত করবে। ইলাহী! তোমার করুণা দিয়ে আমাদেরকে তৃপ্ত কর। আযাব দিও না যা আমাদের ধ্বংস করবে, নিমজ্জিত করবে, ভাসিয়ে দেবে। মেহেরবান মালিক! বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে পরিতৃপ্ত কর এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর"।[১]

সালামান প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলটি ছিল সতের সদস্যবিশিষ্ট। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিল। এদের ভেতর একজনের নাম ছিল হাবীব ইবন আমর। সে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, সকল আমলের চেয়ে উত্তম আমল কী? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সময় মতো সালাত আদায় করা। তাঁরা বলল, আমাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। আপনি দোআ করুন।

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৫৩-৫৪; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ২৯৭; দোআর শব্দসমূহ সুনানে আবূ দাউদ, হাকেম-এর মুস্তাদরাক ও সুনানে বায়হাকীতে বর্তমান।

রসূলুল্লাহ্ (সা) দোআ করলেন, اللهم اسقهم الغيث فى دارهم। "হে আল্লাহ! তাদের জনপদে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর।"

হাবীর আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার মুবারক হাত উঠিয়ে দোআ করুন। নবী করীম (সা) তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাত তুলে দোআ করলেন।

প্রতিনিধি দলটি দেশে ফিরে গিয়ে জানতে পারে, যেদিন নবী করীম (সা) বৃষ্টির জন্য দোআ করেছিলেন ঠিক সেই দিনই বৃষ্টি হয়েছিল।[২]

নাজরান প্রতিনিধি দল[৩]

নাজরানের প্রতিনিধি দল সম্পর্কে হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থগুলোতে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় সে সব বর্ণনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে জানা যায়, নাজরান প্রতিনিধি দল দু'বার নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিল। সেই ধারাক্রম অনুসরণ করেই আমরা তাদের আলোচনা করছি।

আবূ আবদিল্লাহ হাকেম-এর বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (সা) নাজরানবাসীদের ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে পত্র দেন। যখন উস্কাফ এই পত্র পাঠ করলেন তখন তাঁর শরীর কেঁপে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ শরজীল ইবন দাউদ ইবন বিদআকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হামদান গোত্রের লোক ছিলেন। কোন বড় কাজই প্রশাসক, উপদেষ্টা কিংবা পাদ্রী তাঁর পরামর্শ ব্যতিরেকে করতেন না।

উস্কাফ তাকে পত্র দিলেন। তার পত্র পাঠ শেষ হতেই উস্কাফ বললেন, আবূ মরিয়ম! বলুন, আপনার মত কি?

শরজীল বললেন, সাহেব! এতো আপনার জানাই আছে যে, আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে এই ওয়াদা করে রেখেছেন, ইসমাঈল (আ)-এর বংশে নবুওতও হবে। সম্ভবত ইনি সেই ব্যক্তিই হবেন। কিন্তু নবুওত সম্পর্কে কী অভিমত হতে পারে! জাগতিক ও পার্থিব কোন বিষয় হলে আমি সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারতাম এবং নিজের মতামতও পেশ করতে পারতাম।

উস্কাফ তাঁকে বসতে বললেন। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন শরজীল নামক আরেকজনকে ডেকে পাঠালেন। ইনি ছিলেন হামীর গোত্রের লোক। তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুবারক পত্রখানি দেখিয়ে তার অভিমত জানতে চাইলেন। তিনিও শরজীলের মতই জওয়াব দিলেন।

অতঃপর উস্কাফ জাব্বার ইবন কায়েস নামক তৃতীয় আরেকজনকে ডেকে পাঠান। ইনি ছিলেন বনূল হারিছ ইব্ন কা'ব-এর সদস্য। তাঁকেও পত্র মুবারক

১. রহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃ. যাদুল মা'আদ সূত্রে।
২. ঘটনাটি গোটা যাদুল মা'আদ ও দালাইলুন-নবুওতে বিদ্যমান।

দেখান হয় এবং তাঁর মতামত চাওয়া হয়। তিনিও পূর্ববৎ দু'জনের ন্যায় একই উত্তর দেন।

এরপর উস্কাফ যখন দেখতে পেলেন, তাদের মধ্যে কেউই উত্তর দিচ্ছেন না তখন তিনি ঘন্টা বাজাবার নির্দেশ দিলেন এবং চটের পর্দা গির্জার ওপর টাঙিয়ে দিতে বললেন। তাদের বড় কোন ব্যাপার কিংবা অভিযানের সম্মুখীন হলে লোকজন ডাকার জন্য নিয়ম ছিল দিনের বেলায় ঘন্টা বাজানো এবং রাত্রিবেলা পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বালানো। এই গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ৭৩ টি গ্রাম যেগুলোতে এক লাখের অধিক যুদ্ধক্ষম পুরুষ বসবাস করত। উপত্যকার উঁচু অংশ ও উৎরাইয়ের অংশের দৈর্ঘ্য একজন অশ্বারোহীর একদিনের পথ ছিল। সকল এলাকার লোক যখন জড়ো হলো, যারা সকলেই খ্রিস্টান ছিল, তখন উস্কাফ তাদেরকে প্রেরিত লিপি মুবারক পাঠ করে শোনান এবং এ ব্যাপারে তাদের অভিমত জানতে চান। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শরজীল, আবদুল্লাহ্ ও জাব্বারকে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পাঠানো হবে। তাঁরা সেখানে গিয়ে সকল অবস্থা ও বিষয় জেনে এসে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন।

এঁরা মদীনায় পৌঁছেন এবং কয়েক দিন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে অবস্থান করেন। এঁরাই নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কথা এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে চান। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ط اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

"আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; এরপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে; সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এই বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে, তোমাদের পুত্রগণকে আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর দেই লা'নত।" [সূরা আল-ইমরান, ৬ষ্ঠ রুকূ]

এই আয়াত নাযিল হলে নবী করীম (সা) মুবাহালার জন্য হযরত হাসান ও হুসায়নকে ডাকলেন এবং পৃথিবীর তাবৎ নারীদের সর্দার হযরত ফাতেমা (রা)-কেও ডেকে পাঠালেন। তিনি পিতার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল আপোসে পরামর্শের জন্য মিলিত হন। এ সময় শরজীল তার সাথীদেরকে বলেন, দেখো, নবী দাবিদার এই লোকটি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতে উপনীত হওয়া খুব সহজ নয়। সমস্ত উপত্যকার লোক একত্র হয়ে তবেই না আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমি মনে করি, ইনি যদি বাদশাহ হন তথাপিও তাঁর সঙ্গে মুবাহালায় যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা সমগ্র আরবের মাঝে কেবল আমরাই তাঁর চোখে কাঁটার মত ফুটতে থাকব। আর যদি তিনি প্রেরিত নবী হন তাহলে তাঁর অভিশম্পাতের পর আমাদের একটি খড়কুটাও যমীনের বুকে অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্য আমার মতে এটাই উত্তম, আমরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিই এবং কী পরিমাণ অর্থ জিযয়া হিসাবে দিতে হবে সে ফয়সালাটাও তাঁরই ওপর ছেড়ে দিই। কেননা আমি যতদূর বুঝেছি, তিনি শক্ত মেযাজের লোক নন। উভয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হলে তারা সকলে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়ে নিবেদন করলেন, মুবাহালার চাইতে আমাদের জন্য এটাই উত্তম, কাল সকাল পর্যন্ত হুযূর (সা)-এর কাছে আমাদের জন্য যা ভাল বোধ হয় তা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিন।

পরের দিন হুযূর আকরাম (সা) তাদের ওপর জিযয়া নির্ধারণ করে দেন এবং একটি চুক্তিপত্র যা হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) লিখেছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, গায়লান ইবন 'আমর, মালিক ইবন আওফ ও আকরা' ইবন হাবিস (রা) যার ওপর সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করেছিলেন, লিখে তাদেরকে প্রদান করেন। চুক্তিপত্রে হুযূর আকরাম (সা) খ্রিস্টানদের অত্যন্ত উদার ও অকৃপণভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছিলেন।

ফরমান লাভ করত এঁরা নাজরানে ফিরে যান। বিশপ উস্কাফ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এক মনযিল এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধি দল এই ফরমান উস্কাফের সামনে পেশ করে। তিনি চলা অবস্থায় এটি পড়তে থাকেন। তাঁর চাচাতো ভাই বাশার ইবন মু'আবিয়া (রা), যাঁর ডাক নাম ছিল আবূ আলকামা–তাঁর বরাবর ছিলেন। তিনিও পত্রের অর্থের দিকে এতটাই মনোনিবেশ করেন যে, বেখেয়াল হয়ে যান এবং উটনী তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়। তিনি মাটিতে পড়তেই বলে ওঠেন, সর্বনাশ হোক সেই ব্যক্তির যে আমাদেরকে এতটা কষ্টের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। বাশারের একথার ইঙ্গিত ছিল নবী করীম (সা)-এর দিকে।

একথা শুনতেই উস্কাফ বলে ওঠেন, দেখো, তুমি কী বলছ সেদিকে কি তোমার খেয়াল আছে? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত নবী।

বাশার উত্তরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমিও উটনীর পাল তাঁরই কাছে গিয়ে নামাব, এই বলে তিনি তার গতিমুখ পাল্টে দিলেন এবং মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

উস্কাফও তার পেছনে উটনী হাঁকালেন এবং চীৎকার করে বলতে থাকলেন, আরে কোথায় যাও? আমার কথা শোন। আমার কথা তো শুনবে! কথার অর্থ বুঝতে তো চেষ্টা করবে। আমি তো একথা এজন্যই বলেছিলাম যাতে ঐসব গোত্রের মধ্যে এটা প্রচারিত হয়ে যায় যাতে একথা কেউ না বলতে পারে যে, আমরা সনদ হাসিল করতে কোনরূপ বোকামি করেছি অথবা বদান্যতা গ্রহণ করেছি, অথচ অপরাপর কবিলা এখন পর্যন্ত তাঁর বদান্যতা কবুল করেনি। আর আমাদের শক্তি ও শান-শওকত অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি।

বাশার বললেন, না, না, আল্লাহ্‌র কসম! না। আমি এখন আর থামব না। তোমার মাথা থেকে এ ধরনের ভুল কথা বের হতেই পারে না, এই বলে তিনি সোজা মদীনায় চলে গেলেন।

বাশার অতঃপর হুযূর আকরাম (সা)-এর খেদমতে পৌঁছে সেখানেই থেকে যান এবং একদিন শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। অবশেষে প্রতিনিধি দল নাজরান পৌঁছুলে নাজরানের গির্জায় অবস্থানকারী একজন রাহেবও কোন লোক মারফত এই সমস্ত ঘটনা শুনতে পান। তিনি তখন গির্জার বুরুজের শীর্ষ দেশে উঠে, যেখানে তিনি বছরের পর বছর থেকেছেন, চীৎকার শুরু করে দেন, আমাকে নামিয়ে দাও; নইলে আমি ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ব। এতে আমার জীবনও যদি চলে যায় যাক। এই রাহেবও কিছু উপহার-উপঢৌকন নিয়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। একটি পেয়ালা, একটি লাঠি ও একটি চাদর তিনি উপহার হিসাবে পেশ করেছিলেন। এই চাদরটি আব্বাসী খলীফাদের খেলাফত কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। রাহেব বেশ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এরপর নবী করীম (সা)-এর অনুমতিক্রমে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতে নাজরান চলে যান। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর জীবন কালে তিনি আর ফিরে যান নি।

(ঘ) এই প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে কিছু কাল পর উস্কাফ আবুল হারিছ (যিনি গির্জার প্রধান ছিলেন, কনস্টান্টিনোপলের রোমক সম্রাট যাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন, সাধারণ মানুষ যাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করত এবং যাঁকে স্বীয় ধর্মের মুজতাহিদ হিসাবে গণ্য করা হতো) নবী করীম (সা)-এর

খেদমতে হাজির হন। তাঁর সাথে ছিলেন আয়হাম নামের এলাকার একজন নবীন জজ ও প্রশাসক। তাঁকে সাইয়িদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল এবং আবদুল মসীহ-আকিব উপাধিতেও যাঁকে সম্বোধন করা হতো, যিনি গোটা এলাকার গভর্নর ও আমীর ছিলেন। অবশিষ্ট ২৪ জন ছিল বিখ্যাত সর্দার। কাফেলার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন। এঁরা আসরের সময় মসজিদে নববীতে পৌঁছেছিল। এ সময়টি ছিল তাঁদের উপাসনার সময় (সম্ভবত দিনটি ছিল রবিবার)। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে স্বীয় মসজিদে ইবাদত সম্পন্ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তারা পূর্বমুখী হয়ে তাদের উপাসনা করেছিল। কতক মুসলমান তাদেরকে মসজিদে নববীতে খ্রিস্টীয় উপাসনা করার বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের এ থেকে বিরত রাখেন।

ইয়াহূদীরাও তাদেরকে দেখতে আসত এবং কখনো কখনো তাদের সঙ্গে কোন কোন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনাও হতো। একবার নবী করীম (সা)-এর সামনে ইয়াহূদীরা বর্ণনা করল, হযরত ইবরাহীম (আ) ইয়াহূদী ছিলেন। অপর দিকে ঐ সব খ্রিস্টান বলল, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। তাদের এসব কথার প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ - هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ - فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا - وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"হে কিতাবীগণ! ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? তোমরা কি বোঝ না? হ্যাঁ, তোমরা তো সেই সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তো তোমরাই তর্ক করেছ। তবে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না। ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না আর খ্রিষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।"

[আল-ইমরান, ৭ম রূকূ]

একবার ইয়াহূদীরা (মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশে) বলল, মুহাম্মদ! আপনারা কি এটা চান, আমরা আপনারও ইবাদত করতে থাকি যেমনটি খ্রিস্টানেরা ঈসা (আ)-এর ইবাদত করে?

নাজরানের এক খ্রিস্টান বলল, হ্যাঁ, মুহাম্মদ! বলুন আপনারও কি একই ইচ্ছা এবং আপনিও কি একই আকীদা-বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন? নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র পানাহ চাই আমি আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অপর কারুর ইবাদত করা থেকে এবং অপর কাউকে গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করা থেকেও আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ আমাকে এ কাজের জন্য পাঠান নি এবং আমাকে এ ধরনের হুকুমও তিনি দেন নি।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত নাযিল হয় ঃ

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ط اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভন নয়, বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।

"ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে?" [সূরা আল-ইমরান, ৮ম রুকূ]

মুহাম্মদ ইবন সুহায়ল-এর বর্ণনা, সূরা আল-ইমরান-এর শুরু থেকে ৮০ আয়াত পর্যন্ত নাযিলও ঐ প্রতিনিধি দলের বর্তমান থাকা অবস্থায় হয়েছিল। যখন তারা ফিরে যাচ্ছিল তখন নবী করীম (সা) একটি সনদ তাদের লিখে দেন যাতে গির্জা ও পাদ্রীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল।[১]

তারা এও দরখাস্ত করেছিল, একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার মানুষ আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যিনি আমাদের থেকে জিয়য়া আদায় করবেন। নবী করীম (সা)

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬২৯-৩৭; দালাইলুন নবুওত, ৫ম খণ্ড, ৩৮২-৯৩; ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৫৭৩-৮৪; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩৫৭; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, নাজরানের ঘটনা শীর্ষক অধ্যায়ে এই কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বিদ্যমান।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রা)-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, ইনি আমার উম্মতের সর্বাধিক আমানতদার।[১]

হযরত আবূ উবায়দা (রা)-র পবিত্র সান্নিধ্যের বরকতে গোটা এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

নাখ' গোত্রের প্রতিনিধি দল

হিজরী ১১শ সনের মুহাররাম মাসের মাঝামাঝি প্রতিনিধি দলটি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়। এর পর আর কোন প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে নি। এদের সংখ্যা ছিল দুই শত। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-এর হাতে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে। তাঁদেরকে দারুয-যি'আফায় (মেহমানখানায়) রাখা হয়।

এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যুরারা ইবন আমর। সে নিবেদন করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পথিমধ্যে একটি স্বপ্ন দেখেছি যা ছিল আশ্চর্য ধরনের। নবী করীম (সা) তাকে বললেন, বল, তুমি কী দেখেছ?

সে বলল, আমি দেখলাম, একটি বকরী বাচ্চা প্রসব করেছে যার রঙ সাদা ও কালো মিশ্রিত (আবলাক)। নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী কি আসন্ন সন্তানপ্রসবা? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার স্ত্রীর বাচ্চা হয়েছে এবং পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

যুরারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবলাক হবার অর্থ কি? নবী করীম (সা) তাকে বললেন, কাছে এসো। এরপর খুব নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীরে কি কুষ্ঠের দাগ আছে যা তুমি লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখো? যুরারা একথা শুনতেই বলে উঠল, কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন! আজ পর্যন্ত আমার এই গোপন বিষয়টি কেউ জানত না। নবী করীম (সা) বললেন, বাচ্চার ওপর এরই আছর রয়েছে।

অতঃপর যুরারা দ্বিতীয় স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলল, আমি নু'মান ইবন মুনযিরকে দেখলাম, সংক্ষিপ্ত গোশওয়ারে বাযুবন্দ পরিহিত।

নবী করীম (সা) বললেন, এর ব্যাখ্যা হলো আরব দেশ যা এখন প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করছে।

যুরারা আরয করল, আমি দেখতে পেলাম, একজন বৃদ্ধা মহিলা যার মাথার কিছু চুল সাদা আর কিছু কালো এবং মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। নবী করীম (সা) বললেন, এর অর্থ দুনিয়া যার আয়ু এখনও কিছু বাকী রয়ে গেছে।

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব-এ হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ; সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবা, বাব ফাযাইলু আবী উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রা)।

যুরারা আরয করল, আমি দেখলাম, একটি আগুন মাটি ফুঁড়ে বের হলো এবং আমার ও আমার পুত্র আমরের মাঝে এসে গেল। আগুন বলছিল, ঝলসে দাও, ঝলসে দাও, চাই চক্ষুষ্মান হোক অথবা অন্ধ। আপন খাদ্য, আপন আত্মীয়-পরিজন আমাকে খেতে দাও।

নবী করীম (সা) বললেন, এ একটি ফাসাদ, এক অরাজক ও নৈরাজ্যকর অবস্থা যা শেষ যুগে প্রকাশ পাবে।

যুরারা বলল, এটি কী ধরনের ফেতনা হবে?

নবী করীম (সা) বললেন, লোকেরা তাদের ইমাম (নেতা, শাসক)-কে কতল করে দেবে। ফলে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ দেখা দেবে। একে অন্যের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যাবে যেমন এক হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে ঢুকে যায়। সেদিন অসৎ লোকেরা নিজেদেরকে সৎ ও সজ্জন লোক ভাববে। মুসলমানের রক্ত পানির থেকেও বেশি প্রিয়দর্শন ও সুস্বাদু মনে করা হবে। যদি তোমার সন্তান মরে গিয়ে থাকে তবে সেই ফেতনা দেখতে পাবে। আর তুমি মরলে তোমার সন্তান দেখবে।

যুরারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোআ করুন, আমি যেন সেই ফেতনা না দেখি। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোআ করলেন, ইলাহী! সে যেন সেই ফেতনা না দেখে।

যুরারার ইনতিকাল হয় এবং তাঁর পুত্র বেঁচে থাকে। সে হযরত উছমান গনী (রা)-র বায়'আত ভেঙে ফেলেছিল।[১]

হাজ্জাতুল বিদা'

اذاجاء نصر الله والفتح - ورايت الناس يدخلون فى دين الله

افواجا - فسبح بحمد ربك واستغفره - انه كان توابا -

"যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসল, আর তুমি দেখতে পেলে মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দীনে দাখিল হচ্ছে। তখন তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের তসবীহ্ পাঠ করবে, প্রশংসা জ্ঞাপন করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তওবাহ কবুলকারী" (সূরা নসর, ৩০ পারা)।

বাহ্যত ধারণা হয়, সাহায্য ও বিজয়ের বিপরীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলা দরকার ছিল। তসবীহ পাঠ ও ক্ষমা প্রার্থনার বিজয়ের সঙ্গে কী সম্বন্ধ? এ সম্বন্ধেই একবার হযরত ওমর (রা) সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিভিন্ন অর্থ বললেন। এরপর হযরত ওমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ৬৮৬-৮৭; ইবন সা'দ, ১ম খণ্ড, ৩৪৬।

'আব্বাস (রা)-এর দিকে তাকালেন। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর বয়স ছিল খুবই কম। তিনি জওয়াব দিতে সংকোচ ও ইতস্তত বোধ করছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে উৎসাহিত করলে ও সাহস জোগালে তিনি বললেন, এই আয়াত মহানবী (সা)-র ওফাত আসন্ন, এর ঘোষণা দিচ্ছে আর ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা মৃত্যুর সঙ্গে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।[১]

এই সূরা নাযিল হবার পর তিনি জানতে পারলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় মুহূর্ত অত্যাসন্ন। এজন্য প্রয়োজন ছিল তামাম দুনিয়ার সামনে ইসলামী শরীয়ত ও আখলাকের সমস্ত মূলনীতি সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করে দেওয়ার। অপর দিকে নবী করীম (সা) হিজরতের পর থেকে তখন পর্যন্ত ফরয হজ্জ করেন নি।[২]

একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কুরায়শরা ছিল এ পথের বড় বাধা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হলেও মুসলিহাত তথা সময়োপযোগিতা দাবি করছিল এই অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্যটি সবশেষে আদায় করার।

যা-ই হোক, যিল-কা'দাহ মাসে ঘোষণা করা হলো, নবী করীম (সা) হজ্জ আদায়ের নিয়তে এবার মক্কা যাচ্ছেন। মুহূর্তেই এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর অমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ আদায়ের মহাসৌভাগ্য লাভের বাসনায় সমগ্র আরব যেন মদীনার উদ্দেশে উত্তাল তরঙ্গের মত আছড়ে পড়তে শুরু করল।[৩] যিল-কা'দাহ মাসের ২৬ তারিখে শনিবার দিন। তিনি গোসল করেন। অতঃপর চাদর ও লুঙ্গি পরেন। এরপর জোহর আদায় অন্তে মদীনা থেকে বের হন।[৪] আপন সহধর্মিণিগণকেও তাঁর সাথে যাবার নির্দেশ দেন।[৫]

অতঃপর মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছে যা মদীনার দিক থেকে আগত হাজ্জীদের ইহরাম বাঁধার মীকাত, রাত্রি যাপন করেন।[৬] পরদিন আবার গোসল করেন। হযরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে নবী করীম (সা)-এর শরীর মুবারকে আতর মেখে দেন। এরপর তিনি দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। অতঃপর আল-কাসওয়া নামক উটের পিঠে চড়ে ইহরাম বাঁধেন এবং বুলন্দ আওয়াজে নিম্নোক্ত দোআটি পড়তে থাকেন (যাকে তালবিয়া বলে) ঃ

لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ـ

১. বুখারী কিতাবুত-তাফসীর, সূরা।
২. বুখারী, বিদায় হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বিদায় হজ্জ, শীর্ষক অধ্যায়।
৪. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃ.।
৫. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা' শীর্ষক অধ্যায়।
৬. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, যি'ল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন শীর্ষক অধ্যায়।

"হাজির! হে আল্লাহ্ আমি তোমার সামনে হাজির। হাজির! তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির! সমস্ত প্রশংসা ও নে'আমত তোমারই আর রাজত্বও তোমার; তোমার কোন শরীক নেই।"

এই হাদীছের বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি চোখ তুলে চাইলাম, দেখলাম আগে পিছে, ডাইনে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। কেবল মানুষই চোখে পড়ে। নবী করীম (সা) যখন 'লাব্বাইক' বলতেন, অমনি চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে তা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতো এবং পাহাড়-পর্বত ও পথ-প্রান্তর সে ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে থাকত।[১]

মক্কা বিজয়ের কালে তিনি যে সব মনযিলে সালাত আদায় করেছিলেন সে সব জায়গায় বরকত লাভের বাসনায় লোকে মসজিদ নির্মাণ করেছিল। নবী করীম (সা) ঐ সব মসজিদে সালাত আদায় করতে করতে অগ্রসর হতেন। সারফ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গোসল করেন। ২য় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন (যিল-হাজ্জ মাসের চার তারিখ রবিবার সকালে) তিনি মক্কা মু'আজ্জমায় প্রবেশ করেন। মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত এই গোটা সফর তিনি নয় দিনে অতিক্রম করেন।[২] হাশিমী বংশের বালকেরা নবী করীম (সা)-এর আগমন সংবাদ পেতেই খুশী ও আনন্দের আতিশয্যে পথে বেরিয়ে পড়ে। তিনিও ভালবাসার প্রবল আবেগে তাদের উটের পিঠে কাউকে সামনে আবার কাউকে পেছনে বসিয়ে নেন।[৩] কা'বার প্রতি চোখ পড়তেই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! কা'বা শরীফকে তুমি আরও বেশি সম্মান ও মর্যাদা দান কর।[৪] তারপর তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করেন। তওয়াফ শেষ হতেই মকামে ইবরাহীমে তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى -

"আর মকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান বানাও।"

এরপর তিনি সাফার উদ্দেশে চললেন এবং সেখানে পৌঁছে এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

ان الصفا والمروة من شعائر الله -

এখান থেকে কা'বার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করেন,

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى ويميد

মুসলিম কিতাবুল হাজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
সীরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ.।
সুনান নাসাঈ, কিতাবুল মানাসিক।
সুনানে বায়হাকী, ৫ম খণ্ড, ৭৩।

وهو على كل شئ قدير ـ لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য এবং তাঁরই প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন এবং তিনি মৃত্যু দান করেন। আর সকল কিছুর ওপর তিনিই ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য মা'বূদ নেই; তিনি একক আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দল-উপদলকে পরাভূত করেছেন"।[১]

সাফা পর্বত থেকে নেমে তিনি মারওয়া গমন করেন। এখানেও তিনি দোআ ও তাসবীহ-তাহলীল আদায় করেন। আরববাসী হজ্জ আদায় কালে ওমরাহ পালন নাজায়েয মনে করত। সাফা-মারওয়ার তওয়াফ ও সাঈ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি লোকদেরকে যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না তাদেরকে ওমরাহ শেষ করে ইহ্রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[২] কোন কোন সাহাবী বিগত দিনের অভ্যস্ত প্রথার ভিত্তিতে এই নির্দেশ পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। নবী করীম (সা) তখন বলেন, আমার সাথে যদি কুরবানীর উট না থাকত তাহলে আমিও এমনটিই করতাম।[৩] হযরত আলী (রা)-কে হাজ্জাতুল বিদা'র কিছু কাল আগে ইয়ামন পাঠানো হয়েছিল। এ সময় তিনি ইয়ামানী হাজ্জীদের কাফেলা নিয়ে মক্কায় এসে হাজির হন। যেহেতু তাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল সেজন্য তারা ইহ্রাম খোলেন নি। বৃহস্পতিবার দিন আট তারিখ সমস্ত মুসলমানসহ মিনায় অবস্থান করেন। পরদিন নয়ই যিলহজ্জ জুমুআর দিন ফজরের সালাত আদায় অন্তে মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হন।[৪]

কুরায়শদের নিয়ম ছিল, তারা যখন মক্কা থেকে হজ্জের উদ্দেশে বের হতো তখন আরাফাতের পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করত যা হারাম-এর সীমানার অন্তর্গত। তাদের ধারণা ছিল, কুরায়শরা যদি হারাম ছাড়া অন্য কোন জায়গায় হজ্জের নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদি আদায় করে তাহলে তাদের একক মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেবে। কিন্তু ইসলাম যেই সাধারণ সাম্য কায়েম করতে চায় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই বিধান জারী করলেন ঃ

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাজ্জাতুল বিদা' শীর্ষক অধ্যায়।
২. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা' অধ্যায়; মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাজ্জাতুল বিদা অধ্যায়।
৩. বুখারী, কিতাবুল মানাসিক।
৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।

ثم افيضوا من حيث افاض الناس -[১]

অতঃপর তিনিও সাধারণ মুসলমানদের সাথে আরাফাতে আসেন এবং ঘোষণা জারী করেন قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم -

"তোমাদের পবিত্র স্থানগুলোতে তোমরা অবস্থান কর। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওয়ারিছ।"[২]

অর্থাৎ আরাফাত প্রান্তরে হাজ্জীদের অবস্থান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতিবাহী এবং তিনিই এই স্থানকে এই বিশেষ উদ্দেশেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। আরাফাতে একটি জায়গা আছে যার নাম নামিরা। সেখানে তিনি কম্বলের তাঁবুতে অবস্থান করেন। দুপুরে বেলা গড়িয়ে গেলে তিনি উটনী আল-কাসওয়ার ওপর আরোহণ করে ময়দানে আসেন এবং উটনী পৃষ্ঠে থেকেই খুতবা প্রদান করেন।[৩]

আজ ছিল প্রথম দিন যেদিন ইসলাম আপন শান-শওকতসহ আবির্ভূত হয় এবং জাহিলী যুগের যাবতীয় বেহুদা প্রথা-পদ্ধতি মিটিয়ে দেয়। তিনি বলেন ঃ

الا كل شئ من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع -

"জেনে রেখো! জাহিলী যুগের যাবতীয় বিষয় ও প্রথা-পদ্ধতি আমার দুই পায়ের তলায় দাফন হয়ে গেল।"[৪]

মানবতার পূর্ণতা সাধনের মনযিলে সবচে' বড় প্রতিবন্ধক শ্রেণী বৈষম্য ও মর্যাদাগত ভেদরেখা যা দুনিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম ও দেশ বিভিন্নরূপে কায়েম করে রেখেছিল। রাজা-বাদশাহ্‌রা ছিলেন ঐশী ছায়াস্বরূপ যাদের সামনে কারো টুঁ করার ক্ষমতা ছিল না। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পাদ্রী-পুরোহিতদের সঙ্গে কেউ ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার অধিকার রাখত না । অভিজাত শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর তুলনায় উচ্চতর সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত হতো। ক্রীতদাস তার মনিবের সমকক্ষ হতে পারত না। আজ এই সব পার্থক্য ও ভেদরেখা, এই সব ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও এই সমস্ত সীমারেখা আকস্মিকভাবেই ভেঙে পড়ল।

ليس للعربى فضل على العجمى ولا للعجمى فضل على العربى كلكم ابناء ادم - وادم من التراب -

১. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, উকূফে আরাফা শীর্ষক অধ্যায়।
২. সুনান তিরমিযী, কিতাবুল হজ্জ; আবূ দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, উকূফে আরাফা অধ্যায়।
৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
৪. প্রাগুক্ত।

"আরববাসীর অনারবের ওপর কোন ফযীলত নেই, তেমনি একজন অনারবের আরববাসীর ওপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই আদম সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"[১]

আরবে কোন গোত্র, বংশ বা পরিবারের কোন লোক কারুর হাতে মারা গেলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা গোত্রীয়, বংশীয় ও পারিবারিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হতো। এমন কি শত শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এই দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশিষ্ট থেকে যেত এবং এরই ওপর ভিত্তি করে বিরতিহীন লড়াইয়ের ধারা শুরু হয়ে যেত। এভাবে আরবের যমীন সব সময় রক্তে ভেজা থাকত, থাকত রক্ত রঞ্জিত। আজ এই সর্বপ্রাচীন ও সর্বপুরাতন প্রথা, আরবের সর্বপ্রথম অহংকার ও গর্ব, খান্দানী অহমিকায় ভরা পেশাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হচ্ছে এবং এজন্য নবুওতের ঘোষণাকারী সর্বপ্রথম নিজের উদাহরণ পেশ করছেন ঃ

ودماء الجاهلية مرضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ـ

"জাহিলী যুগের যাবতীয় রক্তের দাবি আজ থেকে বাতিল ও পরিত্যক্ত ঘোষিত হল এবং সর্বপ্রথম আমি আমার পরিবারের ও বংশের রবী'আ ইবনুল হারিছের রক্তের দাবি বাতিল করছি"।[২]

সমগ্র আরব জুড়ে সূদী কারবারের জাল বিস্তৃত ছিল, গরীবের প্রতিটি শিরা উপশিরা ছিল সেই জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী। ফলে তারা বংশানুক্রমে সূদী মহাজনদের গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আজ ছিল সেই দিন যেদিন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করা হচ্ছিল। এই দায়িত্বে পূর্ণতা সাধনের নির্মিত সত্যের শিক্ষক সর্বপ্রথম আপন খান্দানকেই পেশ করছেন ঃ

وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا عباس بن عبدالمطلب ـ

"আজ থেকে জাহিলী যুগের যাবতীয় সুদ রহিত ঘোষিত হলো এবং সর্বপ্রথম সুদ যা বাতিল ঘোষিত হলো আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ।"[৩]

আজ অবধি মহিলারা ছিল অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় যা জুয়াড়ীর হাতের নিলামী বস্তুর মতই এক হাত থেকে আরেক হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকত। আজ ছিল

১. আল-ইকদুল ফারীদ, ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃ.।
২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ।
৩. প্রাগুক্ত।

প্রথম দিন যেদিন এই মজলুম মহিলাদের মাথায় মর্যাদার রাজমুকুট পরানো হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল ঃ فاتقوا الله فى النساء "মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।"[১]

আরবের মানুষের জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা ছিল না, ছিল না কোন মূল্য। যে যখন যাকে চাইত হত্যা করে ফেলত, যার খুশী সম্পদ ছিনিয়ে নিত। আজ শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ গোটা দুনিয়াকে শান্তি ও সমঝোতার পয়গাম শোনাচ্ছেন ঃ

ان دماءكم واموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم -

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর তেমনি হারাম ও সম্মানিত যেমন হারাম ও সম্মানিত আজকের দিনটি, যেমন সম্মানিত তোমাদেরই এই মাস আর যেমন সম্মানিত তোমাদের এই শহর।"[২]

ইসলামের পূর্বে দুনিয়ার বুকে বড় বড় ধর্মের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে সব ধর্মের বুনিয়াদ স্বয়ং তার স্রষ্টার লিখিত মূলনীতির ওপর ছিল না। সে সব ধর্মের স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব হেদায়েত তথা পথ-নির্দেশনা লাভ করেছিলেন, মানুষের প্রবৃত্তি পূজা সেসবের মৌল সত্যকে চাপা দিয়ে দিয়েছিল। এক্ষণে চিরন্তন ও শাশ্বত ধর্মের পয়গম্বর [নবী মুহাম্মদ (সা)] জীবনের পর ঐশী হেদায়েতের সমন্বিত ও সামগ্রিক রূপ স্বয়ং আপন হাতে তাঁর উম্মতকে সোপর্দ করছেন এবং তাকীদ করছেন ঃ

وانى قد تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله

"আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর মজবুতভাবে তাহলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"[৩]

এই বলে তিনি তাঁর সামনে উপস্থিত বিশাল জনসমষ্টিকে লক্ষ্য করে বললেন,

انتم مسئولون عنى فما انتم قائلون -

"কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। কী জওয়াব দেবে সেদিন?"

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বিদায় হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়; সহীহ মুসলিম কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা বলব, আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপন দায়িত্ব পালন করেছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদত অঙ্গুলি (তর্জনী) উঁচিয়ে বললেন এবং তিনবার বললেন, اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد। "হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক।"[১]

ঠিক সেই সময় যখন তিনি এই নবুওতের অনিবার্য দায়িত্ব পালন করছিলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের নিমিত্ত ইসলামকে ধর্ম হিসাবে নির্বাচিত করলাম।" [সূরা মায়িদা]

অত্যন্ত বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় দৃশ্য ছিল এই, শাহিনশাহে আলম (সা) যেই মুহূর্তে লক্ষ লোকের সমাবেশে আল্লাহ্‌র ফরমান ঘোষণা করছিলেন সে সময় তাঁর শাহী তখতের মসনদ ও ফরাশের মূল্য এক টাকার বেশি ছিল না।[৩]

খুতবা প্রদান থেকে অব্যাহতি মিলতেই তিনি হযরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেন এবং জোহর ও আসর উভয় সালাত এক সাথে আদায় করেন। এরপর উটনীর ওপর আরোহণপূর্বক স্বীয় অবস্থানস্থলে আগমন করেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দোআ ও মুনাজাতে মগ্ন থাকেন।[৪] সূর্য অস্তমিত হবার উপক্রম করতেই তিনি সেখান থেকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নেন। হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে আপন উটনী-পৃষ্ঠে পেছনে বসিয়ে নেন।[৫] তিনি তাঁর উটনীর নাকের রশি টেনে ধরে রেখেছিলেন। ফলে তাঁর ঘাড় কুঁজে এসে লাগছিল।[৬] লোকের ভিড়ে এক অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি লোকদেরকে হাতের ইশারায়, অপর দিকে বুখারীর বর্ণনা মুতাবিক হস্তস্থিত লাঠির ইশারা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আস্তে, ধীরে! আর যবান মুবারক দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন ঃ

---

১. বুখারী কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এর হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা' শীর্ষক অধ্যায়।
৩. সীরাতুন্নবী, শিবলী নু'মানী, ২য় খণ্ড, ১৫৪-৫৯।
৪. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ২৩৪।
৫. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, আরাফা ও হজ্জে অবতরণ শীর্ষক অধ্যায়।
৬. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

السكينة ايها الناس السكينة ايها الناس -

"লোকসকল! আস্তে, ধীরে! লোকসকল! আস্তে, ধীরে।"[১]

পথিমধ্যে এক জায়গায় তিনি পবিত্রতা হাসিল করেন। হযরত উসামা (রা) নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতের সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ। তিনি বললেন, সালাতের মওকা সামনে আসছে। কিছুক্ষণ পর তিনি সমস্ত কাফেলাসহ মুযদালিফায় গিয়ে পৌঁছুলেন। এখানে তিনি প্রথমে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। এরপর লোকেরা যার যার ছাউনিতে গিয়ে আপন আপন সওয়ারীগুলোকে বসালেন। সওয়ারী পৃষ্ঠ থেকে তখনও মাল-সামান নামানো হয় নি, এমন সময় তাৎক্ষণিকভাবেই এশার সালাতের তাকবীর হলো।[২] সালাত থেকে মুক্ত হতেই তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ফজর অবধি আরাম করলেন। এর মাঝে প্রতিদিনের অভ্যাসের বিপরীতে এ দিন তিনি নৈশকালীন ইবাদত (সালাতুত-তাহাজ্জুদ) আদায়ের উদ্দেশে ঘুম থেকে ওঠেন নি। মুহাদ্দিছীন কিরাম লিখেছেন, এই একটি মাত্র রাত্রে তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করেন নি। অতি প্রত্যুষে উঠে তিনি জামা'আত সহকারে ফজরের সালাত আদায় করেছেন।[৩]

কুরায়শ কাফিররা মুযদালিফা থেকে সে সময় যাত্রা করত যখন সূর্য পুরোপুরি পূর্বাকাশ ভেদ করে বেরিয়ে আসত এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড়-পর্বতের টিলাগুলোর ওপর সূর্য কিরণ পড়ে ঝলমল করে উঠত। সে সময় তারা সজোরে বলত, কোহে ছাবীর! রৌদ্র কিরণে চমকে ওঠো। নবী করীম (সা) এই প্রথা বাতিলের উদ্দেশে সূর্য ওঠার আগেই এখান থেকে রওয়ানা হন।[৪] দিনটি ছিল ১০ই যিলহজ্জের শনিবার দিন। নবী করীম (সা)-এর পিতৃব্য-পুত্র হযরত ফযল ইবন আব্বাস (রা) এ দিন তাঁর সঙ্গে উটনীপৃষ্ঠে উপবেশনরত ছিলেন। প্রয়োজন প্রার্থী লোকেরা হজ্জ সম্পর্কিত মসলা-মাসায়েল জেনে নেবার জন্য ডাইনে বামে চতুর্দিক থেকে আসছিল এবং মসলা জিজ্ঞেস করছিল। আর তিনিও সেসবের উত্তর দিয়ে চলছিলেন[৫] এবং জোরে জোরে উচ্চ স্বরে হজ্জ সম্পর্কিত বিধানাবলীর তা'লীম দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর ওয়াদিয়ে মুহাসসারের রাস্তা হয়ে তিনি জামরায় আসেন। হযরত ইবনে আব্বাসের বয়স এ সময় কম ছিল। তিনি তাঁকে বলেন, আমাকে কংকর অর্থাৎ ছোট ছোট নুড়ি পাথর দাও। তিনি এসব পাথর শয়তানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

---

১. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, নবী করীম (সা)-এ হজ্জ শীর্ষক অধ্যায়; বুখারী, কিতাবুল হজ্জ।

২. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, امر النبى صـ بالسكينة। শীর্ষক অধ্যায়। ৩. প্রাগুক্ত; মুযদালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় শীর্ষক অধ্যায়।

৪. সীরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড, ১৬০ পৃ; ৫. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ।

৫. বুখারী কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা' শীর্ষক অধ্যায়।

الغلو فى الدين فانما اهلك قبلكم الغلو فى الدين -

"ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিগো এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বির থাকবে।"[১]

এ সময় তিনি আরও বলেন,

لتاخذوا مناسككم فانى لا ادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذه

"তোমরা হজ্জ সম্পর্কিত মাসলা-মাসায়েল আমার থেকে শিখে নাও। কেনন আমি জানি না এরপর আমি পুনরায় হজ্জ করতে পারি কিনা।"[২]

এখান থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মীনা ময়দানে তাশরীফ নেন। ডাইনে-বাঁ সামনে পেছনে ছিল লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশ। মুহাজিররা ছিলে কেবলার ডাইনে, আনসাররা ছিলেন বামে, আর মাঝখানে ছিল সাধার মুসলমানদের কাতার। নবী করীম (সা) উটনীপৃষ্ঠে সওয়ার ছিলেন। হযরত বেলা (রা)-এর হাতে ছিল উটনীর নাকে বাঁধা রশি। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ন করীম (সা)-এর পেছনে বসে কাপড় টাঙিয়ে ছায়া করেন। তিনি চোখ তুলে এ বিশাল সমাবেশের দিকে চাইলেন। দেখতে পেলেন ২৩ বছরের নবুওতী দায়ি পালনের ফল-ফসল চোখের সামনে। যমীন থেকে সত্য কবুল ও স্বীকৃতি সমুজ্জ্বল নূর চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র অনিবার্য বিধানে পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরাম (আ)-এর তবলীগী দায়িত্ব পালনের যেই বিরাট কর্মকাণ্ড এ যাবত চ আসছিল তার ওপর খতমে রেসালাতের সীলমোহর মারা হচ্ছিল এবং দুনিয়া তা সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পর দীনে ফিতরত (স্বভাব ধর্ম)-এর পূর্ণতার কাহিনী সৃ জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিল। ঠিক সে সময় যবা হক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্ম ও উচ্চারণে ঘোষিত হলো।[৩]

এখন এক নতুন শরীয়ত, নতুন ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা এবং নতুন এক জগতে সূচনা ঘটল। ঘোষিত হলো ঃ

ان الزمان قداستدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض -

"সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে আল্লাহ্ যখন যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছিলে কাল-পরিক্রমায় সময় ঠিক সেই বিন্দুতেই এসে দাঁড়িয়ে গেল।"[৪]

---

১. নাসাঈ, কিতাবুল মানাসিক; ইব্ন মাজা, কিতাবুল মানাসিক।
২. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।
৩. সীরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড, ১৬১।
৪. বুখারী কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা' শীর্ষক অধ্যায়; মুসলিম কিতাবুল কুসাকা باب تغليظ الدماء والا عراض।

খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (সা)-এর ইবাদতের তরীকা হজ্জ মৌসুমে তার জায়গা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল, সে যুগে কোন প্রকার রক্তপাত বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। এজন্য আরবদের রক্তপিয়াসী আবেগ যুদ্ধের অজুহাতে হজ্জ মৌসুমকে কখনো কমিয়ে আনত, আবার কখনো বৃদ্ধি পেত। আজ সেই দিন এল এই মহাসমাবেশের জন্য পবিত্র ও সম্মানিত মাসগুলো সুনির্দিষ্ট করে দেবার। তিনি বললেন ঃ

السنة اثناعشر شهرا منها اربعة حرم - ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذوالحجة ومحرم ورجب شهر مضرالذى بين جمادى وشعبان -

"বছরে বার মাস। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি মাস পর পর ধারাবাহিকভাবে আসে। এ তিনটি মাস হলো যু'-কা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম। চতুর্থ মাস রজব, মুদার মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত।"[১]

দুনিয়ার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ এবং জুলুম-নির্যাতন ও জোর-যবরদস্তি কেবল তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় ঃ জান, মাল ও ইয্যত-আব্রু তথা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম। নবী করীম (সা) খুতবা দান কালে যদিও এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন তথাপি আরবদের শতাব্দীর পর শতাব্দী কালের মরিচা দূর করবার জন্য উপর্যুপরি তাকীদ প্রদান করার দরকার ছিল। আজ তিনি এজন্য অতীব বিস্ময়কর, অলংকারপূর্ণ ও ব্যঙময় ভাষা এখতিয়ার করেন। তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি জানা আছে এটা কোন্ দিন? লোকেরা জানাল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এ সম্পর্ক সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। লোকেরা মনে করল, সম্ভবত তিনি এ দিনের আর কোন নাম রাখবেন । দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, আজ কি কুরবানীর দিন নয়? লোকেরা বলল, অবশ্যই। ইরশাদ হলো, এটা কোন্ মাস? লোকেরা পূর্বের মতই জবাব দিল। তিনি পুনরায় দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন এবং বললেন, এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? সকলে নিয়ম মাফিক জওয়াব দিল। তিনিও ঠিক পূর্বের মতই অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, এটি সম্মানিত শহর নয় কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, ঠিক। এরপর ক্রেতাদের মন-মগজে যখন এই ধারণা পুরোপুরি বসে গেল, আজকের দিন, আজকের মাস এবং স্বয়ং এই শহর পবিত্র ও সম্মানিত অর্থাৎ এই দিনে, এই জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত জায়েয নয়, তখন বললেন,

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ـ

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্ভ্রম ও ইযযত-আব্রু (কিয়ামত পর্যন্ত) তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত যেমনটি সম্মানিত তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই মাসে এবং তোমাদের এই শহরে" (আবূ বাকরা বর্ণিত)।[১]

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ধ্বংস ও বরবাদী সর্বদাই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ও হানাহানির কারণেই ঘটেছে। সেই পয়গম্বর যিনি এক অবিনাশী জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এসেছিলেন, তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে সমুচ্চ কণ্ঠে বললেন,

الا لاترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض وستلقون ربكم فيسئلكم عن اعمالكم ـ

"আর হ্যাঁ, আমার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াতে লেগে পড়। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হতে হবে এবং তোমাদের আমল তথা কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।"[২]

জুলুম-নির্যাতনের এক বিশ্বব্যাপী দিক ছিল এই, বংশের কিংবা পরিবারের কোন লোক দ্বারা কোন গোনাহ্ বা পাপ সংঘটিত হলে সেই বংশ ও পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই সেই অপরাধের আইনত অপরাধী বিবেচিত হতো এবং অধিকাংশ সময় মূল আসামীর আত্মগোপনরত ও পলাতক হবার ক্ষেত্রে শাসক রাজা-বাদশাহ তার পরিবার ও বংশের যেই সদস্যটিকে দুর্বল মনে করত, তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। পিতার অপরাধে পুত্রকে শূল দণ্ড প্রদান করা হতো এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। এই আইন ছিল কঠিন নিপীড়নমূলক যা দীর্ঘকাল থেকে দুনিয়ার বুকে চলে আসছিল। যদিও কুরআন মজীদের لاتزر وازرة وزر اخرى "একের অপরাধের বোঝা অপরে বহন করবে না" এই সুবিস্তৃত আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জুলুমকে চিরতরে উৎসাদন ও নির্মূল করে দিয়েছিল, কিন্তু সে সময় যখন দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর এক নতুন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা বিন্যস্ত করছিলেন সেই মৌলনীতি বিস্মৃত হতে পারেন না। তিনি বললেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; হাজ্জাতুল বিদা' সম্পর্কিত অধ্যায়; কিতাবুল হজ্জ الخطبة امام الناس শীর্ষক অধ্যায়।

২. প্রাগুক্ত।

الا لا يجنى جان الا على نفسه الا لايجنى جان على ولده ولا مولود على والده ـ

"হ্যাঁ, অপরাধী তার অপরাধের যিম্মাদার স্বয়ং। আর হ্যাঁ, বাপের অপরাধের যিম্মাদার পুত্র নয় আর পুত্রের অপরাধের দায়ভাগও পিতা বহন করবে না।"[১]

আরবের বুকে অশান্তি ও অরাজকতা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলার একটি বড় কারণ ছিল এই, প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্বাধীন নৃপতি মনে করত এবং অন্যের অধীনতা স্বীকার ও অপরের আনুগত্য করাকে নিজের জন্য লজ্জা ও অবমাননাকর মনে করত। তিনি ঘোষণা করলেন,

ان امر عليكم عبد مجدع اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا ـ

"যদি কোন কান-কাটা হাবশী ক্রীতদাসও তোমাদের শাসক নিযুক্ত হয় এবং সে যদি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক পরিচালিত করে তাহলে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে, তাকে মেনে চলবে।"[২] মরু আরবের প্রতিটি ধূলি ও বালুকণা সে সময় ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, খানায়ে কা'বা চিরদিনের জন্য মিল্লাতে ইবরাহিমীর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ফেতনা-ফাসাদপ্রিয় শক্তিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এরই ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা দেন,

الا ان الشيطان قد ايس ان يعبد فى بلدكم هذا ابدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقروان من اعمالكم فيرضى به ـ

"হ্যাঁ, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এখন তোমাদের এই শহরে কিয়ামত অবধি তার পূজা হবে (না, তা হবে না)। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমরা তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে আর সে এতে খুশী হবে।"[৩]

সবশেষে তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য (ফরয) সম্পর্কে সমবেত জনমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন,

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا اذا امرتكم تدخلوا جنة ربكم ـ

১. সুনান তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান; ইবন মাজা, কিতাবুল মানাসিক;
২. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।
৩. তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান।

"তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, পুরো মাসব্যাপী (রমযানের) রোযা রাখ আর আমি যখন তোমাদের আদেশ দেই সেই আদেশ মান্য কর, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

এই বলে তিনি সমাবেশের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন,

ألا هل بلغت। "আমি কি (আল্লাহ্‌র বার্তা ও বাণী) তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি?"

সমবেত জনমণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি তখন আসমানের দিকে শাহাদত অঙ্গুলি (তর্জনী) তুলে বলে উঠলেন,

اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ـ

"হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকো।"

এরপর তিনি জনসমাবেশকে সম্বোধন করে বললেন, فليبلغ الشاهد الغائب "এ মুহূর্তে যারা এখানে উপস্থিত তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেবে।"[২] খুতবা শেষে তিনি সকলকে বিদায় জানান।

অতঃপর তিনি কুরবানী স্থলের দিকে গমন করেন এবং বলেন, কুরবানীর জন্য মিনা নির্দিষ্ট নয়, বরং মিনা ও মক্কার প্রতিটি গলিতে কুরবানী হতে পারে। তাঁর সঙ্গে কুরবানীর একশ'টি উট ছিল। কিছু উট তিনি নিজ হাতে যবেহ্ করেন আর অবশিষ্টগুলো হযরত আলী (রা)-কে সোপর্দ করেন যেন তিনি সেগুলো যবেহ্ করেন।[৩] তিনি হুকুম দেন গোশ্‌ত চামড়া সব দান করে দিতে। এমন কি কসাইয়ের মজুরি পর্যন্ত এর থেকে না দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজ পকেট থেকে দিতে বলেন।[৪]

কুরবানী থেকে মুক্ত হবার পর তিনি মু'আম্মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে ডাকলেন[৫] মাথার চুল মুণ্ডন করালেন[৫] এবং ভালবাসার আবেগে কিছু চুল স্বয়ং নিজ হাতে আবু তালহা আনসারী ও তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলায়মকে এবং এমন কিছু লোককে যাঁরা তাঁর আশেপাশে বসা ছিলেন, দিয়ে দেন। অবশিষ্ট চুল হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা)

১. তিরমিযী, কিতাবুস-সালাত; মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, ২৫১।
২. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ।
৩. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ৫৯।
৪. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, باب يتصدق بجلود الهدى।
৫. মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০০ পৃ.।

নিজ হাতে সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একটি দু'টি করে বন্টন করে দেন।[১] এরপর তিনি মক্কা মুআজ্জমায় তশরীফ নেন, কা'বা শরীফ তওয়াফ করেন। তওয়াফ শেষে তিনি যমযম কূপের ধারে যান।

যমযম কূপ থেকে পানি তুলে হাজ্জীদের পান করানোর খেদমত আবদুল মুত্তালিবের খান্দান আঞ্জাম দিতেন। অনন্তর এ সময় উক্ত খান্দানের লোকেরাই পানি তুলে লোকদেরকে পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকেরা! আমার যদি এই ভয় না হতো যে, আমাকে এমনটি করতে দেখে অন্য লোকে তোমাদের হাত থেকে পানির ডোল ছিনিয়ে নিয়ে স্বয়ং নিজ হাতে পানি তুলে পান করবে তাহলে আমি নিজেই নিজ হাতে পানি উঠিয়ে পান করতাম।[২]

হযরত আব্বাস (রা) ডোল থেকে পানি এনে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পানি পান করেন।[৩] এরপর এখান থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই জোহর সালাত আদায় করেন।[৪] আইয়ামে তাশরীকের বাকী দিনগুলো অর্থাৎ ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে মিনাতেই অবস্থান করেন। প্রতিদিন বেলা পশ্চিম দিকে হেলে যাবার পর শয়তানের উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপের জন্য জামরায় গমন করতেন এবং এরপর ফিরে আসতেন।[৫] ১৩ই যিলহজ্জ মঙ্গলবার দিন তিনি বেলা গড়াতে এখান থেকে বেরিয়ে মুহাসসাব নামক উপত্যকায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করেন।[৬] রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে তিনি মক্কা মুআজ্জমায় তশরীফ নেন এবং কা'বা ঘরের শেষ তওয়াফ করে সেখানে ফজর সালাত আদায় করেন।[৭] এরপর কাফেলা ঠিক সেই মুহূর্তেই আপন আবাসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে পড়ে এবং তিনি মুহাজির ও আনসার সমভিব্যাহারে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে যুল-হুলায়ফায় তিনি রাত্রি যাপন করেন। সকালে একদিক দিয়ে সূর্য উঠল আর তিনি আরেক দিক দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় নবী গৃহে প্রবেশ করলেন। মদীনার ওপর নজর পড়তেই তিনি বলে ওঠেন ঃ

---

১. বুখারী, কিতাবুল উযূ; মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ باب بيان ان السنة يوم النحراى يرمى ثم ينحر

২. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ باب حجة النبى صـ সহীহ্ বুখারী, পানি পান সম্পর্কিত অধ্যায় (بابالسقاية)।

৩. বুখারী, কিতাবুশ শুরূব। ৪. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।

৫. যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, ২৯০; বুখারী, জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ সংক্রান্ত অধ্যায়।

৬. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, বিদায়ী তাওয়াফ সংক্রান্ত অধ্যায়।

৭. প্রাগুক্ত।

الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير - انبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الا حزاب وحده -

"আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই। তিনি এক; তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই আর তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। প্রত্যাবর্তন করছি তওবারত অবস্থায়, বিনীতভাবে, আনুগত্য সহকারে, সিজদারত অবস্থায়, আপন প্রতিপালকের প্রশংসারত বেশে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দল-উপদলকে পরাজিত করেছেন।"[১]

নবী করীম (সা)-এর ওফাত

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ -

"তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" [সূরা যুমার]

রূহে কুদুসীর দৈহিক জগতে ততক্ষণ পর্যন্তই থাকার দরকার ছিল যতক্ষণ না শরীয়ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মানুষগুলোর নফ্সসমূহের আত্মশুদ্ধির বিরাট কাজ পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়। বিদায় হজ্জে এই গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য দায়িত্বটি পালিত হয়। তাওহীদে কামিল ও চারিত্রিক পূর্ণতার মূলনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে আরাফাত ময়দানের বিশাল সমাবেশে ঘোষণা দেওয়া হয় ঃ[২]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" [সূরা মায়িদা]

সূরা নাস্র-এর নাযিল বিশেষ বিশেষ সাহাবাকে নবী করীম (সা)-এর ওফাত আসন্ন বলে জানিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ فسبح بحمد ربك واستغفره "তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" (সূরা নাস্র) মুতাবিক অধিক সময় তাসবীহ-তাহলীলে অতিবাহিত করতেন।[৩] তিনি সাধারণত প্রতি বছর রমাযানুল

১. বুখারী, কিতাবুল হজ্জ; মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাজ্জাতুল বিদা অধ্যায়; সীরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃ.।
৩. বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা নাসর-এর তাফসীর অধ্যায়।

মুবারকে দশ দিন মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এ বছর (হি. দশম সনে) তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। প্রতি বছর রমাযান মাসে সমগ্র কুরআন শরীফে একবার ফেরেশতা জিবরাঈলের মুখে তেলাওয়াত শুনতেন। ইনতিকালের বছর তিনি দু'বার শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১] বিদায় হজ্জের সময় হজ্জের বিবিধ নিয়ম-কানুন ও মসলা-মাসাইল-এর তা'লীমের সাথে সাথে তিনি এও ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমি আশা করি না আগামী বছর আবার আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব। কোন কোন বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে, সম্ভবত এরপর আমি আর হজ্জ করতে পারব না।[২]

বিদায় হজ্জের সময় সমস্ত মুসলমানকে তিনি সাক্ষাত দানে ধন্য করেন এবং তাঁদেরকে বিষাদের সাথে বিদায় জানান। ওহুদের শহীদান-এর যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা بل هم احياء "বরং তাঁরা জীবিত" বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি আট বছর পর শেষবারের মত সাক্ষাত দানে ধন্য ও গৌরবান্বিত করা জরুরী মনে করেন। অনন্তর তিনি সে সময়ই তাঁদের কবরে হাজিরা দেন এবং তাঁদের জন্য কল্যাণ কামনায় দোআ করেন এবং কান্না ভারাক্রান্ত অবস্থায় বিদায় জানান যেভাবে একজন মৃত্যু পথযাত্রী তার আত্মীয়-বান্ধবকে বিদায় জানায়। এরপর তিনি একটি খুতবা (ভাষণ) দেন। খুতবায় তিনি বলেন ,

"আমি তোমাদের আগেই হাওয (ই কাওছার)-এর পাশে যাচ্ছি যার প্রশস্ততা ও বিস্তৃতি আয়লা থেকে হুজফা পর্যন্ত। আমাকে গোটা দুনিয়ার যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি পেশ করা হয়েছিল। আমার এ ভয় নেই, আমার পর তোমরা শির্ক করবে। কিন্তু আমার আশংকা, তোমরা দুনিয়াতে না লিপ্ত ও জড়িত হয়ে পড়! আর এজন্য তোমরা, আপোসে খুনোখুনি ও রক্তপাত করতে শুরু কর। যদি তোমরা এসব করতে শুরু কর তাহলে তোমরা ঠিক সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে।" বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এই শেষবারের মত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুতবা দিতে শুনলাম।[৩]

রসূলুল্লাহ্ (সা) পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হযরত যায়দ ইবন হারিছা (রা)-কে সিরীয় সীমান্তের আরবরা শহীদ করে দিয়েছিল। নবী করীম (সা) তাদের থেকে এই হত্যার বদলা নিতে চাইতেন। রোগের সূচনায় একদিন আগে তিনি উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন এবং ঐ সব শয়তানের থেকে পিতৃহত্যার বদলা নেবার জন্য বলেন।[৪]

---

১. বুখারী, কিতাব ফাদাইলিল-কুরআন।
২. মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ।
৩. বুখারী, কিতাবুল জানাইয, শহীদদের জানাযার সালাত অধ্যায়; মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল।
৪ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, উসামা বাহিনী প্রেরণ।

১৮ কিংবা ১৯ শে সফর (১১হি.) মাঝরাতে তিনি জান্নাতুল বাকী, যা সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থান, গমন করেন। এ সময় তাঁর শরীর-মন যথাযথ ছিল না।[১] দিনটি ছিল উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা)-র পালার। পাঁচ দিন পর্যন্ত তিনি এই অবস্থায়ও ন্যায় ও ইনসাফের স্বার্থে পালাক্রমে এক একজন স্ত্রীর ঘরে রাত্রি যাপন করতে থাকেন। সোমবার দিন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতেই তিনি সকল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে উম্মুল-মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ অনুমতিও সুস্পষ্ট ও ঘোষণা দিয়ে নেন নি, বরং জিজ্ঞেস করেন, আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? পরদিন অর্থাৎ সোমবার দিন হযরত 'আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থানের পালা নির্ধারিত ছিল। নবী করীম (সা)-এর আন্তরিক কামনা অনুভব করে পবিত্র নবী সহধর্মিনিগণ বলেন, আপনি যেখানে চাইবেন সেখানেই অবস্থান করুন। দুর্বলতা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, উঠে চলাফেরার শক্তি ছিল না। হযরত আলী ও হযরত 'আব্বাস (রা)-এর দুই হাত ধরে খুব কষ্টে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র ঘরে তাশরীফ নেন।[২]

আসা-যাওয়ার শক্তি যতদিন ছিল ততদিন সালাতে ইমামতি করার প্রয়োজনে তিনি মসজিদে যেতেন। সর্বশেষ যেই সালাতে তিনি ইমামতি করেন তা ছিল মাগরিবের সালাত। মাথায় ছিল যন্ত্রণা। এজন্য তিনি মাথায় রুমাল বেঁধেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বাইরে আসেন এবং সালাত আদায় করেন। এতে তিনি সূরা ওয়াল-মুরসালাত তেলাওয়াত করেন।[৩] এশার সময় তিনি জিজ্ঞেস করেন, সালাত কি হয়ে গেছে? সকলেই জানায়, সবাই হুযূর (সা)-এর অপেক্ষা করছেন। এরপর পাত্র ভর্তি পানি দিয়ে গোসল করেন। তারপর তিনি উঠতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। হুশ ফিরে পেতেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, সালাত কি হয়ে গেছে? সকলে প্রথমবারের মতই উত্তর দেন। তিনি আবার গোসল করেন। এরপর উঠবার উপক্রম করতেই আবার বেহুশ হয়ে যান। হুশ ফিরে পেতেই পুনরায় সালাত আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। উত্তর ছিল পূর্বের মতই। তৃতীয়বারের মত তিনি শরীরে পানি ঢালেন। এরপর উঠতে চাইলে আবার বেহুশ হয়ে পড়েন। এরপর হুশ ফিরে পেতেই আবূ বকর (রা)-কে সালাতে ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা (রা) আপত্তি জানিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ। আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াতে পারবেন না। তিনি তারপরও একই নির্দেশ দেন, আবূ বকর (রা) সালাতে ইমামতি করবে। অনন্তর কয়েক দিন পর্যন্ত হযরত আবূ বকর (রা)-ই ইমামতি করেন।

১. মুস্তাদরাক হাকেম, ৩য় খণ্ড, ৫৭ পৃ.।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, নবী করীম (সা)-এর পীড়া ও তাঁর ওফাত শীর্ষক অধ্যায়।
৩. প্রাগুক্ত।

ইনতিকালের চার দিন আগে জোহরের সালাতের সময় নবী করীম (সা)-এর অবস্থার কিছুটা উন্নতি ও সুস্থতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাত মশক ভর্তি পানি দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে বলেন। গোসল সমাপনান্তে হযরত আলী ও হযরত 'আব্বাস (রা)-এর সহায়তায় মসজিদে তাশরীফ নেন। জামা'আত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবূ বকর (রা) সালাতে ইমামতি করছিলেন। নবী করীম (সা)-এর উপস্থিতি টের পেতেই হযরত আবূ বকর (রা) পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে ইশারায় থামিয়ে দেন এবং তাঁর পাশে বসে সালাত আদায় করেন। নবী করীম (সা)-কে দেখে হযরত আবূ বকর আর আবূ বকর (রা)-কে দেখে অন্যরা সালাত আদায় করতে থাকেন।[১]

সালাত শেষে নবী করীম (সা) একটি খুতবা দেন যা ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। এতে তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ পাক তাঁর এক বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, সে কি দুনিয়ার নায-নে'মত ও এর সম্পদরাজি গ্রহণ করবে, নাকি আখিরাতে আল্লাহর কাছে যা কিছু নে'মত রয়েছে তা কবুল করবে। আল্লাহ্র বান্দাহ আল্লাহ্র কাছে যা আছে তাই কবুল করলেন।" এতদ্শ্রবণে হযরত আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেলেন। সকলেই তাঁর দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখতে লাগল যে, এতে কান্নার কী আছে! রসূলুল্লাহ্ (সা) তো জনৈক বান্দার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নবুওতের তত্ত্বজ্ঞানী হযরত আবূ বকর (রা) ঠিকই বুঝেছিলেন আল্লাহ্র সেই বান্দা স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া আর কেউ নন।

এরপর তিনি ভাষণের ধারা অব্যাহত রাখলেন এবং বললেন, "আমি যাঁর সাহচর্য দ্বারা সবচে' বেশী উপকৃত হয়েছি, তিনি আবূ বকর (রা)। আমি যদি দুনিয়ার বুকে আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্কই বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট। মসজিদের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাক, কেবল আবূ বকর (রা)-এরটিই খোলা থাক।[২] আর হ্যাঁ, তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো তাদের পয়গম্বর ও সাধু-সজ্জনদের কবরগুলোকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে। দেখো, তোমরা যেন এমনটি করো না"।[৩] পীড়ার দিনগুলোতে আনসাররা নবী করীম (সা)-এর করুণা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কাঁদত। একবার এই অবস্থায় হযরত আবূ বকর ও হযরত আব্বাস (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসারদের কাঁদতে দেখে

১. মুসলিম, কিতাবুস সালাত; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, باب مرض النبى صـ।

২. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব।

৩. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, باب مرض النبى صـ মুসলিম, কিতাবুল মসজিদ, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ নিষেধ সম্পর্কিত অধ্যায়।

তাঁরা এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা জানায়, হুযূর (সা)-এর সাহচর্যের কথা স্মরণ করে তারা কাঁদছে। উভয়ের মধ্যে একজন গিয়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে বিষয়টি পেশ করেন। আজ ছিল তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের মওকা। এজন্য তিনি এরপর আনসারদের সম্পর্কে লোকদের সম্বোধন করে বলেন,

"লোক সকল! আমি আনসারদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিচ্ছি। সাধারণ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা এভাবে কমে যাবে যেমন খাবারের মধ্যে লবণ বিলীন হয়ে যায়। তারা নিজেদের পক্ষে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তাদের ব্যাপারে তোমাদের যেই দায়িত্ব রয়েছে তা আদায়ের পালা। তোমরা তা আদায় করবে। তারা আমার শরীরে উদরের ন্যায়, পাকস্থলীর ন্যায়। তোমাদের ভাল-মন্দ ও লাভ-ক্ষতি দেখাশোনার জন্য যিনি দায়িত্বশীল হবেন (খলীফা হবেন) তাঁর উচিত হবে, তাদের মধ্যে যারা নেককার ও সৎ কর্মশীল হবে তাদেরকে গ্রহণ করবে। আর কারও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাদেরকে ক্ষমা করবে।"[১]

ওপরে বলা হয়েছে, রোমকদের অভিমুখে যেই ফৌজ পাঠাতে নবী করীম (সা) বলেছিলেন তার নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে। এতে লোকেরা (ইবন সা'দ-এর বর্ণনা মুতাবিক এরা ছিল মুনাফিক) অভিযোগ উত্থাপন করে, প্রবীণরা থাকতে একজন নবীন ও তরুণকে কেন এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হলো। নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে বলেন,

"উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমাদের যদি আপত্তি থাকে তো তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমাদের আপত্তি ছিল। আল্লাহর কসম! সে এই পদের সর্বাংশে উপযুক্ত ছিল এবং সে ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয়। আর এখন তারপর এ আমার সর্বাধিক প্রিয়।"[২]

ইসলাম ও অপরাপর ধর্মের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো, ইসলাম শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও বিধানদাতা সরাসরি আল্লাহ্ পাককেই অভিহিত করে। পয়গম্বরের দায়িত্ব কেবল এতটুকু, তিনি আল্লাহ্র বিধান নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে বান্দার কাছে পৌঁছে দেবেন। যেহেতু অন্যান্য ধর্মে এই ভুল বোঝাবুঝি তাদের শির্ক ও কুফর পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং এর কী পরিণতি হয়েছে তা তাঁর চোখের সামনেই ছিল বিধায় তিনি বলেন,

"হালাল ও হারাম আমার সঙ্গে সম্পর্কিত করবে না। আমি কেবল সে সবই হালাল করেছি যা আল্লাহ পাক তাঁর গ্রন্থে হালাল করেছেন এবং সেগুলোই হারাম করেছি যেগুলো আল্লাহ্ হারাম করেছেন।"

---

১. বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব, باب مناقب الا نصار।
২. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

মানুষের কর্মফল ও শাস্তির বুনিয়াদ ও ভিত্তি স্বয়ং তার ব্যক্তিগত আমলের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন,

"হে নবীকন্যা ফাতিমা! হে আল্লাহ্‌র রসূলের ফুফু সফিয়্যা! আল্লাহর জন্য কিছু করে নাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাত থেকে বাঁচাতে পারব না।"

খুতবা প্রদান শেষ হতেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র কামরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রসূল কন্যা হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা (রা)-কে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন। পীড়াক্রান্ত অবস্থায় তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে ডেকে পাঠান। তিনি এলে তাঁকে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলেন। এতে তিনি কাঁদতে থাকেন। এরপর তিনি তাঁকে আবার ডেকে কানে কানে কিছু বলেন। এতে তিনি হেসে ফেলেন। হযরত আয়েশা (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রথমবার তিনি আমাকে বলেন, এই রোগেই আমি ইনতিকাল করব। এতে আমি কাঁদতে থাকলে আমাকে ডেকে বলেন, আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে এসে মিলিত হবে। এতে আমি হেসে ফেলি।[১]

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা নবীদের মাযার ও স্মৃতিচিহ্নগুলোর সম্মানার্থে যেই বাড়াবাড়ি করেছে তা মূর্তিপূজার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইসলামের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, মূর্তিপূজার শিরা-উপশিরাগুলোর মূলোৎপাটন ও উৎসাদন। এজন্য পীড়াক্রান্ত অবস্থায়ও যে জিনিসটি তাঁর সামনে ছিল তা ছিল এই, ঘটনাক্রমে কোন কোন নবী-সহধর্মিণী যাঁরা আবিসিনিয়া হয়ে এসেছিলেন ঐ অবস্থায় সেখানকার খ্রিস্টান উপাস্যের ও সে সবের ভাস্কর্য মূর্তি ও ছবির উল্লেখ করেন। তিনি তখন বলেন, তাদের ভেতর যখন কোন সৎ লোক মারা যেত তখন তাদের কবরগুলোকে উপাসনালয়ে পরিণত করত এবং তার মূর্তি বানিয়ে তার ভেতর স্থাপন করত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে এসব লোক নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হবে।[২] রোগের যন্ত্রণায় তিনি কখনো কখনো চাদর দিয়ে মুখ ঢাকছিলেন, আবার কখনো বা গরমের কারণে ঘাবড়ে গিয়ে চাদর মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছিলেন। এ সময় হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-কে বলতে শোনেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجدا -

১. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী; باب مرض النبى صـ ووفاته ।

২.মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, باب النهى عن بناء المساجد على القبور

"ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক! তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।"[১]

এ রকম যন্ত্রণাকাতর ও অস্থির অবস্থার মধ্যে তাঁর মনে পড়ে হযরত 'আয়েশা (রা)-র কাছে তিনি কিছু আশরফী রেখেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেই আশরফীগুলো কোথায়? মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র সঙ্গে বদগুমানী নিয়ে মিলিত হবে? যাও, সেগুলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দাও।[২]

রোগের প্রকোপ কখনো বৃদ্ধি পেতে থাকে, আবার কখনোও হ্রাস পায়। যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন অর্থাৎ সোমবার দিন, সেদিনকার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল ছিল। কামরা ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন। ভোরে তিনি পর্দা তুলে দেখতে পেলেন লোকে ফজরের সালাত আদায় করছে। এ দৃশ্যে তিনি খুশীতে হেসে ফেলেন। লোকে পদ শব্দ শুনে ধারণা করেন সম্ভবত নবী করীম (সা) বাইরে আসতে চান। আনন্দের আতিশয্যে সকলেই আত্মহারা হয়ে পড়ে, এমন কি সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন সালাতের ইমাম। তিনি বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গিতে পেছনে সরতে নিষেধ করলেন এবং কামরায় প্রবেশ করে পর্দা ফেলে দিলেন।[৩]

এটাই ছিল সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নবী করীম (সা)-এর শেষ দর্শন। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, তাঁর চেহারা থেকে মনে হচ্ছিল কোনো গ্রন্থের (সাদা) পৃষ্ঠা।[৪]

বেলা বৃদ্ধি পাবার সাথে তিনি ক্ষণে ক্ষণে বেহুশ হচ্ছিলেন, আবার মুহূর্তেই হুশ ফিরে পাচ্ছিলেন। হযরত ফাতিমা যাহরা (রা) এই দৃশ্য দেখে বলে ওঠেন, واكرب اباه "হায়! আমার আব্বার কষ্ট।" রসূল আকরাম (সা) একথা শুনে বলেন, তোমার আব্বা আজকের দিনের পর আর কোন দিন কষ্টের মুখোমুখি হবে না।[৫] উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন বলতেন, নবীদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হয়, হয় তাঁরা মৃত্যু কবুল করবে কিংবা দুনিয়ার জীবন বেছে নেবে। এমতাবস্থায় তাঁর যবান মুবারকে প্রায় উচ্চারিত হতো নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ مع الذين انعم الله عليهم

"ঐ সব লোকের সঙ্গে যাদেরকে আল্লাহ পাক অনুগৃহীত করেছেন।"

---

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, باب مرض النبى ووفاته।
২. মুসনাদে আহমদ।
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী; باب مرض النبى صد।
৪. মুসলিম, কিতাবুস-সালাত।
৫. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, باب مرضى النبى ووفاته।

কখনো বা বলতেন, হে আল্লাহ! সর্বোত্তম বন্ধু।

اللهم فى الرفيق الاعلى

হযরত আয়েশা (রা) বুঝে ফেলেন, এখন তিনি কেবল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনা করছেন।[১]

ইনতিকালের কিছু আগে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান পবিত্র খেদমতে হাজির হন। এ সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র বুকের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আবদুর রহমান-এর হাতে ছিল মেসওয়াক। তিনি মেসওয়াকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। হযরত আয়েশা (রা) বুঝতে পারেন তিনি মেসওয়াক করতে চান। তিনি তখন আবদুর রহমান থেকে মেসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে নরম করে নবী করীম (সা)-এর হাতে তুলে দেন। তিনি একদম সুস্থ মানুষের মত মেসওয়াক করেন।[২] তাঁর ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল। বেলা তিন প্রহরের[৩] সময় নবী করীম (সা)-এর নিঃশ্বাস-এর সাথে বুকের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ানির আওয়াজ অনুভূত হচ্ছিল।

এ সময় দুই ঠোঁট নড়ে উঠল এবং লোকে শুনতে পেল এই শব্দসমষ্টি ঃ[৪]

"সালাত ও দাস-দাসী"। الصلوة وما ملكت ايمانكم

এ সময় পাশেই পাত্র ভর্তি পানি রাখা ছিল। তিনি বার বার পানির পাত্রে হাত ডোবাচ্ছিলেন আর সেই ভেজা হাত দিয়ে চেহারা মুবারক মুছছিলেন। কখনো বা চেহারা চাদর দিয়ে ঢাকছিলেন, আবার কখনো চাদর চেহারা মুবারকের ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি হাত ওপরে তুলে বললেন, اللهم الرفيق الاعلى। "হে আল্লাহ্! সর্বোত্তম বন্ধু আমার।" এই বলতে বলতে তাঁর পবিত্র আত্মা দেহ মুবারক ছেড়ে আলমে কুদসের পথে পাড়ি জমাল।[৫]

اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه صلوة كثيرا كثيرا -

জানাযা ও দাফন-কাফন

ভক্তদের বিশ্বাস হচ্ছিল না, হুযূর আকরাম (রা) আর ইহজগতে নেই, তিনি এ জগতকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। হযরত ওমর (রা)

১. প্রাগুক্ত। ২. প্রাগুক্ত।

৩. ইবন ইসহাক তদীয় সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, ইনতিকাল দ্বিপ্রহরের সময় হয়েছিল। কিন্তু হযরত আনাস ইবন মালিক থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, আগলাম অর্থাৎ সোমবার দিনের শেষভাগে তিনি ইনতিকাল করেন। হাফিজ ইবনে হাজার উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল।

৪ মুস্তাদরাক হাকেম, ৩য় খণ্ড ৫৯।

৫. বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, باب مرض النبى صـ ووفاته।

তো এ খবর শুনতেই তলোয়ার টেনে বের করে বললেন, যে বলবে হুযূর আকরাম (সা) ইনতিকাল করেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।[১]

কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এসেই সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘোষণা দিলেন, হুযূর আকরাম (সা) একদিন এ জগত ছেড়ে পরলোকে পাড়ি জমাবেন, এটা নিশ্চিত। এরপর তিনি কুরআন মজীদের এ সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে শোনান। এরপর অনেকের চোখ খুলে যায় এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন, সত্যই আর তিনি তাঁদের মাঝে নেই।[২]

দাফন-কাফনের কাজ মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়। এ কাজ নবী করীম (সা)-এর একান্ত আপনজন ও বিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন আঞ্জাম দেন। ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.), উসামা ইবন যায়দ (রা) পর্দা করেন এবং আলী (রা) গোসল দেন। এ সময় হযরত আব্বাস (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

গোসল ও কাফনের পর প্রশ্ন দেখা দিল, কোথায় দাফন করা হবে? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, নবী যেখানে ইনতিকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। অতএব, নবী করীম (সা)-এর মরদেহ উঠিয়ে ও বিছানা গুটিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কামরায় যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেখানেই কবর খননের সিদ্ধান্ত হয়।[৪]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে কোন খোলা ময়দানে এজন্যই দাফন করা হয় নি যে, শেষ মুহূর্তে তাঁর ধারণা হয়েছিল, লোকে ভালবাসার আতিশয্যে আমার কবরকে উপাসনালয়ে পরিণত না করে। খোলা ময়দানে দাফন করলে এর নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান কঠিন হতো।[৫]

হযরত আবূ তালহা (রা) মদীনার প্রথা মাফিক কবর খনন করেন আর কবর ছিল লাহ্দী বগলী।[৬]

জানাযা প্রস্তুত হলে লোকে জানাযা আদায়ের জন্য ছুটে আসে। জানাযা কামরার ভেতরেই রাখা ছিল। সকলেই পালাক্রমে অল্প অল্প লোক মিলে ভেতরে গিয়ে জানাযার সালাত আদায় করেন। প্রথমে পুরুষ, এরপর মহিলা, এরপর শিশুরা সালাতে জানাযা আদায় করেন। এ সালাতে কোন ইমাম ছিল না।[৭]

নবী করীম (সা)-এর শরীর মুবারক কবরে নামান হযরত আলী (রা.), ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা), উসামা ইব্ন যায়দ ও হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)।[৮]

تمت بالخير

১. সীরাত ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬৬৫। ২. প্রাগুক্ত, ৬৬২ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত।
৪. সুনান ইবন মাজা, কিতাবুল জানাইয, باب وفات النبى صـ।
৫. বুখারী, কিতাবুল জানাইয, باب وفات النبى صـ। ৬. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬৬৩।
৭. প্রাগুক্ত, ৬৬৪ পৃ.। ৮. আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইয।